বিবাহের চেয়ে বড়ো

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

করকমলেষু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এই লেখকেরই :

কল্লোল যুগ	৫৲
পাখনা	২॥০
যায় যদি যাক	৩৲
ঊর্ণনাভ	৩॥০
প্রাচীর ও প্রান্তর	৩॥০
কালো রক্ত	১॥০

বিবাহের চেয়ে বড়ো

গোড়ার কথা বলতে গেলে সামান্যই। প্রভাত কেরানি—বাঙালি কেরানি যা হ'তে হয়—গরিব অথচ গর্বিত। বাপ বেতো, খিটখিটে; মা কিন্তু মমতাময়ী। দু'টি ছোট বোন, একটি অন্ধ ভাই। হঠাৎ একদিন প্রভাতের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলো—হাজার কয়েক টাকা পাওয়া যাবে। প্রভাত গেলো দিদিকে দেখতে ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশে। সেই মধ্য-প্রদেশের ওপর মধ্যরাত্রিতে অশ্রুর সঙ্গে তার আলাপ হলো এবং আলাপটা এতো জমে উঠলো যে বাঙলা ভাষায় তার প্রতিশব্দ দিতে হলে বলতে হয় প্রেম।

বিয়ে অতএব হলো না। ছোট দু'টি বোন এক থালায় ভাত খেয়ে কলেরা হ'য়ে একই বিছানায় শুয়ে মারা পড়লো, তাতে কিছু আয় বাড়লো সংসারের। অশ্রুর সঙ্গে প্রভাতের প্রেমে এলো বাধা—ওটা আসবেই—এবং সেই বাধাকে শাসন করতে অশ্রু যা করে বসলো বাঙলা সমাজকে তা চমকে দেবার মতো। মানে, এক ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ের দিনে অশ্রু তার বিয়ের সভা থেকে উঠে এসে সটান প্রভাতের ঘরে গিয়ে হাজির হলো—এবং সেখান থেকে জলপাইগুড়িতে। অশ্রু ইস্কুলের টিচারি করে। সেইখানেই যবনিকা পড়েছিলো—তিন বছরের আত্মগোপন। ওপরের ঐ ঘটনাগুলো নিয়ে চমৎকার একটা গল্প লেখা যেতো, কিন্তু তার দরকার নেই। তিন বছর পরে হঠাৎ গল্পের সুরু:

তিন বছর পরে ফের যবনিকা উঠলো। স্টাইলও গেছে বদলে। রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

প্রভাতের একটা চাকরি জুটেছে অবিশ্যি। চাকরি না জুটলে চলে কি করে'? মাইনে এবার ছ'-এর কোঠায় পৌচেছে যা হোক; তেমনি

বছর খানেক আগে বাবাও বাতের ব্যথায় খতম হ'য়েছেন। সংসারে মা আর প্রভাত; আর সেই দুঃখী অন্ধ ভাইটি,—ছোট হাত তুলে ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে মনুমেন্টের স্বপ্ন দেখে। টিম্‌টাম করে' সংসার চলে। প্রভাত সকাল বেলা টিউশনি করে' বাজার এনে দেয়; মা-ই রাঁধেন,—মা'র সঙ্গে-সঙ্গে প্রভাতও সকালবেলাটা নিরিমিষ খায়। আফিস থেকে খেটেখুটে এসে ছোট ছাতে একটু পাইচারি করে, মা'র সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে একটু বা মনকষাকষি চলে, কোনো দিন বা মাঠে খেলা দেখে আসে। রাতে তোলা-উনুনে মা মাছ ভেজে স্নান করে' বিছানায় অন্ধ ছেলেটিকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। প্রভাত অনেক রাত করে' শোয়—জেগে জেগে ততক্ষণ বই পড়ে, ভাবে, দু' এক পৃষ্ঠা কি একটু লিখতে চেষ্টা করে, কাটাকুটি করে' ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এবার একটি টুকটুকে বৌ নিয়ে এলে ভাবি মানায় কিন্তু। প্রভাতের ঔদাসীন্যকে আর ক্ষমা করা যায় না।

মা কিছু বলতে এলে প্রভাত হেসে বলে,—দেখ মা, পুরুষমানুষের ল্যাঠা কম। কাছাটা নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। পেশু থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত রাস্তা খোলা।

মা বলেন—কিন্তু এই শূন্য পুরীতে মন আর টেঁকে না, খাঁ খাঁ করে। হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি।

প্রভাত সরাসরি বলে—তবে তুমি দিদির কাছে দিন কয়েকের জন্যে জিরোও গে। নাটুকে অন্ধ-ইস্কুলে ভর্তি করে' দি।

মা একটু রেগে বলেন—কিন্তু বিয়ে তুই করবি না কেন?

—বিয়ে কেন-ই বা যে করবো তারো কোনো ভালো কারণ তুমি দেখাতে পারবে না। যে-সব কথা তোমার জিভের গোড়ায় আসছে তা আমি জানি, মা। বড্ড বাজে ও মামুলি। বিয়ে করছি এ-ব্যাপারের

চেয়ে কাকে বিয়ে করছি এইটেই বড়ো কথা। তাকে পাওয়া যায় না, মা।

মা সন্দিগ্ধ হ'য়ে প্রশ্ন করেন—কাকে ?

প্রভাত হেসে বলে—যাকে পাওয়া যায় না, তাকে।—তারপর কথাটাকে সহজ করে' দেবার চেষ্টায় বলে—বিয়ে আমি একেবারে কর্‌বো না, এমন আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ নেই। তোমাদের এই বিয়ের প্রথাটা বড্ড পুরোনো হ'য়ে গেছে, তাকে আমি একটু ঝালিয়ে নিতে চাই। দরকার হয়েছে।

মা কি-যেন বল্‌তে চান, প্রভাত বাধা দিয়ে বলে' চলে - তেমন পরীক্ষার যদি সুযোগ না জোটে, আমি না-হয় প্রতীক্ষা করে'ই থাকবো। দেহের সেবাদাসী অনেক জোটে মা, আত্মার ঘরণীরই দেখা মেলে না।

মা বলেন —আত্মা কি দেহ থেকে ভিন্ন ?

প্রভাত জবাব দেয় : কিন্তু সেবাদাসী আর পূজারিণী এক নয়, মা।

মা বলেন—কিন্তু সেই স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ যে আরো ভীষণ। পূজারিণী যখন ভুখারিণী হ'য়ে ওঠেন ?

—সেই ত' আমার ভয়, মা।

—ভয় না থাকলে ভালোবাসা হয় না।

মা'র মুখে এত সব কথা শুনে প্রভাত বিস্মিত হলো। মা'র বৈধব্যদীপ্ত লালটে তেজস্বিতা, সমস্ত শরীর থেকে পবিত্রতা বিকীর্ণ হচ্ছে।

প্রভাত মাকে জড়িয়ে ধরে' স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে—বাঙলা দেশের মেয়েদের ত' তুমি চেন না মা, তারা স্বামীকে মা'র কোল থেকে কেড়ে রাখে! সংসারের শেষ প্রান্তে মাকে নির্বাসন দিয়ে বৌরা স্বামীর কাঁধে সওয়ার হ'য়ে রাজত্ব চালায়। তোমার ছেলে হ'য়ে তোমার এই লাঞ্ছনা সইবো না, মা!

প্রভাতের পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে মা স্নিগ্ধস্বরে বলেন—বাঙলা-দেশের মেয়েদের আমি চিনি না, তুই চিনিস! আমি যেন বিলেত থেকে উঁড়ে' এসেছি। বাঙলা-দেশের মেয়ের মতো মেয়ে আছে ভূ-ভারতে? দেখিস্, তোর বৌ আমাকে মাথায় করে' রাখবে।

কথোপকথনকে প্রভাত আরো স্বচ্ছ করে' তোলে। বলে—তারপর বৌ এলে তুমি আমাকে ফেলে নাটুকে তুলে নেবে, ওকেই আকড়ে ধরবে তখন। আমি তখন তোমার পর হ'য়ে গেছি। পরের মেয়েকে ডেকে এনে এত হাঙ্গামায় কাজ কি, মা? এই আমরা আছি বেশ। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

মা বলেন—স্বস্তির চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য। আমার হাতে একটি সম্বন্ধ আছে, লক্ষ্মী মেয়ে, তাকে পেলে আমার সংসারে সোনার ফসল ফল্‌বে। সামনের পুজো পেরোলেই অঘ্রানে আমি উৎসব লাগাবো।

প্রভাত হেসে বলে—তোমার এই ছোট বাড়িতে কুলুলে হয়।

মা বলেন—স্বপ্ন দেখ্‌তে ছোট বাড়ি বাধা দেয় না। আয়, মা-কালীর প্রসাদটুকু নে দিকি।

হাত পেতে সন্দেশটুকু নিতে-নিতে প্রভাত বলে—তোমার ঐ কালীর মতো একটি মেয়ে জুটিয়ে দিতে পার ত' দেখ। আর লক্ষ্মী নয়, দু' একটি কালী পেলে দেশের হয় তো কালিমা ঘোচে।

রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

নিজের ছোট ঘরটিতে একা প্রভাত তার ভাঙা চেয়ারে চুপ করে' বসে' আছে,—সামনের কেরোসিন-কাঠের নড়বড়ে টেবিলের ওপর ছোট টাইম্-পিস্ ঘড়িতে দু'টো বাজে—প্রভাতের চোখে ঘুম নেই।

জান্‌লাগুলি খোলা, কৃষ্ণ-পক্ষের ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না মেঝের এক ধারে এলিয়ে পড়েছে। অস্থিরপদে খানিকটা পাইচারি করে' প্রভাত আবার এসে চেয়ারে বসলো।

এক-এক করে' তিনটি বছর খসেছে, হিসাব করে দেখলো একহাজার পঁচানব্বুই দিন। দিগ্বধূর ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এতগুলি মুক্তো। প্র ভাত তা ধূলায় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে, কুড়িয়ে রাখেনি। তিনটি বৎসরকে মিনিটে ভাগ করতে প্রভাত হাঁপিয়ে উঠলো,—এতগুলি মুহূর্ত ধ'রে সে বরাবর নিশ্বাস নিয়েছে, ক্লান্তিতে থেমে পড়ে নি। তিন বছর পেরিয়ে এসে আবার ও চেনা আকাশের হাতছানি পেল। প্রভাত এতদিন বেঁচে ছিল কি করে' ? এতদিন স্বচ্ছন্দচিত্তে নিশ্বাস গ্রহণ করবার ওর সামর্থ্য ছিল বলে' ও একেবারে অবাক হ'য়ে গেল। আনন্দে আত্মহত্যা করা যায়—এমন কথা অবিশ্যি প্রভাত কোনো দিন শোনে নি, কিন্তু জগতে এমন ব্যাপারও আজ সম্ভব হ'তে পারে। চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রভাত জানলায় এসে ফের দাঁড়ালো। আকাশের আরো বড়ো হওয়া উচিত ছিল, জীবনকে এত ক্ষণস্থায়ী করে' বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলের এমন কি মর্যাদা হয়েছে।

প্রভাত ভাবছিলো এমনটি না হ'য়েই যায় না। দিনের আলোয় আকাশের তারা কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে—অন্ধকারে আবার তারা চোখ চেয়েছে। একমাত্র আশাই আকাশ উত্তীর্ণ হ'তে পারে—সেই আশা কি ধূলায় লুণ্ঠিত হবে ? বিচ্ছেদে প্রভাতের বিশ্বাস নেই, সেই ছেদ শুধু ছন্দেরই রূপান্তর। এ যে ঘট্‌বে প্রভাত জান্‌তো, ভালো করে'ই জানতো। না ঘটে'ই যে পারে না। এ ঘট্‌বে বলে'ই প্রভাত দুই হাতে এতগুলি দিন-রাত্রির উদ্বেল সমুদ্র সাঁত্‌রে এসেছে।

এই নিয়ে বোধ হয় তিরিশবার চিঠি পড়া হ'ল :

জলপাইগুড়ি

হাতের লেখা বদলাতে পারে কিন্তু আমি বলতে যাকে বুঝি তা বদলায় নি। চিনতে পাচ্ছ ত? তোমার সেই অশ্রু।

বহুদিন পরে তোমার মনের মুকুরে আবার আমার ছায়া ফেললাম। নিভৃতে আবার আমাদের শুভদৃষ্টি হোক্।

চিঠি লিখো শিগগির। পরে অনেক কথা আছে ইতি।

অস্পষ্টরূপে জানতো বটে আবার ডাক পড়বে, কিন্তু আজ কেন যে হঠাৎ ডাক পড়্লো সেই সমস্যারই সমাধান হচ্ছে না। প্রভাত ঘেমে উঠলো। ভাবলো, যে-দিনই ডাক্‌তো সেই দিনই এম্‌নি চম্‌কে উঠবার কারণ ঘট্‌তো, আজকের বিশেষ কোনো উত্তরের জন্যে অধীর হওয়া নিতান্ত বোকামি! চন্দ্রের ওপর পৃথিবীর ছায়া কতক্ষণ থাকে জ্যোতির্বিদরা তা নিয়ে আঁক কষুক,—চাঁদও ঘুরছে, পৃথিবীও ঘুরছে। প্রভাত তর্ক করবে না, বিশ্বাস করবে।

রাইটিং প্যাড-এর খান পঁচিশ পাতা ছিঁড়ে প্রভাত শুধু এইটুকু লিখতে পারলো:

ভালো করে' চিনতে পাচ্ছি না। তুমি আমার সেই অশ্রু।

ফেরত ডাকেই চিঠি এলো :

তোমার সেই অশ্রু বটে কিন্তু গলানো অশ্রু নয়। একটু কঠিন, জমাট বরফের মতো। অথচ ঠাণ্ডা।

মনে হোল তুমি ভালো আছ। অনেক দিন কোনো খবর পাইনি—তাই চিঠি লিখতে ভারি ভয় হচ্ছিল। আরো মনে হলো আমাকে একেবারে ভুলে যাও নি। আমি লিখিনি বলে' তোমাকেও লিখতে হ'বে না—এ নিয়মটা ভারি সভ্য নিয়ম। আমি অত সভ্যতা পছন্দ করি না। আমার নামে নিশ্চয়ই অনেক গুজব শুনেছ। ইস্কুল-টিচারি করতে এলে অনেক আজগুবি গুজবের পসরা বইতে হয়। আমি আর বইবো না ভাব্‌ছি, বেরুবো।

বেরুবো,—তোমার সঙ্গে। তুমি আমার এই চিঠি পেয়েই এখানে চলে আসবে। চাকরি করছ নাকি আজকাল? অত ছোট চিঠি লিখতে তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো শুনি? যদি চাকরি থেকে ছুটি না পাও কাজে ইস্তফা দিয়ে আসবে। আমি এই তিন বছরে মন্দ টাকা জমাইনি। পুরুষই খালি সংসার বহন করবার গর্ব্ব ভোগ করবে আর স্ত্রী-জাতিকে কৃপাপাত্রী করে' রাখবে—এটা একটা বর্ব্বর প্রথা। বন্ধুত্বের বেলায় divine right of sex খাটে না, বুঝলে?

টাকার কথা শুনে এবারো যদি অপমানিত বোধ কর, তা হ'লে বুঝবো তোমার ছেলেমানষি আজো যোচেনি। তুমি এখনো সেণ্টীমেণ্টাল যুগে বাস করছো। তিন বছরের অদর্শন মনের একটা খুব ভালো স্বাস্থ্যকর টনিক. তুমি কি বল? আবার আমরা পরস্পরকে নতুন করে' দেখবো—জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্লাট্‌ফর্মে।

হ্যাঁ, ভালো কথা—এই প্রশ্নটা মন থেকে তাড়াতে পাচ্ছি না, বিয়ে করনি ত'? যদি বিয়ে করে থাক, তবে দিন কয়েকের জন্য বৌর সঙ্গে ধর্মঘট করে' এখানে হাওয়া বদলে যেয়ো। আর যদি ধর্মঘট করার অসুবিধা ঘটে, তোমার ধর্ম যা বলে তাই করো। এসো কিন্তু। কেমন? ইতি।

চিঠি পড়ে' প্রভাত লাফিয়ে উঠলো। জলপাইগুড়িটা কলকাতা থেকে তিন শো বারো মাইল দূরে কেন? মুহূর্ত্তে মাইলের পর মাইল উড়ে' যাবার জন্য মানুষের আয়ত্তাধীন কোনো যন্ত্র এতদিনে আবিষ্কৃত

হওয়া উচিত ছিলো। সুইচ্ টিপলেই যেমন অতি-সহজে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে' ওঠে, তেমনি মনে করা মাত্রই প্রিয়ার সশরীর আবির্ভাবের কোনো একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন না কেন? (মোট কথা, মানুষেব একজোড়া পাখা থাকলে ভালো হ'ত, মিনিটে সে-পাখা তিন শো মাইল পার হ'য়ে যাবে।)

সত্যি, অশ্রুকে সে ভালো করে' মনেও করতে পারছে না—সব কি-রকম ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। তিন বছরের আগের অশ্রুকে কল্পনা করে' ওর তৃপ্তি হয় না, ও নতুন অশ্রুকে দেখতে চায়, অনাবিষ্কৃত অশ্রুকে। নূতনতর উপলব্ধির আশায় প্রভাত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

চিঠিটা জামার পকেটে দুমড়ে রেখে তক্ষুনিই মা'র কাছে গেলো ছুটে। মা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে' বঁটি পেতে তরকারি কুট্‌ছিলেন। কাছে বসে' নাটু আলু নিয়ে লুফবার চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে আপন মনে খিল-খিল করে' হাসছে।

প্রভাত প্রসন্ন মুখে বললে—মা, আমি জলপাইগুড়ি যাচ্ছি।

মা প্রশ্ন করলেন—হঠাৎ?

প্রভাত মেঝের ওপর বসে' পড়লো। বললে—একটি বন্ধু ডেকেছে, মা।

মা'র আবার সন্দেহ করবার কারণ ঘট্‌লো। বললেন—কে বন্ধু?

প্রভাত জবাব দিলে: তাকে তুমি চিনবে না, মা।

—কলেজের বন্ধু? ছেলেবেলার?

প্রভাত না বলে' পারলে না: বহু জন্মের। কথাটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না, মা। মোটকথা, জলপাইগুড়ি আমাকে যেতে হ'বে। তোমার অনুমতি চাই।

মা বললেন—আমার চেয়ে আফিসের অনুমতির দাম বেশি। ছুটি পাবি এ সময় ?

প্রভাত বলে' বস্‌লো : ছুটি যদি না পাই, চাকরিতে সেলাম ঠুকেই আমাকে ছুটতে হবে।

মা এবার রীতিমত ভয় পেলেন। বললেন—এমন তোর কে বন্ধু ? চাকরি দেবে ?

প্রভাত হেসে বললে—চাক্‌রি কেড়ে নিয়ে বাউণ্ডুলে করে' ছাড়বে। আর চাকরি জোটাবে না, মা।

মা'র তরকারি কোটা বন্ধ হ'য়ে গেল। বললেন—হেঁয়ালি রাখ্‌। কি ব্যাপার খুলে' বল্‌।

প্রভাত কুণ্ঠা দমন করে' অশুর চিঠিটা মা'র হাতে তুলে দিলো। চিঠি পড়ে' মার মুখ গেল শুকিয়ে। চিঠিটা মুড়তে-মুড়্‌তে বললেন—এ আমি পছন্দ করি না। এর জন্যে চাক্‌রিতে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হ'বে, এটার মধ্যে যে অসংযম আছে তাকে আমি ঘৃণা করি। তোর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুলো কি করে' ?

প্রভাতের এবার লজ্জা করতে লাগলো। বললে—আচ্ছা, আফিসে একটা দরখাস্ত করে' দিচ্ছি—আজই। যদি ছুটি না মেলে ? তবে আমাকে এখেনেই চুপ করে' বসে' থাকতে হ'বে ? এতটা সংযমই কি ভালো ?

মা কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, প্রভাত বাধা দিয়ে বললে,-তোমার উপদেশের উপকারিতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান নই, চাক্‌রি বাঁচিয়ে রেখেই আমি কলকাতা থেকে পা বাড়াবার চেষ্টা করবো, কিন্তু যদি ফস্‌কে যায়, যাবে। জলপাইগুড়ি যাবো মানে, আমার দিন কয়েক অসুখ করবে—ছুটি পাবো বোধ হয়। যদি নাই পাই, তোমাকে

জানিয়ে রাখা ভালো মনে করে' চিঠিটা আর লুকোলাম না। জীবনে মানুষ দু'টি নারীর আশ্রয় পায়—এক মা, আর প্রিয়া। তুমিও আমার বন্ধু, মা। এ আনন্দ তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি কি করে'?

মা ফট্ করে' বলে' বসলেন—কিন্তু অশ্রু তোকে বিয়ে করবে?

—কথাটাকে পাল্টে বল মা, তুই কি অশ্রুকে বিয়ে করবি? সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত আজ তোমাকে জানালে তুমি ভীষণ চম্‌কে উঠবে; সে-সিদ্ধান্তটা আমারো নবলব্ধ। পরে তোমাকে জানাবো, মা; নিশ্চয়। বিয়েটাকেই নরনারীর সম্পর্কের চরম পরিণতি মনে করে' আত্মবঞ্চনার দিন চলে' গেছে। বিয়ের চেয়ে বন্ধুতাটাই বড়ো জিনিস।

—কিন্তু সে-বন্ধুতা টিঁকলে হয়!

—যদি না টেঁকে, তবে তাকে রঙীন সুতো দিয়ে বেঁধে আট্‌কে রাখা যায় না, মা। পেয়ে হারানোর চেয়ে হারিয়ে পাওয়া ঢের ভালো।

মা মুখ ভার করে' বললেন—কিন্তু যে-মেয়েটিকে আমি ঘরের বউ করব বলে' ঠিক ক'রে রেখেছি তাকে তুই কিছুতেই ফেল্‌তে পারবি না, প্রভাত। এ-সব হতচ্ছাড়া প্রেমে সুফল হয় না কোনো দিন।

—সুফলের জন্যে তো সেই অঘ্রান-তক বসে' থাকতে হবে। তার আগে পূজো। একটা লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে' দি। কিছু পাওনাও হয় ত' আছে। তিনটি প্রাণীর জন্যে দরকার হ'লে আর একটা ছোট-খাটো চাকুরি বাগিয়ে নেওয়া যাবে হয় ত'। কিন্তু শুভদিন মানুষের ভাগ্যে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে না, মা। সময়ের চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরা চাই। বলে' প্রভাত বেরিয়ে গেলো।

মা তক্ষুনি মনে মনে ছেলের শুভবুদ্ধির জন্যে মা-কালীর কাছে মানত করলেন।

ঘরে গিয়ে প্রভাত কালি-কলম নিয়ে বসলো। চিঠিটা হলো এইরূপ :

আফিসে দরখাস্ত করে দিলাম। শনি, রবি নিয়ে সম্প্রতি তিন দিনের ছুটি পাবো মনে হচ্ছে। তিন বছরের পর তিন দিন যথেষ্ট নয়, জানি। কিন্তু কোনো মেয়ের জন্যে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আসার সেন্টিমেন্টাল্ যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। সৌভাগ্যবশতই বলতে হবে। কেন না বন্ধুতা টেঁসে গেলেও চাকরিটা টিঁকে থাকবে। অন্নসমস্যার দিনে সেটা কম কথা নয়।

মোটকথা, শুক্রবার ভোরে সাড়ে পাঁচটায় সময় স্টেশনে থেকো। যদি একান্তই ছুটি না পাওয়া যায়, টেলি করবো। কিন্তু, পারবো কি না গিয়ে? মা সংযম অভ্যাস করতে বলেছেন, তিন বছরের সংযম কি যথেষ্ট নয়? অশ্রু কি বলেন? ইতি।

নাটুর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রভাত মা'র পায়ের ধুলো নিলে। বাঁ বগলে ছোট বেডিং ও ডান হাতে সুটকেশ নিয়ে প্রভাত তিন-নম্বর বাস্ ধরতে বেরিয়ে পড়লো।

মা নাটুকে নিয়ে শুতে এলেন। সারা রাত তাঁর চোখে ঘুম এলো না,—দুশ্চিন্তায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। তবু ভাগ্যিস, তিন দিন ছুটি পাওয়া গেছে। সোমবার সকালেই যে প্রভাতের ফিরে আসা চাই এ বিষয়ে তিনি মাথার কিরে দিয়ে দিয়েছেন,—প্রভাত তা খেলাপ করবে না। এতদূর অধঃপতন তা'র হবে না হয় ত',—কিন্তু বলা কি যায়? বালুচরে পা আটকে যেতে কতক্ষণ?

যে-মেয়ে বিয়ের সভা থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে তাকে তিনি পুত্রবধূরূপে কল্পনা ক'রে সুখ পান না। তিনি ত' আর জানেন না সেই মেয়ে কিসের জন্যে বেরিয়ে এসেছিল। জানলেও হয় ত' ক্ষমা করতেন না, কেন না এত বড় বিদ্রোহাচরণের মধ্যে সাহসের চেয়ে নির্লজ্জতাই প্রকাশ পেয়েছিলো বেশি। অশ্রুর পরিবার তাই তার মুখের ওপর তাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে - ও আজ পথচারিণী, মাথায় ওর কলঙ্কের কুলো; এই মেয়ের জন্যেই ছেলে তার বেহেড্ হ'য়ে ছুটে গেলো ভাবতে মা চোখের জলে বালিশ ভেজাতে লাগলেন।

কিন্তু এ কয় দিনে প্রভাতের চেহারা এত সুন্দর ও সতেজ হ'য়ে উঠেছে—ওর মুখে দীপ্তি, কাজে-কর্মে উৎসাহ—ছেলেকে এমন প্রসন্ন তিনি আর দেখেন নি আগে। মরা শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে। প্রভাত যেন এ-ক'টা দিন সেতারের তারের মতো বেজেছে—হাতে ওর স্পর্শমাণ! বিধাতা মানুষকে খুসি করেন, কিন্তু এমন সর্বস্বান্ত হ'বার লোভ দেখিয়ে কেন? রিক্ততা না এলে কি পরিপূর্ণ মুক্তি নেই?

মা তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা—এই আঙুল দুটিকে তুলে ধরে' নাটুকে বললেন—একটা আঙুল ধর্ ত', নাটু।

মধ্যমা ধরলেই প্রভাত শুভেলাভে সোমবার ভোরে ফিরে আসবে, নচেৎ—তর্জনী-সম্বন্ধে কিছুই তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধ ছেলে মা'র হাতখানি অনুভব করে' করে' আঙুল তুলবার জন্যে মুঠি মেললো। মা তাঁর নিজেরই অজানতে মধ্যমাটি নাটুর প্রসারিত করতলে ধীরে এনে স্পর্শ করালেন বোধ হয়। নাটু নিবিড় করে' তাই মুঠি চেপে ধরলো! স্বস্তিতে মা'র বুক ভরে' গেলো। এবারে ঘুমোবার জন্যে চোখ বোজা যাবে।

দার্জিলিং মেইল্ ত' ছাড়্লো। বারাকপুরের পর স্পিড্ দিয়েছে।

ইণ্টার ক্লাসের টিকিট। প্রভাত ভেবেছিলো কোনো রকমে একটু জায়গা করে' সতরঞ্চিটা পেতে লম্বা হ'য়ে পড়্বে। একেবারে পার্বতীপুরে গিয়ে জাগ্বে—টাইম্-টেবিল্ মিলিয়ে দেখলো তখনো বেশ অন্ধকার থাকবে, বাড়িতে হ'লে ডি লা. মেয়ারের কবিতা পড়তো; কিন্তু ট্রেনে এর পর আর ও চোখের পাতা এক করতে পারবে না—জানলা দিয়ে সুদূরবিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চেয়ে থাকবে। ওর চোখের সামনে আস্তে-আস্তে অন্ধকারের পর্দা উঠে যাবে ওর চোখের সামনে আকাশ উদ্ঘাটিত হ'যে—ভাবতে ওর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ট্রেনে বসে' শেষ রাত্রিটুকু জাগার মতো সুখ নেই।

একে আর ভিড় বলে না,—প্রভাত সতরঞ্চি পাত্লে। গাড়ি ছাড়তেই শুয়ে পড়্লো। কিন্তু না আছে দার্জিলিং মেইল-এর স্পিড্, না আসে ঘুম। ঘুম না এলে ও মনে-মনে অনেক আজগুবি ছবি আঁকে, হয়ত' পুরীর সমুদ্র সাঁতারে যাচ্ছে, হয়ত' মোহনবাগানের হ'যে সতেরো মিনিটে সাতটা গোল স্কোর্ কর্লে, হয় ত' বা বিলেতের কোয়েকার্ সোসাইটি ওকে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করে' প্যাসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে, ও সমুদ্র দিয়ে নয়, ওভারল্যাণ্ড-এ দেশ দেখতে-দেখতে রওনা হ'ল—বোগ্দাদেই আট্কা পড়ে গেলো বুঝি, যদি যেতে হয় ট্রেনে নয়, উড়ো জাহাজে যাবে এবার। কিন্তু আজ 'মনের মুকুরে যার ছায়া পড়েছে' কোনো আঁচড় টেনেই তাকে আড়াল করা গেল না। মুস্কিল। ট্রেনের আস্তে চলাটাও কখনো কখনো হার্টের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অতএব গাড়ির শেকল টেনে দেওয়া উচিত। থামবার জন্যে নয়, চলবার জন্যে।

প্রভাত উঠে বস্লো। এক যুগ কাটিয়ে এসে এতক্ষণে। কি না রানাঘাট। আকাশে মেঘ করেছে বুঝি। বৃষ্টি হ'লে মন্দ হয় না,

বৃষ্টি থামবার আশায় কান পেতে থেকে কতক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে। বৃষ্টি তো এক সময়ে থামবেই। সঙ্গে একটা বই বা খবরের কাগজ পর্যন্ত আনেনি যে পড়বে। কী-ই বা পড়তো? একটা ছবির বই আনলে মন্দ হ'ত না, কিংবা যোগাড় করে' কোনো pornography। মনোযোগ আট্‌তে থাকতো হয় ত'। যাক্ গে, পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা যাক:

—কদ্দুর যাচ্ছেন?

—রংপুর। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করতে হবে। হাঙ্গাম, মশাই। শেষ রাত্রেই ঘুমটা চেয়ে আসে। পড়ি ঘুমিয়ে, পার্বতীপুর পার হ'য়ে যাক। টিকিট ছিল সেকেণ্ড ক্লাসের—ভেবেছিলাম গার্ডকে পার্বতীপুরে জাগিয়ে দেবার কথা বলে' নবাবি করে' একটু ঘুমুব, কিন্তু শালারা একটা বেঞ্চিও খালি রাখেনি। টিকিট বদ্‌লাবারো সময় হ'ল না। একেই বলে ভাগ্য, মশাই। টাকাও গেল, টাকও ঢাকলো না।

—বার্থ, আগে রিজার্ভ করেন নি কেন?

—এই দুর্ভোগ সইতে। দূর থেকেই ভোগ করছি আর কি! এখন পৌছতে পারলে হয়। পেছনে শনি বেশ শানিয়েছেন বুঝলাম। ট্রেনে এখন কলিশান না হ'লে বাঁচি!

প্রভাত চম্‌কে উঠলো। সত্যিই ত', যদি দুর্জয় ধাক্কা লেগে দার্জিলিং মেইল্ খান্ খান্ হ'য়ে যায়! এতে আশ্চর্য হবার ত' কিছুই নেই,—হামেসাই ত' হচ্ছে। ঢাকা মেইল উল্টোল, গয়া এক্‌সপ্রেস্ একসা হ'য়ে গেল। প্রভাত আরেকটু হ'লে চেঁচিয়ে উঠেছিল আর কি! কিন্তু না, দার্জিলিং মেইল্ এত দুর্বল হবে না। কে জানে? টাইটানিকো তলিয়ে গেছে। ও যদি আজ মরে' যায়—ওর চোখের সামনে আকাশ যদি আজ আর আত্মপ্রকাশ না করে—কি হয় তা হ'লে?

ও আকাশের ওপারে চলে' গিয়ে অশ্রুকে অশ্রু-সমুদ্রের পার থেকে লুট ক'রে নিয়ে যাবে। অলিভাব্ লজ্-এর ওপর ওর আস্থা আছে। অত কথায় কাজ কি? জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে আজকের রাতের জীবনটুকুর জন্যে ভিক্ষা চাইলে এমন কি অপমান হবে? ঈশ্বব নাই বা থাকলেন, তাব জন্যে একটু প্রার্থনা করলেই কি গঙ্গার জল শুকিয়ে উঠবে? সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রত্যহের ভূগোলে অস্ট্রেলিয়া বলে'ও ত' কোনো দেশ নেই। তাই বলে' মনে-মনে সে দেশ বেড়িয়ে এলে ওকে মারে কে শুনি?

বসে', শুয়ে, স্টেশনে খাবাব খেয়ে, সিগারেট ফুঁকে, মনে-মনে আঁক কষে', যাত্রীদেব চেহারা দেখে-দেখে তাদেব মনেব অবস্থা আন্দাজ করে'-কবে' (একটি যাত্রীও প্রেম পড়ে নি) প্রভাত কোনোরকমে রাত প্রায় কাবাব কবে' এনেছে। দার্জিলিং মেইল্ বেসামাল হয় নি যা হোক্। আকাশে আলোব ছোঁয়াচ লাগলো বুঝি। দু'একটা করে' পাখি উড়তে স্বরু কবেছে। ফুবফুবে তাদেব পাখা। ঘুমো আকাশেব চোখ। বৃষ্টি না হ'য়ে ভালোই হয়েছে। ঝক্কেটে। হয় ত' ঠিক সময়ে অশ্রু এসে প্ল্যাটফর্মে পৌছতে পাব্‌তো না। আকাশেব রসিকতা করাব একটা সময়-অসময় আছে। ঘোড়াব গাড়ির গাড়োয়ানদের অযথা কষ্ট হতো।

মাইল্-পোস্ট-এর দিকে তাকিয়ে দেখলো জলপাইগুড়ি পৌছুতে আব মোটে সাত মাইল বাকি। এবার স্বচ্ছন্দে দার্জিলিং মেইল্ ডিরেইল্‌ড্ হ'তে পাবে,—প্রভাত সাত মাইল পায়েই মেরে দিতে পারবে খুব। গ্রে ষ্ট্রীট এর মোড় থেকে ও হাজরা রোড্ পর্যন্ত অনেক হেঁটেছে, অনেক। কিন্তু না, দার্জিলিং মেইল্ বেশ ভদ্র। বাধ্য ছেলেটিব মতো সুড়সুড় করে' এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, আর দুই কদম। এঞ্জিনের

ফুঁ-টা আরো জোরে হওয়া উচিত ছিল। জলপাইগুড়িটা যেন কিছু নয়!

আঃ! ফিলিপ সিড্‌নির হাত থেকে জলের গ্লাশ পেয়ে মুমূর্ষু সৈনিক এর চেয়ে বেশি আরাম পায়নি। প্রভাত তাড়াতাড়ি বিছানাটা গুটিয়ে নিলে। ভগবান নেই এমন কথা যদি এখন কেউ বল্‌তে আসে, প্রভাত তার সঙ্গে আদপেই তর্ক না করে' একটা ঘুসি মেরে বস্‌বে হয় ত', কিন্তু তারো কাজ নেই—গোলমাল বাধতে পারে। তার চেয়ে সোজাসুজি নেমে পড়াই ভালো। ট্রেনটা থামুক। চলন্ত ট্রাম থেকে নামবার ওর অভ্যেস আছে। কিন্তু চলন্ত ট্রেন থেকে নামবার কোনো মানে নেই,—প্ল্যাটফর্ম পালিয়ে যাচ্ছে না। আরে মশাই, দরজার কাছে মাল-পত্তর নিয়ে এত ভিড় করলে কি চলে? সমস্ত দিন ধরে' আপনিই নাম্‌বেন নাকি? আচ্ছা ভদ্রলোক ত'!

প্ল্যাটফর্ম। তা হ'লে নামা গেল! দার্জিলিং মেইল-এর জন্যে আর ভাবনা নেই। পাতালে যাক্। প্রভাত পা বাড়ালো।

কে যেন এগিয়ে আসছে। মেয়ে নিশ্চয়ই। প্রভাতের ততটুকু দৃষ্টিশক্তি আছে। নেহাৎই বাঙালি হ'য়ে জন্মেছে, নইলে প্রভাত নিশ্চয় নাম ধরে' ডেকে উঠতো। অনর্থক লোকদের হকচকিয়ে দিয়ে লাভ নেই। এখন অন্ধকারো ফুরিয়ে গেছে। কণ্ঠস্বরটা নিশ্চয়ই সঙ্গত হত না।

হ্যাঁ, অশ্রুই বটে। প্রভাত ঠিক চিন্‌তে পেরেছে, নিশ্চয়ই। চেহারাটা একটু ভালো হয়েছে মনে হচ্ছে; ভালো হয়েছে মানে অল্প একটু মোটা হয়েছে। বিয়ে না হ'য়ে বাঙালি মেয়ের স্বাস্থ্য ফেরার দৃষ্টান্ত দেখে প্রভাত মনে মনে খুসি হ'য়ে উঠলো। মাঝে ওর কানে একটা উড়ো খবর এসেছিল যে অশ্রুর ফুস্‌ফুসের ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা হয়েছে,—কথাটায় কান দিলেও প্রাধান্য দেয়নি, কারণ অশ্রুর আহ্বান যে কোনকালে ফের শ্রুত হ'বে এ-ধারণা তখন ছিলো না। ফলাফল জান্‌বার জন্যে তাই সে উৎসুক হয়নি। এই মোটা হওয়াটুকু হয় ত' সেই 'অটো ভ্যাক্‌সিন্'-এর—ঠিক ফল নয়, ফুল!

বছরে বেড়েই যদি থেমে পড়্‌ত তা হ'লে পিপের মতো গড়্‌গড়িয়ে গড়িয়ে দেওয়া যেত হয় ত'। কিন্তু না; মাথায়ো অশ্রু বেশ ঢ্যাঙা হয়েছে। গ্লাশের কিনারা বেয়ে উপচে-পড়া উচ্ছ্বসিত সুরার ফেনার মতো অশ্রুর যৌবন,—উষার অঞ্জলি-উৎসারিত আলোর নিবেদনের মতো। কথাটাকে ছোট করে' বলা যেতে পারে—একটা কনকচাঁপা, উগ্র, উজ্জ্বল, মদির! এত রূপ যেন আর কোন দিন দেখেনি—ঝড়ে নয়, সমুদ্রে নয়, মৃত্যুর সুগম্ভীর আবির্ভাবেও নয়। জীবনে যেন জোয়ার ডেকেছে। দুই চোখে এতরূপ যেন কুলিয়ে উঠছে না। প্রভাত যেন তার চোখের সাম্‌নে অরোরা-কে দেখছে। ও পা বাড়ালো।

পায়ে গ্রিশিয়ান্ স্যাণ্ডেল, এবং পায়ের পাতা থেকে সুরু করে' আটপৌরে চওড়া-পাড় শাড়িটি দেহবল্লরীকে বল্লভস্নেহের মতোই আবেষ্টন করে' উঠে গেছে, মাথায় ছোট একটুখানি ঘোম্‌টা, হেয়ার পিন্ দিয়ে আঁটা নয়। অতএব এগিয়ে আস্‌তে গিয়ে ঘোম্‌টা গেল খসে,' এবং সেটা ফের তুল্‌তে গিয়ে খোঁপার ওপর বেকায়দায় হাতটা লাগতেই খোঁপাটা কাঁধ বেয়ে পিঠের ওপর ভেঙে পড়লো। চুলে অশ্রু

কি তেল মাখে? এত ঘন এত পুঞ্জিত হ'ল কি করে'? আচ্ছা শিঙল্ড্ হ'লে অশ্রুকে কেমন মানাবে? ঠোঁঠে তার জন্যে লিপ্স্টিক্ দেওয়া চল্‌বে না! অশ্রুর ঠোঁট দুটি ভারি হ'য়ে ভালই হয়েছে। মেয়েদের পাতলা ঠোঁট ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক নয়। নিশ্চয়ই অশ্রুর আজ ঘুম থেকে জাগতে দেরি হয়েছে, তাই শাড়িটা তাড়াতাড়ি বদলে আসতে পারে নি। মুখের উপর ঘুমের যে মলিনতাটুকু লেগে আছে তা ঘুমেরই মতো সুন্দর।

দু'জনে এগিয়ে আসতে লাগলো। ওদের ডান হাত দু'টোতে কখন যে কক্‌টেইল্ হয়ে গেল কেউই ঠিক ঠাওরাতে পারলো না! দু'টি দেহ যেন নদীর সেতুর দুই পারের স্তম্ভের মতোই অবিচলিত রইলো—বীণার মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো না যা হোক্। কারণ হয়ত' এই যে, ওরা যেন এমনি পরস্পরের স্পর্শলাভের অভ্যাসে এখানে এখন অসাড় হ'য়ে গেছে। সত্যিকারের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় বেশিক্ষণ হাতে হাত ঠেকিয়ে থাকা যায় না। ভীষণ ভিড়, লোকের তত নয়—চোখের।

অশ্রু কথা বল্‌তে পারলো: এই তোমার জিনিস? চল।

প্রভাত অশ্রুর চোখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—কোথায়?

—আমার হাতে সুটকেস্‌টা দাও। আপাতত একটা ঘোড়ার গাড়িতে ত' গিয়ে উঠি,—যাবার জায়গা আছে।

প্রভাত সুটকেস্‌টা ছাড়'লো না। বললে—এটুকু ভার বইবার আমার ক্ষমতা আছে। চল।

গাড়িতে উঠবার আগে পা-দানিতে পা রেখে অশ্রু একটু পিছন ফিরে বললে—সুটকেস্‌টা আমার হাতে দিলেই ভালো করতে, কেননা রাজ্যি শুদ্ধ্ লোক আমার দিকে এমন ভাবে চাইছিলো যে তোমার

সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেন কত সন্দেহের! এই সব লোকগুলোর ফাঁসি হয় না কেন?

প্রভাত দেখলো কথা বলতে ওর রীতিমত অসুবিধে হচ্ছে। স্নায়ুগুলো হঠাৎ যেন নিস্তেজ হ'য়ে পড়লো। ট্রেনেই রোজকার মত মুলার্ এর কতকগুলি 'ফিগার' করে' এলে পারতো। এত অবসন্ন লাগবার ত' কথা নয়! সমস্ত রাত্রি ধরে' যে-জিভে ওর কথার সুড়সুড়ির শেষ ছিল না সে-জিভ হঠাৎ মরে' শুকিয়ে গেল নাকি? এত ঢোঁক গিলবার অভ্যেস ওর কোনো কালে ছিলো না বলে'ই ত' মনে হচ্ছে।

প্রভাতের মুখোমুখি বসে' অশ্রু বল্লে—পাশে বসলে কথা বলার অসুবিধা হবে। তারপর দুই চোখে একটি কমনীয় কৌতুক নিয়ে শুধালো: তারপর?

প্রভাত পা দুটো একটু ছড়িয়ে, বুকটা সামান্য একটু ফুলিয়ে স্নায়ুগুলোকে শাসন করলে; বল্লে—তারপর আর কি? জলপাইগুড়ি চলে' এলাম। এখন জল পাই তবেই হয়।

অশ্রুর দাঁত দেখা গেল। প্রভাত মুক্তো কোনো দিন দিখেনি, তবু ভাবলে সারি সারি মুক্তো অমন হ'লে তার অমর্যাদা হ'বে না। বললে,—জল না পাও, জলপাই পাবে। দাঁত যাবে টোকে।

প্রভাত। সে-জল্পনা ক'রেই ত' এসেছি।

অশ্রু। দাঁড়াও, দেখি আর হয় কি না। (ভাবিয়া) হয় না, না হোক্, (থামিয়া) তারপর, আছ বেশ?

প্রভাত। ছিলাম বেশ। এখন কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠছি।

অশ্রু। কেন?

প্রভাত। তাই যদি জানতাম ত' ছুটি না পেয়েও ছুটে আসতাম না।

অশ্রু। ছুটি পাও নি? কি হবে তবে?

প্রভাত। কি আবার হবে? আমার অসুখ করতে পারে না? (একটু হাসিয়া) আমার অসুখই ত' করেছে।

অশ্রু। (চমকিত) অসুখ?

প্রভাত। (দিব্যি কইতে পারছে) অসুখ ছাড়া আর কি! নইলে সুস্থ থাকলে কেউ এমনি হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে আসে নাকি?

অশ্রু। (গম্ভীর) কথাটা ফিরিয়ে নাও, নইলে কথা কইবো না।

প্রভাত। এর ওপর আবার যদি কথা না কও, তা হ'লে দয়া করে' কোচোয়ানকে গাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বল। হাসপাতাল থেকে পরে একেবারে পাতালে।

অশ্রু খিলখিল করে' হেসে উঠলো। পরে গম্ভীর হ'বার ভান্ করে' বললে—কালই তোমাকে কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হ'বে।

প্রভাত। কালই এটা বলি, তাই তোমার এ কথায় আশ্চর্য হ'লে শোনে কে? শুনেছি আজ রাত্রেই একটা ট্রেন আছে। যাবার সময় নিশ্চয়ই এবার ঘুমুতে পাব।

অশ্রু। তোমার সারা রাস্তা ঘুম হয়নি? কাল রাতে ভারি গরম ছিলো, না?

প্রভাত। তাই তোমারো ঘুম হয় নি মনে হচ্ছে।

অশ্রু। না, তা কি আর হয়েছে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ত' চেহারা ফিরিয়ে দিলাম।

প্রভাত। এবার আমাকেও ঘুমোবার জন্যে ফিরিয়ে দাও।

অশ্রু। আহা! তোমার সঙ্গে as if আমার কোনো কথা নেই!

প্রভাত। আছে নাকি? কতটুকু সময় লাগবে? বলেই ফেল না।

অশ্রু। ঐ ত বললাম: তারপর?

প্রভাত। 'তারপর'-এর কোনো উত্তর হয় ?

অশ্রু। উত্তর যদি কিছু না-ই হয় চুপ করে' থাকো। মাথায় অতোগুলো চুল রেখেছ কেন ?

প্রভাত। তুমি রেখেছ কেন ? সত্যি, তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে !

অশ্রু। আর গোঁফ জোড়া নির্মূল করে' তুমি যে কী অপরূপ হয়েছ বাঁদরের মতো—

প্রভাত। আমার অপমান বোধ করা উচিত কি না, তুমি বল তোমাকে চামচিকে বললে তুমি চিমটি কেটে দেবে না ?

অশ্রু। (অন্যমনস্ক) দেব ত', কিন্তু এসে পড়লো যে। তুমি এখানে নাম'। এটা ডাক-বাংলো। সঙ্গে টাকা আছে ত' ?

গাড়ি থামতেই প্রভাত নেমে পড়লো। ডাক-বাংলোর বেয়ারা এসে জিনিস দুটো ভেতরে নিয়ে গেলো। অশ্রু গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো,—বিকেলে আসবো। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো কিন্তু। আমি আগে থেকেই এখানে সব বন্দোবস্ত করে' রেখেছি—তোমার ভাবতে হ'বে না।

গাড়োয়ানকে গাড়ি-ভাড়াটা দেওয়া সঙ্গত হ'বে কি না প্রভাতকে ভাববার অবকাশ না দিয়েই গাড়ির চাকা চারটে ঘুরে গেলো।

সেই গাড়ি ক'রেই অশ্রু তার স্কুলের কোয়ার্টারে ফিরে এলো ভাড়া চুকিয়ে ভেতরে বারান্দায় ঢুকেই দেখলে বুলু (আরেকটি শিক্ষয়িত্রী) মুখে টুথ-ব্রাশ ঢুকিয়ে এক-মুখ ফেনা করে' ফেলেছে। অশ্রু ছুটে এসে এমন বেগে তার গলা জড়িয়ে ধরলে যে কতগুলি ফেনা বুলুর গিলে ফেল্‌তে হ'লো। অশ্রু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো : সে এসেছে।

বুলু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বললে—ছাড়, রাক্ষুসি। কে এলো?

আলিঙ্গন একটু শিথিল করে' অশ্রু কানে-কানে বললে—আমার রাজপুত্র।

—তা হ'লে বন্দীদশা ঘুচ্‌লো নাকি? এই তিন বছর মাস্টারি করে' বি-এ পাশ করে' এখন বুঝি বিয়ে করে' বয়ে' যাবার সখ হয়েছে। হ'বে কবে শুনি?

অশ্রু বুলুর গাল টিপে দিয়ে বললে—যমের বাড়ি গিয়ে।

বুলু বললে—বি-এ পাশ করে' সবাই এম-এ-ই পড়ে শুনেছি। কেউ কেউ দেখছি প্রেমে-ও পড়ে। য্যাদ্দিন তো কৈ শুনতে পাইনি।

—তোকে শোনাবার জন্যে আমার যেন ঘুম হচ্ছিল না। কাল সারা রাত আমার যে ঘুম হয়নি, তা অবিশ্যি অন্য কারণে।

—কি কারণ?

—সভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে?

—সভয়ে।

—তা হ'লে বলি রাত বারোটা পর্যন্ত একজামিনের কাগজ দেখেছি—বারোটার পর থেকেই আমি নির্ভয়, বুলু। তারপর আর ঘুম আসেনি। বই পড়বার জন্য টেবিলে বসতে গিয়ে ভুল করে' জান্‌লায় এসে দাঁড়ালাম। জানলা থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায়।

—রাজপুত্রকে কোথায় সিংহাসন দিলি?

—ডাক-বাংলোয়। হৃদয়ে বলতে পারতাম বটে, কিন্তু সেটা তোর প্রশ্নের ঠিক স্বাভাবিক উত্তর হ'ত না। চা-র জল চাপিয়েছিস্? চা খেয়েই ঘুম দেবো লম্বা। জাগাস্ নি পোড়ারমুখি।

ব'লেই অশ্রু অন্তর্হিত হ'লো।

অশ্রুর জীবনের আজকের এই ছোট দিনটুকু নিয়েই একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস লেখা চলে—জেইম্‌স্ জয়েস যেমন *Ulysses* লিখেছে। একটি দিন—অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত (ঠিক পুরো একটি দিনো নয়)—তাই নিয়ে সাত শো বত্রিশ পৃষ্ঠার বিচিত্র উপন্যাস! অশ্রু এত ধীরে ধীরে গত রাত্রি যাপন করেছে যে তার প্রতিটি নিশ্বাস-পতন নিয়ে একেকটা পরিচ্ছেদ হ'তে পারে! সেই রাত্রি নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে অশ্রুর একটা জীবনে ধরবেই না।

অশ্রু *Ulysses*-এর সেই ব্লুম্-এর কথা হঠাৎ ভাবতে বসলো। ব্লুম্ জাতিতে জু, ডাবলিনের একটি সাদাসিধে কেরানি—ব্যাঙ্কে কাজ করে বোধ হয়। ব্লুম্ ঘুম থেকে ওঠে; শোবার ঘরে বিছানার ওপর তার স্ত্রী মলি-কে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় ফেলে রেখে রান্নাঘরে ঢোকে, সেখান থেকে বড়ো-হল্‌টায়; সেখানে বসে' একটা পুরোনো খবরের কাগজ পড়ে; এবং প্রাতঃকৃত্য শেষ করতে-করতে নিজের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চালায়। অদ্ভুত লোক! তারপর মাংসের দোকানে গিয়ে 'কিড্‌নি' কেনে, একটা ঝি দেখে কামমোহিত হয়। তারপর বাড়ি এসে 'কিড্‌নি'টা নিজেই ভাজে; ওপরে স্ত্রীর কাছে খাবার নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টায় অনেকটা সময় হেলাফেলা করে,—নিচে মাংস-পোড়ার গন্ধ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ফের রান্নাঘরে। এই সব। তারপর ফের রাস্তায়; স্নানের দোকানে; শবানুগমন-মিছিলে; একটা খবরের কাগজের আপিসে; একটা রেস্টুরেণ্টে; লাইব্রেরিতে; মদের হোটেলে; সমুদ্রের পারে; হাসপাতালে; বেশ্যালয়ে—(সেখানে ব্লুম্ থাকে অনেকক্ষণ—ইউলিসিসও Circe-র গুহায় অনেক দিন ছিল, না?) সেখানে মদ খেয়ে শ্রান্ত হ'য়ে সে ষ্টিফেন্ ডেড্‌লাস্-এর সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে।

গল্পের শেষ ভাগের কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জায় অশ্রুর গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। ব্যাপারটা কিছু নয়,—অতি সামান্যই; ব্লুম্-এর স্ত্রী মলি স্বামীর কাছে শুতে যাচ্ছে! ওটা জয়েস্ না লিখলেও পারতো। কিন্তু কেনই বা লিখবে না?

শুনেছে বইটা নাকি অশ্লীল। হবে ও বা। অশ্রু অবিশ্যি এক নিশ্বাসে পড়তে পারেনি, কিন্তু ছাড়তেও পারেনি। কোনো বিষয় বিষয়-হিসেবেই যে কী করে' অশ্লীল হ'তে পারে অশ্রু তা কিছুতেই বোঝে না। এ নিয়ে ও কত তর্ক করেছে—প্রাথমিক প্রথাগুলোকে বন্ধুদের মন থেকে ছিঁড়তে পারেনি। যা কিছু দোষ হ'তে পারে স্টাইলের বা লিখনভঙ্গীর। *Ulysses*কে সে কারণে নির্বাসিত করলে অশ্রুর দুঃখ হ'ত না। অন্য যে-কারণে লণ্ডনে ও নিউইয়র্কে *Ulysses*-এর লাঞ্ছনা হয়েছে সে-কারণটাকে উপহাস করতে পারলে মানুষের উপকারই হ'তো। মানুষের হৃদয় আছে আত্মা আছে বলতে পার, কিন্তু শরীর আছে বলতে পারে না। খেতে পারবে, ঘুমুতে পারবে, কিন্তু আসঙ্গ-লিপ্সার বেলায় শুধু মুখ বুজলেই চলবে না, দস্তুরমতো জিভ্ কাট্তে হ'বে। বার্ণার্ড শ-র মতো জিভ বার করে' ভ্যাঙচাবার যো নেই। অন্তত এ দেশে।

মনে-মনে এ-সব নিয়ে অশ্রু অনেক কিছু-ই তর্ক করতে চাইলো, কিন্তু তর্ক করতে চিন্তার পারম্পর্য রাখার জন্যে যে সবল ও অনন্য অভিনিবেশ দরকার এ-রকম উচাটন মন নিয়ে তার সাধনা চলে না। অতএব পাশ-বালিশটা বুক থেকে ছুড়ে ফেলে অশ্রু বিছানার ওপর উঠে বসলো। এত রাজ্যির চুল নিয়ে ওর আপদ হয়েছে—একটু নাড়া-চাড়া করতে গেলেই ঘাড়ের ওপর দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে এসে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর লুটিয়ে পড়ে; বারে-বারে খোঁপা

বাঁধার হাঙ্গাম অনেক,—তবু ও পিন্ আট্‌কাবে না। চুল বাঁধতে বাঁধতে নজরে পড়লো,—সেল্‌ফ-এর ওপরকার টাইম-পিস্-এ মোটে দু'টো বেজেছে। ইচ্ছে হ'ল ঘড়িটা মেঝের ওপর আছড়ে মারে। জান্‌লা দিয়ে বাইরে তাকাতে মনে হয়েছিলো রোদ থিতিয়ে এসেছে বুঝি; এখন ভালো করে' ঠাওর করলে আকাশটা তামাটে, থমথমে,—ধীরে ধীরে মেঘ জমছে। পরনের শাড়িটাকে পরিপাটি করবার চেষ্টা করতে করতে অশ্রু বিছানা থেকে নেমে পড়লো। খালি পা,—জুঁইফুলের মতো শাদা, ধবধবে! মুখখানি যেন রূপোর পিল্‌সুজের ওপর সোনার প্রদীপ!

শাড়িটাকে গুছোতে-গুছোতে হঠাৎ অশ্রুর মনে হ'লো এই বেশেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! বিকেল বলে' এসেছে ব'লেই যে কাঁটায় কাঁটায় কথা রাখতে হ'বে এতটা বিলিতি কায়দা তাকে না মানালে মহাভারত এক' ঘণ্টায় অশুদ্ধ হ'বে না আশা করি। কুড়েমি খুব ভালো জিনিস,—অশ্রু কুড়েমি খুব পছন্দ করে। মানুষ আরেকটু কুড়ে হ'তে শিখলে আরো খানিকটা সভ্য হ'তে পারতো। নিশ্চয়ই। তবু সময় বলে' ছুট্‌তে গিয়ে অকারণে এতো সব কাণ্ড করে' বসছে যে কোনো দার্শনিকই তার তারিফ করতে পারছেন না। একটু কুড়ে হ'লে লেখকরা বই লিখে তক্ষুনিই ছাপ্‌তে ছুট্‌তো না,—পরে দেখ্‌তে পেতো কলম কি-রকম কাঁচিয়েছে। কাঁচির দরকার। বৈজ্ঞানিকরা আরেকটু কুড়ে হ'লে, অকারণ যন্ত্র-পাতির উৎপীড়নে পৃথিবীর যন্ত্রণা এতো বাড়াতো না। কবিরা যদি আরেকটু কুড়ে হ'তো তবে দেখতে পেতো বিনিয়ে-বিনিয়ে কথায় কাঁদুনি গাওয়া কোনো ভদ্রলোকের পোষায় না,—আরাম-কেদারায় শুয়ে একটু 'রাম' খেলে বরং কাজ দেবে। নেপোলিয়ান খুব বড় বীর বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলে'

কোনো বই না থাকলে অশ্রু অঙ্ক কষে' প্রমাণ করে' দিতে পারতো Fabius Cunctator তাঁর চেয়ে মহৎ, তাঁর চেয়ে বরণীয়। কোনো কাজ তক্ষুনি-তক্ষুনি করে' ফেলাটা নিতান্ত সহজ, একেবারেই সাধারণ; কিন্তু তাকে পিছিয়ে রেখে-রেখে তার জটিলতা বাড়িয়ে তবে তাকে সম্পন্ন করার মধ্যে বেশি বীরত্ব। ঠিক সময়ে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপার মধ্যে গৌরব কিছুই নেই, কিন্তু ট্রেন ছাড়বার সময়টুকু বাড়িতে বসে' হাই তুলে কাটিয়ে দিয়ে পরে হেঁটে যাবার মধ্যে মূর্খতাই আছে এ-কথা বেনে বা বণিকেরা বলতে পারে—অশ্রুর মত উল্টো। মানুষের সময় কম—ঘড়ির কাঁটা নাকি অহর্নিশি তাই বলছে,—ঘড়ির এই গায়ে-পড়া অভিভাবকত্ব বরদাস্ত করবো না; অশ্রু ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে পাঁচের কোঠায় প্রমোশন দিলে। এই ওর বিকেল।

অর্থাৎ কুড়েমি করা দূরে থাক্, সময়নিষ্ঠা-পালনের ধৈর্যটুকুও ওর পোষাবে না এখন। সময় দিয়েছে বলে' তার আগে যাওয়া যাবে না; এমনিই বা যদি কোনো নিয়ম থাকতো তবে আয়ুর অধিকারী হ'য়ে এসে এই বিস্তীর্ণ আকাশের তলে শিশুমৃত্যু ঘট্‌তো না। এমন দৃষ্টান্ত বা কেন? একটু মাথা ঠাণ্ডা করে' ভাবলে অশ্রু এর চেয়েও অনেক খোলো নজির দেখাতে পারবে। কিন্তু না, সত্যি সময় নেই—অশ্রুর বলে' আসা উচিত ছিল দুপুরেই যাবে। বিকেলের চেয়ে দুপুরটাই বেশি রোমান্টিক—অমাবস্যার নিশীথ রাত্রির চেয়েও। প্রেম-বর্ণনায় একমাত্র কালিদাস ছাড়া আর কোনো কবি ঘাম বা মাছির কথা উল্লেখ করেনি বলে'ই কেউ তাঁর সমকক্ষ হ'তে পারলো না। রইলো পিছিয়ে। অশ্রু এবার কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করবে। লুডোভিচিকে পথে না বসিয়ে ও ছাড়্‌ছে না। কিন্তু এক্ষুনিই কাগজ পেন্সিল নিয়ে

না বসলে রাতারাতি নোবেল প্রাইজ হস্তান্তরিত হচ্ছে না—এই যা সান্ত্বনা। ততক্ষণে শাড়িটা বদলে নিলে কাজ দেবে। অশ্রু ট্রাঙ্ক খুললো।

মেঘ করে' এসেছে বলে'ই ওকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি পরতে হ'বে এমন কবিত্ব করবার দিন গেছে। ও সাদাসিধে শাদা শাড়িই পরবে। মেঘ কেটে গিয়ে রাত্রে যে স্তিমিত জ্যোৎস্নাটুকু ফুটবে বা যে ভীরু রজনীগন্ধাটুকু ঠোঁট মেলবে তা'রই আভাস। ওই ভেবেই যদি শাড়িটা গায়ে জড়ায় কবিত্বটা যে তাতে বেশি সমৃদ্ধ হ'বে তা নয়, বরং উল্টে আরো জলো ও ফিকে হ'য়ে যাবে। যাক্। অশ্রু আপন মনেই একটু হাসলো। মোট কথা, সম্প্রতি শাড়ির কিছু অভাব হ'য়েছে। যা একখানা খদ্দর আছে সেটা গায়ে চড়ালে ঢের বেশি ফ্যাশানেবল হয় বলে' তাতেও ওর আপত্তি। এই বেশ। এতেই ওকে উড়িয়ে নেবে। বাকল-পরার দিন ফিরে এলে অশ্রু আবার এসে ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করবে'খন...আজকের দিনে—মোহিনী-মিল্-এর এই শাড়ি ওকে আবৃত করুক! মোহিনীর সঙ্গে এতেই ওর মিল হ'বে।

রূপচর্চ্চায় অশ্রু একজন পুরো আর্টিস্ট। এতদিন উদ্দেশ্যহীন হ'য়েই অঙ্গসজ্জা করেছে—নিজেকে তৃপ্তি দেবার জন্যেই। অবিশ্যি অলঙ্কারের আড়ম্বরে নয়, একমাত্র শাড়ি-পরার সূক্ষ্ম সুচারুতায়। কিন্তু আজকের শাড়ির আঁচলটা কিছুতেই বুকের ওপর দিয়ে ঠিক মতো লতিয়ে উঠছে না। কারণ আজকে ও একটি বিশেষ পুরুষকে মুগ্ধ করতে চায়,—প্রেমিকের অন্তরে স্বাস্থ্য ও সুষমা-সঞ্চার করার পক্ষে নারীসৌন্দর্যের উপকারিতায় ওর অগাধ বিশ্বাস। এ কথা বেশি মনে করে'ই ওর শাড়ি পরায় দেরি হচ্ছে। তাই বলে' বুলুর সাহায্য নেওয়া দরকার নেই। বুলু এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত স্থূল, হয় ত' পেছনের দিকে কতগুলি কুচি দিয়ে বসবে! মা গো! এর চেয়ে মরে' যাওয়া ভালো।

শাড়ি পরা ত' হ'ল—ও মা, বৃষ্টি এসে গেলো যে! চড় মেরে ঠাট্টা। অশ্রু আরেকটু হ'লে কেঁদে ফেলেছিলো আর কি! বৃষ্টিতে ভিজে অভিসারে যাওয়ার নিয়ম অবিশ্যি আছে—কিন্তু আশ্চর্য, সেই যুগে কোনো অনুরাগিণীরই প্লুরুসি হয়নি! তখনকার দিনের বেরসিক কবিদের শাপ দিয়ে রসাতলে পাঠিয়ে অশ্রু জানলায় এসে দাঁড়ালো। এত জোরে বৃষ্টি না এলে যেন পৃথিবী আর বাসুকির শিরোধার্য থাকতো না! এই বর্ষায় কত কবির কলমের মর্চেই যেন মুছে যাচ্ছে। বিধাতা যে মঙ্গলময় নয় এর একটা সত্য প্রমাণ পেয়ে অশ্রু খুসী হ'লো বলে' কাঁদতে চাইলো। সত্যি, এ সময়টা কি করেই বা কাট্‌বে? ঘুমিয়ে? কা'র সঙ্গে ঘুমিয়ে? বই পড়ে'? তেমন কোনো বই পৃথিবীতে লেখা হয়নি। একটু সেলাই করলে কেমন হয়? নিজের কপালটা? একটা চিঠি? কা'কে? যমকে?

বিরসমুখে জান্‌লা থেকে ফিরে এসে অশ্রু ঘড়ির কাঁটাটাকে প্রকৃতিস্থ করলে। যাই বল, এখন গেলে হয় ত' দেখত প্রভাত ডেক্-চেয়ারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দুপুর বেলার পুরুষের ঘুম ভারি বিশ্রী দেখতে, ভারি বিস্বাদ! তা ছাড়া বৃষ্টি এসে পড়ায় দুপুরবেলার নিজস্বতাই হারিয়ে গেল—এই নির্জনতার চেয়ে সেই নিস্তব্ধতা ঢের বেশি অর্থ-জ্ঞাপক, ঢের বেশি সুস্পষ্ট ছিলো। বৃষ্টিতে সেই প্রেমালাপ জমে যা ভীরু, অর্দ্ধস্ফুট, অনতিব্যক্ত—নিজের সামর্থ্যে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে' চতুর্দিকে মেঘের রহস্যাবগুণ্ঠন টেনে কোনোরকমে মুখ বাঁচায়,—ঠুন্‌কো, পল্‌কা, পান্‌সে! রৌদ্রদীপ্ত দুপুরের প্রেম স্পষ্ট, নির্ভীক, প্রখর—প্রতিটি বাক্য তরবারির তড়িৎ-বিকাশের মতো দৃপ্ত, তেজস্বী, ধারালো। সুচতুর ব্যঙ্গ, প্রচণ্ড কলহাস্য! উলঙ্গতা আছে বলে'ই তার উজ্জ্বলতা। বাইরের আকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে

গিয়ে কণ্ঠস্বরে কৃত্রিমতা আসে না, আচরণে জড়তা। দৃষ্টি সেখানে বাষ্পাকুল নয়; কঠিন, ক্ষুধার্ত। দেহে মল্লার বাজে না, বাজে দীপক! দুপুরের প্রেমে সতীবিরহব্যথী শিবের আশীর্বাদ!

এমন দুপুরটা আকাশের অশ্রুতে ভিজে' ফ্যাকাসে, ভ্যাপসা হ'য়ে গেলো। অশ্রুর জীবনে এ একটা পরম ক্ষতি। কথার মূল্য রাখতে গিয়ে বিকেলে যখন ও যাবে তখন মাটির সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ও ঠাণ্ডা হ'য়ে সব একেবারে মাটি ক'রে দেবে। তখন আকাশ আসবে জুড়িয়ে, হৃদয়েরও তখন গোধূলিবেলা। গোধূলির চেয়ে দুপুরের ধূলিই ওর বেশি পছন্দ। হাতে কিছু না পেয়ে অশ্রু গেল বুলুর সঙ্গে আলাপ করে' bored হ'তে। ওকে দিয়ে এক পেয়ালা চা করিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

বৃষ্টিকে এক সময়ে থামতে হলো। থামতে তাকে হতোই। সমস্ত কিছুরই একটা স্বাভাবিক অবসান আছে—এ একটা বড়োরকমের আশ্বস্তি। নইলে স্বয়ং বিধাতাই উঠতেন হাঁপিয়ে। এ-পৃথিবীটাও একদিন চল্‌তে চল্‌তে থেমে পড়বে—যাক্ গে চুলোয়। আজকের বিকেলেই ত' তার ধূমকেতুর সঙ্গে তার বাহুনিবদ্ধ হ'বার লগ্ন নয়। অশ্রু বুলুর চুল টেনে দিয়ে উঠে পড়লো।

খাটের নিচে স্যাণ্ডেলটা খুঁজছে, বুলু শুধোলো: সেজে-গুজে কোথায় যাচ্ছিস্ পোড়ারমুখি?

ঘাড় নিচু করে' রেখেই অশ্রু বললে—এই যদি সাজার উদাহরণ হয় তবে তোর আদিম প্রপিতামহী ইভ-এর লজ্জায় জিভ্ কাটবার আর দরকার হ'বে না। বাঁচ্‌লাম। কিন্তু জুতো কোথায় লুকিয়েছিস্, বল্।

কপালে চোখ তুলে বুলু বললে—আমি কি জানি?

—অবিশ্যি ইভ বা উর্বশী কারুরই জুতো-পরার অভ্যেস ছিল না,—আমি ত' তাদেরই সমবয়সী। সহানুভূতি থাকা ভালো। চাইনে

জুতো! তোদের পাঁউরুটির কাজ দেবে। মুক্তহস্তে যা দান করব মুক্তপদে তা ফিরিয়ে নেব দেখিস্। বলে' অশ্রু চুলের খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর নেড়ে চেড়ে বসিয়ে, ঘোমটাটা তার ওপর আল্‌তো করে' চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সামনের মাঠে—ভিজা নরম সবুজ মাঠে। অমনি জান্‌লা দিয়ে স্যাণ্ডেল জোড়া ছুটে এলো। অশ্রু পেছন ফিরেও তাকালো না।

খালি-পায়ে মাঠ মাড়িয়ে যেতে-যেতে অশ্রুর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ঘাস-গুলিকে যেন পায়ের তলায় শিশু-সন্তানের চুমার মতন নরম লোভনীয় লাগছে। রাস্তায় একটা গাড়ি নেই যে ডাকবে। এ মাঠটুকু পেরিয়ে রাস্তায় পা পাততে হ'বে ভেবে অশ্রুর মনে আর সুখ ছিলো না। খানিকক্ষণ এখেনেই টহল দেওয়া যাক্। সুন্দর আকাশ—ড্রয়িংরুমে ঐ হাল্‌কা রঙের একটা কার্পেট হ'লে ভারি মানায়; ও রঙের কালো পানীয় পেলে অশ্রু তা এক চুমুকে খেয়ে ফেলতে পারে! হাওয়াতে একটু শীত-শীত করছে বুঝি, নয়ান্‌সুকের পাতলা ব্লাউজের ওপর অন্তত একটা খদ্দরের চাদর জড়ানো উচিত ছিল। আলিঙ্গন বহুকালস্থায়ী হ'তে পারে না,—এক ফাঁকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। সর্দি হ'লে প্রেম জমানো ভারি কষ্টকর ব্যাপার। বারে বারে হাঁচি এলে কোনো কথারই গাম্ভীর্য থাকে না। হ্যাম্‌লেট যখন ওফিলিয়ার ঘরে এসেছিলো, কিংবা ওথেলো যখন নিদ্রিতা ডেস্‌ডে-মোনার শয্যা-পার্শ্বে, তখন দু'টি মেয়েই যদি হেঁচে উঠতো তা হ'লে দু' দুটো খুন বেঁচে যেতো। বেঁচে যেতো বটে, কিন্তু শেইক্সপিয়ার বাঁচতো না। অতএব একটা গাড়ি নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হ'বে।

বাস্তা। গেলো মিনিট পাঁচেক কেটে। আকাশের রং বদলাতে সুরু করেছে—এ রঙ-এর পা-পোষেও অশ্রুর মন উঠ্‌বে না। এবারে

আবার বৃষ্টি নেমে এলেই অশ্রুকে বাধ্য হ'য়ে প্রতীক্ষমানা প্রিয়ার চোখের জলের সঙ্গে তার উপমা দিতে হ'বে। না, বৃষ্টি আসবার আগেই বিধাতা বুদ্ধি করে' রাস্তার ওপর একখানা ভাঙা গাড়ি এনে দিলেন। বুদ্ধি করে,'—দয়া করে' নয়। কারণ, অশ্রুকে ভিজতে হ'লে বিধাতারই হতো মুস্কিল; কেন না অশ্রু ডাক-বাংলোয় না গিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যেতো—একটা নূতন প্রেমাভিনয় দেখবার আনন্দ থেকে বিধাতা অকারণে বঞ্চিত হ'তেন তা হ'লে। বাঙলা-দেশের বিধাতার ভাগ্য ভালো। গাড়িটা থামিয়ে অশ্রু পা-দানির কাদা থেকে শাড়িটা বাঁচিয়ে বসে' পড়লো। গাড়ি চললো গড়িয়ে—গদাইলস্করি চালে। গাড়োয়ানকে তাড়া দেবে ভাবলে, কিন্তু অশ্বিনীকুমার দু'টিকে সায়েস্তা করা স্বয়ং সায়েস্তার্থাঁরো কর্ম নয়। গাধা পিটিয়ে যে ঘোড়া করা যায় এ-বিষয়ে অশ্রুর আর সংশয় রইলো না।

ডাক-বাংলোটা তা হ'লে আছে—উড়ে' যায়নি। বিধাতার অমানুষিকতার তালিকায় এ-ব্যাপারটা আজকের বিকেলের জন্য অন্তত অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে' অশ্রু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে বাধা পেলো। কেননা নিশ্বাস এত দ্রুত হওয়া উচিত—বারান্দায় প্রভাত, সশরীরে—চীনের দেয়ালের মতো। দৃষ্টি গিয়ে ঠেকলো, রইলো আটকে'। অশ্রুকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে প্রভাতই এলো ছুটে—দূরে বল্ দেখতে পেয়ে গোল্-কিপার যেমন ছুটে আসে। বললে,—বিকেল মরে' বাসি হ'য়ে গেলো,—এতক্ষণে বুঝি হুঁস হ'ল তোমার?

অশ্রু বললে,—গাড়োয়ানটাকে পয়সা দিয়ে বিদেয় করব ত' আগে—পরে বিকেলের বিকল হওয়ার কাহিনী বলা যাবে।

পকেটে হাত রেখে প্রভাত বললে,—গাড়িটাকে না ছাড়লেই ত' ভালো হ'ত, বেরুতাম।

অশ্রু অল্প একটু হেসে বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি! তোমার পায়ে কি বাত হয়েছে যে গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যায়াম করতে চাও। তা ছাড়া এমন সন্ধ্যা ক'জনের ভাগ্যে আসে! এমন সন্ধ্যার জন্যে উর্মিলা কত সন্ধ্যায়ই বৃথা বাতি জ্বেলেছে! গাড়ি চ'ড়ে পরে না-হয় শ্বশুরবাড়ি যেয়ো, এখন এস একটু হাঁটি।

গাড়োয়ান বিদায় নিতে প্রভাত বললে,—তোমার যে খালি পা!

খুকির মতো হাত তুলে অশ্রু বললে,—তবে কাঁধে তুলে নাও। সামনে একটা খাঁড়ি বা নর্দমা পড়লে আমাকে নিয়ে ডগলাস্ ফ্যায়ার ব্যাঙ্কসের মতো না হয় কসরৎ দেখিয়ো। হাঁটতে আমি খুব পারবো; হাঁটতে আমার ভালো লাগে। এসো শিগ্‌গির।

রাস্তা বেশ নির্জন,—বৃষ্টি পড়ে' আকাশ তাজমহলের মেঝের মতন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—তাজমহল অশ্রু কোনোদিন দেখেনি, আকাশকেও ছোঁয়া গেলো না—কিন্তু উপমা তার জন্যে আর অসার্থক হ'বে না। চোখ দিয়ে ছোঁয়া, চোখ দিয়ে ছবি আঁকা। এই চোখ দিয়ে মৃত্যুর পরে নতুন তারার নতুন গ্রামের ছবি আঁকতেও ওর ভাব্‌তে হয় না। নিশ্চয়। সেই গ্রামের রঙ্‌ এখানকার সাতটা রঙের থেকে আলাদা আরেকটা—সেই জীবনের অনুভূতি আরো বহুবিচিত্র,—মাটির দেহ নিয়ে তার সম্পূর্ণ কল্পনা করা যায় না। সেখানে আলো নেই, খালি অন্ধকার। ধূসর অস্পষ্টতা। অপরিচয়ের গভীর সম্পর্ক। প্রয়োজনের বোঝা Lethe-র পারে ফেলে এসেছে। সেখানে—সেই চিরসূর্যাস্তের দেশে সুচিরস্তব্ধতা। অথচ কী আনন্দঘন উজ্জ্বল জীবন। সেই বচনাতীত অনুভূতিতে অশ্রু উত্তীর্ণ হ'বে কবে?

বৃষ্টির পর আকাশকে নীল চোখ ভাবলে দিগন্তরেখাকে মনে হ'বে ঠিক ভুরুর মতো বাঁকা। এক ঝাঁক পাখি বেরিয়ে এসেছে। পাখার

অস্ফুট ঝাপট্ শোনা গেল। আকাশ যেন শব্দ করে' তা'র আনন্দ জানালো। হাঁটতে হাঁটতে অশ্রু বল্‌ল—দুপুরে ঘুমিয়েছিলে ?

প্রভাত রেইন্-কোটটা ডান কাঁধের ওপর গুছিয়ে রাখ্‌তে রাখতে বল্‌ল—তুমি আস-আস করে' ঘুমুনো আর হ'য়ে ওঠেনি। বাদ্‌লা-হাওয়া লেগে মন ভিজে যদি সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে ওঠে তাহ'লে তোমার হাঁচি পাবে না আশা করি। কদ্দিন পর দেখা হ'ল বল ত'—অথচ মনে হয় যেন 'সেদিন সকাল'।

অশ্রু নীরব হ'য়ে রইলো। প্রভাত বলে' চল্‌লো : যেদিন পিওন তোমার চিঠি দিয়ে গেলো সেদিন ক্যালেণ্ডারে কোন্ তারিখ ছিল জানি না, কিন্তু মনে হয়েছিলো সেদিনই আমার জন্মদিন। কেন আবার হঠাৎ ডাক্‌লে বল ত' ?

অশ্রু বললে—এই জন্যেই সন্ধেবেলাটা আমি পছন্দ করি না,—নিজের মনের চেহারার ভালো ক'রে ঠাহর হয় না। সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। দুপুরেই সেইজন্যে আস্‌তে চেয়েছিলাম। বেশ একটা সহজ স্পষ্টতা থাকে। কেন আবার ডাক্‌বো ? খুসি।

প্রভাত। তিন বছর পরে হঠাৎ আবার মনে কর্‌লে—এর কি কোনো কারণ নেই ?

অশ্রু। তিন বছর পরে হঠাৎ আমার দাঁতে ব্যথা হয়েছে—এরো কি কোনো বিশেষ কারণ আছে ?

প্রভাত। চল, নদীর ধারেই যাই।

অশ্রু। বেশি নির্জনতা আমার পছন্দ হয় না, আমি হাঁপিয়ে উঠি। সেই জন্যেই কল্‌কাতায় যাবো—কালই। তোমার সঙ্গে।

প্রভাত। কল্‌কাতায় কেন ?

অশ্রু। সব কেন র উত্তর দিতে গেলে কোটি কোটি কেনো-পনিষদেও কুলুবে না। তোমার নাম প্রভাত কেন ?

প্রভাত। কল্‌কাতায় ত' একলাই যেতে পারতে, আমাকে এতটা দৌড়িয়ে এনে কী লাভ হ'ল ?

অশ্রু। সব কাজই একলা করতে হ'বে বিধাতা মেয়েমানুষকে এমন দিব্যি দিয়ে দেন্‌নি। কল্‌কাতায় যাবো কারণ জলপাইগুড়িতে আর জল নেই ; তোমার সঙ্গে যাবো কারণ তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে ট্র্যাভেল্‌ করতে আমার ভালো লাগবে। খুব।

প্রভাত। আমার ত' না-ও লাগতে পারে।

অশ্রু। বল কি, এ আমি বিশ্বাসই করবো না। আমি এখনো বুড়ি হইনি।

প্রভাত। হওনি নাকি ?

অশ্রু। যাক্‌, দরকারি কথাগুলি সেরে নি। আপাতত কল্‌কাতায় গিয়ে আমাকে এক হোটেলে উঠতে হবে—বাড়ির দরজা তেমনি বন্ধ। দরজার গোড়ায় বসে' যে ধন্না দেবো আমি তেমন ধার্মিকও নই, দরজা যে ভেদ করব তেমন ধনুর্দ্ধরও নই। অতএব—

প্রভাত। হোটেলে ?

অশ্রু। হ্যাঁ, আকাশ থেকে পড়্‌লে যে ! গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠতাম, কিন্তু বেজায় খরচ। দু' একদিন হ'লে খুব চাল্‌ করে' থাকা যেতো—কোনো সাহেবের সঙ্গে বন্ধুতা করবার সুযোগো মিলে যেতো হয়তো কিন্তু প্রায় এক হপ্তার ওপর কল্‌কাতায়ই ভিরোতে হ'বে। অতএব—হ্যাঁ, অতএব ক্যাল্‌কাটা-হোটেলেই ঘর নেবো।

প্রভাত। তোমার স্কিম্‌ তো খুব ইন্‌টারেষ্টিং। তারপর ? আমি থাক্‌ বা কোথায় ?

অশ্রু। দেখা করতে আস্‌তে পারো দিনের বেলায়—রাত্রে বাইরের লোককে ম্যানেজার নিশ্চয়ই allow করবেন না। আমারো ঘুমানো চাই তো। বিকেলে আস্‌বে--অনেক জিনিস-পত্র কেনার দরকার—কুকার, হোল্ড্‌অল্‌—

প্রভাত। সেফ্‌টিপিন্‌; হেয়ারক্লিপ্‌—

অশ্রু। কেন য়্যাদ্দিন কলকাতায় থাক্‌বো তা তুমি আন্দাজ করতে পেরেছো ?

প্রভাত। কি করে' পারবো? সাত দিন থেকে কল্‌কাতাকে কেন সপ্তম স্বর্গ করে' তুল্‌বে তা তোমার বিধাতাই জানেন। মিস্‌ মেয়ো বোধ হয় য়্যাদ্দিনও ছিলো না।

অশ্রু। বোকার মতো যা-তা বোলো না। থাক্‌ব মানে থাক্‌তে হ'বে।

প্রভাত। নিশ্চয়। বোকার মতো মানে মূর্খের মতো।

অশ্রু। কেন না কল্‌কাতাতে নেমেই তুমি হাওড়া গিয়ে কোনো গাড়িতেই বার্থ রিজার্ভড্‌ পাবে না। পূজোর আগে কি রকম ভিড় হয়েছে আইডিয়া আছে তোমার ?

প্রভাত। পাঁজির পাতায় কখন্‌ পূজো আসে তারই আইডিয়া নেই—

অশ্রু। অতএব—

প্রভাত। অতএব—

অশ্রু। অতএব বার্থ পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সাত দিন আগে টিকিট পাওয়া যাবে—দেখা যাক্‌ অন্তত শেয়ালদা-দিল্লি প্যাসেঞ্জারে পাশাপাশি দুটো বেঞ্চি পাওয়া যায় কি না। একেবারে পাটনায়—

প্রভাত। বলিহারি! আমি ভাবছিলাম যে-রকম কথার কদম ছুটিয়েছ, বুঝি ফংচু হ'য়ে কাম্স্কাট্কা যাচ্ছ। পাটনা? আমাদের বস্তিবাটি কি দোষ করলো?

অশ্রু। তোমার মাথায় যে গোবর তা এতক্ষণে বুঝ্তে পারলাম। যুক্তিটা শোন—

প্রভাত। পাটনা যাবার পক্ষে আবার যুক্তি আছে নাকি?

অশ্রু। প্রতি একশো মাইল অন্তর একদিন করে' ব্রেক-জার্নি পাওয়া যায়—সে জ্ঞান তোমার আমার আছে? আমাদের টিকিট ত' লাহোরের—এগারো শ নিরানব্বুই মাইল্। ই, আই, আর-এর টাইম্-টেব্ল্ আমার মুখস্ত। প্রথমেই নাম্বো পাটনায়।

প্রভাত। তবু তোমার পাটোয়ারি বুদ্ধিকে তারিফ করতে পারছি না, অশ্রু। পাটনায় নাম্বে হাইকোর্ট দেখতে? এক্কা চড়ে' যাবে দেখ্তে তুমি?

অশ্রু। পাট্নায় নেমে যে নালন্দায় যাওয়া যায়—পুরোনো পাটলীপুত্রে—ইতিহাস ত পোকায় কেটেছে। তা ছাড়া, সেখানে আমার একটি বন্ধু আছে।

প্রভাত। আশা করি পুরুষ।

অশ্রু। নিশ্চয়। সমান sex-এ সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয় না।

প্রভাত। বুঝ্লাম। তারপর? পাটনা থেকে কোথায়? বক্সার?

অশ্রু। সে বুঝি এক শো মাইল পেরিয়ে?

প্রভাত। আমি তো আর টাইম্-টেব্ল মুখস্ত করিনি।

অশ্রু। তারপর সটান্ এলাহাবাদ!

প্রভাত। আঃ, একটা জায়গার নাম করলে বটে।

অশ্রু। তার মানে? পাটনার থেকে এলাহাবাদে এমন কি বেশি জৌলুস! একেবারে গদ্‌গদ হ'য়ে উঠ্‌লে যে—

প্রভাত। সেখানে হাইকোর্ট তো আছেই, যমুনাও আছে।

অশ্রু। কেন, পাটনায় বুঝি গঙ্গা নেই?

প্রভাত। কোথায় গঙ্গা, কোথায় যমুনা! এসে মিল্‌লো এলাহাবাদে। ওখানে গঙ্গাও আছে যমুনাও আছে।

অশ্রু। লোহার শিকলে যমুনা তো সেখানে বন্দী; শুক্‌নো, পচা, পিটোনো।

প্রভাত। তবু তার সঙ্গে গঙ্গার তুলনা হয় না। যমুনা গঙ্গার মতো দেবী নয়, শিবের জটায় তার জন্ম নয়; সে নিতান্ত নিরাভরণা, শীর্ণকায়া বিরহ-ব্যথিতা। ভারি লক্ষ্মী নদীটি। দুঃখিনী। পূর্ববঙ্গে এম্‌নি একটি নদী আছে, তার নাম শীতললক্ষ্যা।

অশ্রু। তুমি যদি যমুনা নিয়ে অমন কবিত্ব কর তা হ'লে এলাহাবাদ াওয়া বন্ধ করে' দেব।

প্রভাত। কিন্তু আর কোথায় যাবে? পশ্চিমে যতই এগোও মুনাকে তুমি ছাড়্‌তে পারবে না। অতীত রাতের একটি বিষণ্ণ স্মৃতির তো তোমার মনে লেগে থাক্‌বে। বেশ, এলাহাবাদ থেকে?

অশ্রু। পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন এস ফেরা যাক।

অন্ধকার হ'য়ে এসেছে,—মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ মুখ বাড়িয়েছে দেখে দু'জনের মুখ খুসি হ'য়ে উঠ্‌লো। অশ্রু বললে - খানিকটা ডান-হাতি গেলেই আমাদের হষ্টেল, আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেতে পারবে তো? দিব্যি ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে।

প্রভাত রেইন্‌-কোট্‌টা অন্য কাঁধের ওপর তুলে নিতে-নিতে বললে—এতদিনে জ্যোৎস্নার উপকারিতার একটা উদাহরণ পাওয়া গেলো। নইলে এতদিন জ্যোৎস্নায় বরাবর কবিদের পেট ফেঁপেছে।

অশ্রু। বাজে কথা বলো না। যেতে পারবে তো একা?

প্রভাত। না-হয় একটা গাড়ি ডেকে নেবো।

অশ্রু। হ্যাঁ, তাই নিয়ো। গাড়ি তোমার জন্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না!

প্রভাত। কেন, তোমার হষ্টেলে একটু জায়গা হয় না?

অশ্রু। হয়! এই যে একসঙ্গে একটু হাঁটলাম তাতেই বাঙলা দেশে এতক্ষণে হয় তো ভূমিকম্প হচ্ছে। হয় তো দেখ্‌তে পাবো কাল্‌কেই খান তিনেক ট্রান্স্‌ফার সার্টিফিকেটের দরখাস্ত পড়েছে।

প্রভাত। কারণ?

অশ্রু। কারণ আমার গায়ে সীতা-সাবিত্রীর পালিশ্‌ নেই। সীতা তবু রামায়ণে (বাল্মীকির রামায়ণে) পাতালে প্রবেশ করবার আগে রামকে যাচ্ছেতাই করে' গালাগালি দিয়েছিলো, আমার সে-গালাগালি দেবারো অধিকার নেই।

প্রভাত। সীতা আবার রামকে বক্‌লো কখন্‌?

অশ্রু। শুধু বকা, জন্তুর মত মা বাপ তুলে'। সংস্কৃত জানো ত' মূল বাল্মীকি পড়ে' দেখো।

প্রভাত। আমার পড়ে' কাজ নেই। বাল্মীকির চেয়ে বাঙালির রামায়ণ ঢের ভালো।

অশ্রু। মিথ্যে বানানো বলে'—কিন্তু এর বেশি আর পা বাড়িয়ে কাজ নেই। এর পরেই স্কুল-কম্পাউণ্ড, যদি ওখানে এসে পড তা হ'লে ইস্কুলই হয় তো উঠে যাবে।

প্রভাত। বল কি? সত্যি, আমি এত সহজে স্কুল উঠে যাওয়ার খুব পক্ষপাতী।

অশ্রু। আর পক্ষ পেতে লাভ নেই। আমি চল্লুম। দুটো মুখে গুঁজেই দেব লম্বা ঘুম। ভারি ঠাণ্ডা মিষ্টি রাত।

প্রভাত। বটে। আর আমি এমনি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?

অশ্রু। দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কেন, ডাক-বাংলায় ফিরে যাবে। একা যাবার অভ্যাস কর। (গম্ভীর) একাই যেতে হ'বে। আব মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই। তবে ঐ কথা রইল, কালই কল্‌কাতা যাচ্ছি। ঠিক থেকো। আমি জিনিস-পত্র নিয়ে হুড্‌মুড্‌ করে' গিয়ে পড়বো কিন্তু।

প্রভাত। তা তো পড়বে, কিন্তু কথনো কথা হয় নি। তোমাব একার কথাতে চল্‌লে এই ইস্কুলো চল্‌তো।

অশ্রু। (ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে) ইস্কুল না চল্‌লেও দার্জিলিঙ্‌ মেইল্‌ চল্‌বে। এখন যাও, মেয়ে-ইস্কুলেব দিকে হাঁ কবে' চেয়ে থাকা ভদ্রতা নয়।

প্রভাত। আর মেয়ে-ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের কাছে ছেড়ে দিয়ে যাওয়াটাই যেন ভদ্রতা! এ-সবো কি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে শেখা নাকি?

অশ্রু। তোমার সঙ্গে বকর-বকর করতে পারি না। কাল—কাল আবার দেখা হবে। বলে' অশ্রু ভেতরে ঢুকলো।

কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে পেছন ফিরে তাকাবার সনাতন একটা রীতি আছে—অশ্রু তার লোভ সম্বরণ করতে পারবে কেন? ব্যাপারটা ওর ভালো লাগলো না। চেয়ে দেখ্‌লে প্রভাত পকেট থেকে রুমাল বার করে' তাই নেড়ে-নেড়ে ওকে ডাক্‌ছে। প্রভাত তো দেখ্‌ছি ভারি সেকেলে, অশ্রু রীতিমত খাপ্পা হ'য়ে ফিরে এলো।

অশ্রু। এখনো দাঁড়িয়ে আছ যে?

প্রভাত। তোমার যাবার পরমুহূর্তেই যদি চলে' যাই তবে ছবিটায় সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে ব্যালেন্স নেই সেখানে সৌন্দর্যও নেই। দৃশ্যটায় কি রকম যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। হ'তে গল্‌সোয়ার্দি কিংবা ওনিল্‌, বুঝতে সমস্ত দৃশ্যটা কেমন নড্‌বড়ে, বেখাপ্পা, বেজুত ঠেক্‌ছে।

অশ্রু। আমি তো ভাবছিলাম, বাড়ি ফিরে তবে কবিত্ব কর্‌বো। তুমি যে একেবারে লোক হাসালে। একেবারে রুমাল তুলে ডাকাডাকি। একবার একটা এঞ্জিন বাঁচাবার জন্যে একটি মেয়ে রেল্‌লাইনে দাঁড়িয়ে রুমাল তুলেছিলো জানি। তোমার মতো বিপদ বাড়াতে নয়। যদি কেউ দেখে ফেল্‌তো?

প্রভাত। তবু তোমার 'দেখে-ফেলার' ভয় গেলো না। যতই তড়পাও, লোকনিন্দার হুক্কাহুয়া শুনে তুমিও ঘোমটা গুটোও। দেখ্‌তো তো বয়ে' যেতো। রুমালে কি আছে, তা তো আর দেখতে পেতো না।

অশ্রু। রুমালে কি আছে? দেখি? সেই জন্যে ডাক্‌লে?

প্রভাত। ডাক্‌বার একটা কারণ দেখাতে হ'লে রুমালের রহস্য আমি দেখাবো না।

অশ্রু। না, না; দেখি।

প্রভাত। (রুমালটি হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে') চোখ বোজ।

অশ্রু। বাঃ, চোখ বুজে' কখন আবার কে দেখ্‌তে পেয়েছে!

প্রভাত। সত্যিকারের সব দেখা চোখ বুজেই ঘটেছে, অশ্রু। চোখ বোজ।

অশ্রু। (চোখ বুজে) আমি বোকার মতো চোখ বুজলাম। দেখাও দেখি—

প্রভাত। আর আমি বুদ্ধিমানের মতো—

অশ্রু হেসে বললে—তুমি তো ভীষণ villain। যদি কেউ দেখে ফেল্‌তো!

প্রভাত। তুমি তো আর দেখ্‌তে পেতে না।

অশ্রু। এবারে তোমার দৃশ্য তার পূর্ণ নাটকীয়তা লাভ করেচে?

প্রভাত। করেছে, কিন্তু তোমাকে কি রকম ঠকালাম বল তো! অন্ধকারে চোখ বুজে' রুমাল দেখা! চল হষ্টেলে, এই গল্প সবাইকে বলে' আসি।

অশ্রু। সবাই থাম্‌চে দেবে।

প্রভাত। এ কী রকম হ'ল জান? একবার এক মান্দ্রাজি ভদ্রলোক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হল্-এ নিবিষ্টমনে ছবি দেখ্‌ছেন— যতই দেখেন ততই আবিষ্ট হ'ন। এমন সময় পেছন থেকে একটি মারহাঠি ভদ্রলোক বললেন: এক চোখ বুজে' তাকান, ছবিটা খুল্‌বে। মান্দ্রাজি ভদ্রলোক এক চোখ বুজ্‌বার কসরৎ করতে গিয়ে ক্ষণকালের জন্যে দু'চোখই বুজে' ফেল্‌লেন, আর সেই ফাঁকে তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। তাঁর সর্ব্বস্ব! তেমনি—

অশ্রু। তেমনি কি? একটা চুমুতেই আমার সর্বস্ব লুট হ'য়ে যায় না বোকারাম—

বলে'ই ফের পা বাড়ালো।

প্রভাত। (বাধা দিয়ে) যাচ্ছই ত,' তোমার একখানা হাত দাও। দেখি তুমি নার্ভাস হয়েছো কি না। যক্ষ্মাক্রান্ত কীট্‌সের হাত ধরে' কোল্‌রিজ্‌ নাকি মৃত্যুকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো।

অশ্রু। এবার যে মুখ ফুটে চাইতে পাব্‌ছো।

প্রভাত। হাত চাওয়া যায়, কিন্তু চুমু চাওয়া যায় না। এবার থেকে চাইতে পাববো আশা করি। প্রথম চুমু মাত্রেই ভীরু, সাবানের বুদ্‌বুদের মতো। প্রস্ফুটিত হ'তে না হ'তেই যায় শুকিয়ে। আমার কি, স্বয়ং রুডল্‌ফ ভ্যালেন্‌টিনেরো। (প্রথম চুমুতে চোখ্‌ চেয়ে থাকলে কেন জানি বাধে—যেমন প্রথম কবিতার ছন্দে বাধে।)

অশ্রু। এখন ত' দেখ্‌ছি কিছুতেই বাধ্‌ছে না। তুমি যাবে না?

প্রভাত। যাচ্ছি। এক কাজ কর—হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, তুমি বরং আমার যাবার পথে একদৃষ্টে চেয়ে থাকো।

অশ্রু। (হেসে) তাই সই।

প্রভাত। (পেছন ফিরে) দরকার হ'লে রুমালের বদলে আঁচল উড়োতে পারো।

অন্ধকার রাস্তায় প্রভাত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। অশ্রু ততক্ষণ দাঁড়িয়ে।

ডাক বাংলোয় ফিরে এসে প্রভাত বেয়ারাকে ডেকে তাড়াতাড়ি রাত্রির খাওয়া সেরে নিলো। একে আবরাত বলে না,—কল্‌কাতায় তো এখন সবে সন্ধ্যা—কিন্তু এরি মধ্যে এদেশের ঘুম এসেছে। প্রভাত বারান্দায় ডেক্‌-চেয়ারটা টেনে আন্‌লো। কিন্তু চুপ করে' বসে' থাকা সম্ভব হ'লো না। পাইচারি করে' সমস্ত শরীরটাকে চঞ্চল, অস্থির, বেগময় করে' রাখ্‌তে চায়। আলস্য আজ ওকে তৃপ্তি দেবে না। এই উচ্ছলতা কমে' এসে যখন মাত্র উষ্ণতায় পর্যবসিত হ'বে তখনই কবিতা লেখা সম্ভব। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার এই সংজ্ঞায় সে বিশ্বাস করে। মরুভূমি-সম্বন্ধে সত্যিকারের কবিতা লিখতে হ'লে ইজি-চেয়ার আর ইলেকট্রিক পাখা চাই। প্রেমিকার অন্তর্দ্ধান না ঘটলে প্রেমের কবিতায় প্রাণ আসে না।

যাক কবিতা, কাব্যের চেয়ে মানুষ বড়ো। লক্ষ এদিকে একটা মানুষের সত্য চরিত্র বর্ণনা চলে না—সে এতো বিচিত্র, এতো বহুল-প্রকাশময়! কাল প্রভাত ছিল সামান্য কেরানি, পাঁচ আঙুলের একটা আঙুল,—অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত,—নেহাৎই সাধারণ! ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন না থাকবার কোনো কারণই কাল ছিল না। বিকেল পাঁচটায় ড্যালহৌসি স্কোয়ারের চার ধারে কেরানির যে বিপুল ঢল্‌ নামে তারই অন্তরালে আত্মগোপন করে' ছিলো,—ওকে সেখান থেকে অপসৃত করে' নিলেও সে মিছিলের তাল কাটতো না। ও এত অপ্রয়োজনীয়। ভগবানকে ও এইজন্যেই কোনোদিন ডাকেনি যে, ভগবান বলে' কেউ থাকলেও ওর কথা নিশ্চয়ই আর কানে তুল্‌বেন না। এত তুচ্ছ লোকের এত অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা শোন্‌বার জন্যে তাঁকেও কান খাড়া করে' রাখ্‌তে হবে—ভগবানকে এত ছোট বলে' কল্পনা করতে ওর বাধ্‌তো। সেই প্রভাত আজ কয়েক ঘণ্টায় যেন খোলস

বদ্‌লে ফেলেছে। পৃথিবীর মাথার ওপরে যে এতো বড়ো একটা আকাশ আছে সে-কথা আজকে রাতে হঠাৎ আবিষ্কার করে' ওর তৃপ্তির যেন আর শেষ রইলো না। সব চেয়ে আশ্চর্য, সেই আকাশের মুকুরে প্রভাত নিজের মুখের ছায়া দেখ্‌ছে—এবং ওর মুখ যে কত সুন্দর তা ও এই প্রথম টের পেলো। ওর নার্সিসাস্-এর কথা মনে পড়ে। নার্সিসাস্ ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো—নিজেরই সঙ্গে সে প্রেমে পড়লো, নিজেরই বিরহে কাঁদ্‌লো, নিজেকেই পাবে না ভেবে অসীম বেদনায় আত্মহত্যা করলো। সে কী অপূর্ব মৃত্যু। নাসিসাস্ ফুল হ'য়ে জেগে উঠ্‌লো ঝর্ণার ওপর!

প্রভাত ভাব্‌লো আমরা প্রিয়াকে ভালোবাসি না, ভালবাসি আমরা আপন আত্মাকে—যে-আত্মা নারীকে প্রিয়া করে' দেখেছে। তাই সে আমাদের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু, যার মধ্যে নিজেকেই বেশি করে' দেখ্‌তে পাই। যে-প্রতিভায় আমরা প্রস্তরের বেদীতে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করি তার জন্যে আমাদের অহঙ্কারের অন্ত কৈ? প্রেমে আমাদের আনন্দ যতো, অহঙ্কার তার চেয়ে ঢের বেশি। এই অহঙ্কারে বিধাতাও আমাদের সমকক্ষ নন্। তাই প্রেম যখন মরে, বেদনার চেয়ে অপমান এই জন্যেই বেশি লাগে যে, অহঙ্কার যায় ধূলিসাৎ হ'য়ে। অহঙ্কার যাওয়া মানে নিজের কাছে ব্যক্তিত্ব হারানো। নিজের কাছে লজ্জাই সব চেয়ে বড়ো লজ্জা।

নইলে, অশ্রু তো এখানে গৌণ,—ও যে কেরানি ছাড়া আর কিছু, ওরো যে এত বড়ো বায়ুমণ্ডলে নিশ্বাস ফেল্‌বার অধিকার আছে, আকাশের আস্বাদ নেবার—তা ওকে বোঝালো ওর সদ্যজাগ্রত বুদ্ধি, নব-উন্মেষিত প্রতিভা! যেখানে হৃদয় জাগে, বুদ্ধি থাকে ঘুমিয়ে, সেখানে প্রেমের স্বভাব হয় ছিঁচ্‌কাঁদুনে স্যাঁতসেঁতে—আর যেখানে

হৃদয় নেই, খালি বুদ্ধি, সেখানে প্রেম অর্থ সকালে উঠে গরম দুধ খাওয়া ও কাণ্ট্-এর *Critique of Pure Reason*-পড়া। কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয় মেশাতে হ'বে। তা হ'লে ছুটো প্রেমপত্র লিখে দু'রাত পাশাপাশি শুয়ে দুটো হাই তুলে পুন্নাম-নরক থেকে রক্ষা পেয়ে কায়ক্লেশে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে যা হোক্।

ভাবতে বস্‌লে মন যে বাঁধা সড়ক দিয়ে না চলে' অলি-গলিতে গড়িয়ে পড়ে এর জন্যে প্রভাত মনকে শাসন করে' মোড় ফেরালো। এমন সময় ও কোনোদিন সংসারের ভাবনা না ভেবে বারান্দায় বসে' জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করবে এ-কথা ওব জন্মাবার ছ'দিনের দিন মা'র আঁতুড ঘরে ঢুকে ওর ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই ওর কপালে লিখে রেখে যান্ নি। ও যেন ফের নতুন মুখোস্ পরে' অশ্রুর কাছে আবির্ভূত হ'ল—তার মানে ও ওর দ্বিতীয় চরিত্রাভিব্যক্তি আবিষ্কার করেছে। ব্রাউনিঙ মনে পড়ে:

"God be thanked, the meanest of His creatures
Boasts two soul-sides, one to face the world with,
One to show a woman when he loves her."

কথাটা সত্যি, কবিতায়ো শোনায় ভালো, কিন্তু যে-মুখ করে' আমরা এই নিরানন্দ রুক্ষ সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি, প্রেয়সীর কাছে সে-মুখ তুলে ধরতে পার্‌বো না কেন, লজ্জা কিসের? প্রেয়সীর কাছে দাঁড়াতে হ'লেই সে-মুখে মেকি পাউডার ঘষতে হবে— এই কল্পনা-বিলাসের তাৎপর্য কোথায়? প্রেয়সীও আসবার সময় তাঁর আটপৌরে আধ-ময়লা শাড়িখানি ছেড়ে জরির চুম্‌কি দেওয়া বেনারসি পরে' এসে একেবারে নক্ষত্রমণ্ডিত অমাবস্যা-রাত্রির উপমেয়া হ'য়ে উঠবেন—এরি বা কাব্যগত প্রয়োজনীয়তা কিসে? প্রভাত

কেরানি, ক্ষুদ্রস্বার্থপীড়িত, লোভী, সংকীর্ণচিত্ত—এ-সব পরিচয় একদম লুকিয়ে লেফাফাদুরস্ত হ'য়ে অশ্রুর কাছে এসে দেখা দেবে—উদার, মহানুভব, ইত্যাদি—! কেন? প্রেম করবার বেলায়ো যদি এত লুকোচুরি—যেখানে অজস্র আত্মপ্রকাশের তাগিদ্—তবে প্রেম করার চেয়ে দু'ছিলিম তামাক খাওয়ায় বেশি লাভ। এমনি করে' পোষাকি কাপড়-চোপড় পরে' পরস্পরকে দেখা দিতো বলে'ই ওথেলো আর ডেস্‌ডেমোনার মধ্যে এমন প্রকাণ্ড ফাঁক রয়ে' গেলো। ডেস্‌ডেমোনা ভালবেসেছিলো যোদ্ধা ওথেলোকে, ঘরোয়া ওথেলোকে নয়,—ফলে তার বুক পেতে ছুরি খেতে হ'লো। প্রেয়সীর কাছে মুদ্রাদোষ দেখানো নিষেধ আছে—এই নিয়ে রাশি-রাশি বই লেখা হ'ল- কেন বাপু, মুদ্রাদোষ নেই অথচ মানুষ—এমন অমানুষ আছে ক'টি? সব সময়ে নিজের সঙ্গে বঞ্চনা করে' একটা কৃত্রিম উজ্জ্বলতার মুখোস পরে' নিজের মহিমা বাড়াতে হ'বে—এই আত্ম-অপমান প্রত্যেক প্রেমিক কি করে' সহ্য করেন? পাছে ব্যক্তির স্বরূপ জান্‌লে প্রেয়সী নাকের ওপর কাপড় টেনে যান্ পিছিয়ে! (যেখানে এত ভয় এত সন্দেহ সেখানে প্রেমের ফাঁসি হওয়াই ত' উচিত একশোবার। যাকে জান্‌তে চাইবো তাকে জানাবো না—এ অসামঞ্জস্যের কথা প্রেমের বেলায় ওঠে কেন? তাই প্রতিমুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরকে ঠকাচ্ছে। এবং সেই কারণেই "love marriage" আর টিক্‌ছে না, উঠ্‌ছে হাঁপিয়ে, পদে পদে অমিল্,—পোষাকি কাপড় চোপড় উইয়ে কেটেছে। জীর্ণ বসনের তলা থেকে দারিদ্র্য পড়েছে বেরিয়ে।)

প্রভাত কথাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছে যেন অশ্রু ওর দেহের কূলে এসে একদিন উত্তীর্ণ হ'বেই। এমনি একটি বিশ্রী আশা করাও প্রেমের ব্যাপারে স্বাভাবিক; প্রেমও তার একটা

সহজ পরিণতি খোঁজে, হয় বিরহে বিস্মৃতি, নয় বিবাহে বৈক্লব্য! প্রভাত ক্ষণ-বন্ধুতার উপযুক্ত দাম দিতে জানে, তাকে আটকে রাখবার জন্যে তার গলায় দড়ি চাপিয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে' দিতে হবে এই বর্বরতা সে পছন্দ করে না। সে Moment Musical-এর ভক্ত।

তার কারণ প্রত্যেক ভালবাসাই গভীর বন্ধুতায় দৃঢ়ীভূত হ'য়ে দুই দেহ আর দুই আত্মার ব্যবধান ঘোচাবে—মেয়েদের এমন প্রেমে প্রভাত বিশ্বাসবান নয়। এ-কথা টের পেলে অশ্রু নিশ্চয়ই কোমরে কাপড় বেঁধে একেবারে মারমুখো হ'য়ে উঠ্‌তো,—এমন সব তর্ক করতো হয়তো যার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে প্রভাতকে এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রাস করতে হতো। কথাটা ওর তর্কের দিক দিয়ে ওঠেনি, অনুভূতির দিক থেকে উঠেছে—তর্ক অবশ্য ও-ও করতে পারে না এমন নয়। মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করায় এই অসুবিধে যে সব কথা বলা যায় না, দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বেরুবার আগে জিভ কাট্‌তে হয়—মেয়েরা সব ঠুন্‌কো পুতুল, গায়ে আঁচড় লাগ্‌বে। পাঞ্জা কষতে হ'লে সমতল জায়গায় দাঁড়ানো উচিত। সম্ভ্রমের সিংহাসনে বসিয়ে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা চল্‌তে পারে, তর্ক করা নয়। তাঁদের দয়া করে' নেমে আস্‌তে হ'বে।

মেয়েদের প্রেম সন্ততির জন্যে, ব্যক্তির জন্যে নয়। মেয়েরা ভালবাসে স্বামী-নামক একটা গুণবাচক বিশেষণকে, কোন্ বস্তু-বিশেষকে নয়। তাই স্বামী যখন মরে তখন স্ত্রী কাঁদে বিধবা হ'ল বলে', অনেক অসুবিধায় এবার তাকে পড়তে হ'বে। মেয়ে হয়েছে প্রতিমা, পুরুষ হয়েছে প্রতীক্। এই দু' মিলে আমাদের প্রেম। শিশুকাল থেকে শিব গড়ে' স্বামীর পুজো করে' যে-ভাবটি মেয়েরা মনে মনে লালন করে যৌবনোদ্গম হ'তেই সে-ভাবটি যে-কেউর প্রতি আরোপিত করে' মেয়ে হয় পতিব্রতা। সে-

সৌভাগ্য তোমারো জুট্‌তো আমারো জুটতো, ও-পাড়ার পঞ্চাননো অযোগ্য হ'তো না।

বিশেষ করে' বাঙালি মেয়েদের দোষ দেওয়ায় বাহাদুরি নেই—বিশেষ অশ্রুর অনুপস্থিতিতে। বায়রণ যে বায়রণ সেও পর্যন্ত তার *Sardanapalus*এ মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছে। বায়রণকে ক্ষমা করা যেতে পারে কেননা ভাবপ্রকাশের বিচিত্রতাই কবি প্রতিভার বিশেষত্ব। নারীর যা মূল্য তা কী সে সৃষ্টি করে তার মধ্যে, নয়, কী সে সহ্য করে। সহ্য করাটা ভীরু ধর্ম। সহ্য তাকেই করতে হয় প্রকৃতি যাকে বেঁধেছে; তাই সেটা তার কৃতিত্ব নয়। খুব তীব্র বেদনা বা আনন্দ অনুভব করবার তার ক্ষমতা নেই এবং সেই জন্যেই সে তেমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে নি যা অমরত্ব লাভ করতে পেরেছে। অমরত্ব লাভ করাটাই অবশ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষের চিহ্ন নয়। তবু অমরত্ব লাভ করা দূরে থাক্, দুটো নাম করা যায় তেমন নামও মেয়েদের কোনো বাপ-মা রাখে নি। এবারে অশ্রু নিশ্চয়ই মারতে আসতো। মেয়ে সৃষ্টি করতে পারে নি? কেন? মাদাম কুরি! বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দাও, সাহিত্য। কেন, ব্যারেট্? উণ্ড্‌সেট্? শীলা কেইস্মিথ? চুপ কর অশ্রু, হাসিয়ো না বল্‌ছি। তার চেয়ে বল না কেন অনুরূপা দেবী!

মশার কামড় খেয়ে বাইরে বসে থাক্‌লে পূর্বপুরুষরা উদ্ধার পাবে না। এবার ঘুমুনো যাক্। ঘুমুতে যাবার আগে একটা সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। সিগারেট, সেও খাওয়া; জল, সেও খাওয়া! বাঙলা ভাষায় ক্রিয়া নেই,—সে জন্যে জাতটাও অকর্মণ্য। ক্রিয়া নেই বলে' আনন্দ নেই; তাই বেড়ে চলেছে ব্যাধি, বেড়ে চলেছে বার্দ্ধক্য। কথা আবার ঘুরে যাচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ঘুমুতে গেলেই আর ঘুম আসবে না! তার চেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা যাক্।

টেলিস্কোপ ছাড়া গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে কোন আবিষ্কার সম্ভব হবে না। খুব একটা দার্শনিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করছি ভাব্‌লে শিরদাঁড়াটা ডেক্‌-চেয়ারের ওপর আল্‌গোছে নেতিয়ে পড়ে। সব মিথ্যে, বাজে, বিস্বাদ।

একবার নাকি দুই চীনে' ভদ্রলোক বার্লিনে গিয়েছিলো থিয়েটার দেখতে। দু'জনেরই সমান বিদ্যে, দু'জনেই সমান রসিক। খানিকক্ষণ বসে' থেকে একজন লেগে গেল যন্ত্রপাতি দেখতে; আরেকজন কিন্তু কিছুতেই হার মান্‌বে না। সে তেমনি ঠায় চুপ করে' বসে'-বসে' সেই দুর্বোধ ভাষা গিল্‌তে লাগলো। একেই বলে রসগ্রাহিতা। প্রথম জন হচ্ছে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত—সারা সৌরজগৎ ঘুরে বেড়ায়, অথচ না পায় সীমা না পায় থৈ; আরেকজন হচ্ছে দার্শনিক পণ্ডিত—দুর্জ্ঞেয় রহস্য হাত্‌ড়ে বেড়ায়, অথচ না পায় অর্থ না বা রস! আমি করব কাব্যসৃষ্টি আমার পেছনে থাকবে সমালোচক, আমি গাইব গান পেছনে আসবে গ্রামোফোন্‌। আমি সূর্যের চারধারে গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে ঘুরিয়ে দিলাম—সে-ঘোরার তাপ-নির্ণয় করতে ভিড় করে' এল অসংখ্য বৈজ্ঞানিক। সমালোচকের আব্‌দারে কবির কলম বেঁকে যায় না—পিথাগোরাস না এলেই পৃথিবী বুঝি হ'য়ে থাক্‌ত চ্যাপ্‌টা, আর সূর্য বেচারা ঘুরে ঘুরে দম খোয়াতো!

যাই বল, রসগ্রাহিতাই হচ্ছে সভ্যতার পরম পরিচয়। সৃষ্টিটা তত দামী নয়, যতোটা তার রহস্য-উদ্ধার। বুনো অসভ্যরাও এমন সব সৃষ্টি করেছে যার অর্থ ও মর্যাদা তারা বুঝতো না বলে'ই তারা অসভ্য—কিন্তু তাতে যদি আমাদের তাক্‌ লাগে তবেই বুঝ্‌ব আমরা সভ্য হয়েছি। নাঃ, এ ভীষণ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর পিন্‌ ফুটিয়ে সিগারেট খেয়ে কাজ নেই। ঘুমুনো যাক্‌। কুঁজো থেকে বেয়ারা জল এনে দিলে, প্রভাত তা দিয়ে ঘাড় ধুতে বসলো।

অশ্রুর জিনিস-পত্রের ফিরিস্তি শোন: একটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক—বুকে হাতি না নিয়ে এ ট্রাঙ্কটা নিলে রামমূর্ত্তির খ্যাতি এক তিল কম্তো না, প্রকাণ্ড বেডিং—তাতে খাটের গদি থেকে সুরু করে' পা-পোষ পর্যন্ত আছে—ছটা ঋতুর ছ-প্রকার শয্যার সরঞ্জাম; তা ছাড়া ছোট দুটো সুটকেস; একটা খাবারের বাক্স বেতের তৈরি; একটা ফোল্ডিং রকিং চেয়ার—একটি না হলে অশ্রুর না হয় পড়া, না হয় ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমুনো; একটা বই-এর বাক্স কেরোসিন-কাঠে প্যাক করা; একটা ছোট বেডিং—পথে গাড়িতে পাত্‌বে বলে'; একটা জলের কুঁজো—ভারি চমৎকার কাজ করা—এটা ফেলে আসতে পার্‌তো, কিন্তু অমন চমৎকার কাজ করা বলে'ই অশ্রুর মায়া লেগেছে: এই সব জিনিস প্ল্যাটফর্মে জড়ো করে' অশ্রু প্রভাতকে বললে—লাগেজ্‌ কর।

প্রভাতের মাথায় যেন মালগুলো একসঙ্গে পড়্‌লো ভেঙে—কর্ণের বাণ খেয়ে ঘটোৎকচের মুখের চেহারায়ো এমনি অঘটন ঘটেনি। প্রভাত বললে—আমি আজ পর্যন্ত মনি-অর্ডার কর্‌তে শিখিনি,—আমার দ্বারা ওসব হবে না। যদি পারো তুমিই একলা এর ব্যবস্থা কর, নইলে থাক্ সব পড়ে'—পরপারে কিছুই সঙ্গে যাবে না।

এই নিয়ে লেগে গেল তর্ক—তুমুল, উদ্দাম। পুরুষগুলো যে মেয়ে বিহনে একেবারে অসহায়, অকর্মণ্য—অশ্রু এ-কথা অনেক আগে থেকেই জানে। এগুলোর না আছে বুদ্ধি না আছে বোধ। প্রভাত অসহায়ের মতো মুচ্‌কে একটু হেসে বললে—বাহন একটা না হ'লে আমাদের সত্যিই মানায় না। গণেশের যেমন ইঁদুর।

লাগেজ্‌-এর ব্যবস্থা অশ্রু একাই কর্‌লো। ডাইন-ট্রেনে ভিড় নেই—জান্‌লার দিকের বার্থ টায় অশ্রু বিছানা পেতে নিলো। বললে—মাঝের খালি-গদিটার ওপর পড়ে থাক, বুঝবে মজা।

প্রভাত হেসে বললে—আমি মাঝের বঙ্কিটাতে বসছিই নে, তোমার বিছানাতেই আমার একটু জায়গা হবে—বসবার। শোবার সময় না হয় উঠে আসবো।

অশ্রু। শোব না হাতি!

প্রভাত। তুমি শুয়ো।

অশ্রু। আর তুমি?

প্রভাত। জেগে থাক্‌বো। তোমাকে ঘুমুলে নিশ্চয়ই খুব বিশ্রী দেখাবে না।

অশ্রু। এই, আস্তে। বলে' অন্যদিকের জান্‌লার ধারের বার্থ টায় যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শুয়ে আছেন তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলে।

গাড়ি দিলো ছেড়ে। স্টেশনে বুলুরা আসবে বলে'ও আসেনি—তাই ওদের লক্ষ্য করে' সারা জলপাইগুড়ি শহরটার ওপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টিশেল হেনে অশ্রু তর্কে মন দিলে। প্রভাত বলছিলো: মেয়েরা যে সভ্য হয়নি তার প্রমাণ—চল্‌তে হ'লে হয় নেবে গুচ্ছের আণ্ডা-বাচ্ছা, নয় রাশি রাশি মাল। কখনো কখনো দু'প্রস্থই; ভার কিংবা ভিড়।

অশ্রু প্রতিবাদ করে' উঠলো: মেয়েরা না থাকলে খেতে কি? চল্‌ত কি ক'রে?

প্রভাত। এক জোড়া জুতো না হ'লেও আমাদের চলে না,—সকালে উঠে একটা dentifrice দরকার। মেয়েরা না থাক্‌লে রেঁধে দেবার অসুবিধে ঘট্‌তো, ভাগ্যিস্ মেয়েরা আছেন! উড়ে মইওয়ালা না থাক্‌লে বিকেলে কল্‌কাতার রাস্তার গ্যাস জ্বল্‌তো না; রাস্তায় পড়তো না জল, জমাদাররা ধর্মঘট করলে শহরে লাগতো কলেরা। মেয়েদের উপকারিতায় আমি সন্দেহ করি নে।

অশ্রু রীতিমত খাপ্পা হ'য়ে উঠলো : তুমি এমনি অপমান করে' কথা কইলে আমি গাড়ির শেকল টেনে দেব।

প্রভাত। তা মেয়েরা পারেন।

অশ্রু। মেয়েরা কী যে পারেন তা যদি তুমি জেনেও স্বীকার না কর সে তোমার একচোখোমি। ত্যাগে সংযমে সেবায় আত্মোৎসর্গে এমন গরীয়সী আর কোথায় পাবে?

প্রভাত। মানি; বুদ্ধিতে নয়!

অশ্রু। মেয়ে ছাড়া শৈশব আমাদের অসহায়, যৌবন নিরানন্দ, প্রৌঢ়তা বিরস, মৃত্যু রুক্ষ, তৃষার্ত।

প্রভাত। পুরুষ ছাড়া তোমাদের জন্ম আকাশকুসুম, যৌবন পঙ্গু, প্রৌঢ়তা দুর্বল, মৃত্যু বিষাক্ত।

অশ্রু। মেয়েদের দুই হাতে অজস্র সেবা, অকৃপণ তিতিক্ষা, অপূর্ব আত্মনিবেদন। দুঃখ-দুর্দিনে সান্ত্বনার দীপশিখা। মেয়েরা গৃহদীপ্তি, পুরুষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী।

প্রভাত। কবিত্ব কর, বাধা দেব না। শুনতে আমার ভালোই লাগবে। মেয়েদের নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি ক'রে লেখা রবিঠাকুরের কবিতার আমি প্রকাণ্ড ভক্ত। সেগুলো সত্যকথন বলে' নয়, সেগুলো নেহাৎই কবিতা বলে'। যদি বল, ভাবুকের আদর্শ উন্নত হ'তে হ'তে অবশেষে মেয়ে-মানুষের আকার নেয়, আমি তোমাদের মুখ চেয়ে সেই ভাবুককেও না হয় ক্ষমা করব। কিন্তু সত্যি করে' বল দেখি মেয়েরা কোনোদিন কোনো বড়ো বেদনা সয়েছে বা কোনো বড়ো আনন্দের অধিকারী হয়েছে?

অশ্রু। তুমি বল কি? প্রত্যেক মানবজন্মের পেছনে প্রসূতির যে তীব্র ও গভীর বেদনা আছে—তার চেয়ে মহত্তর বেদনার দৃষ্টান্ত

তুমি দেখাতে পারো? মেয়েরা বড়ো বেদনা সয়নি ত কে সয়েছে? পৃথিবীতে মাত্র দুটি মহান্ ও মর্মভেদী ক্রন্দন আছে—এক সন্তান যখন হয়, আর সন্তান যখন মরে—দু'টি কান্নাই মায়ের, মেয়ের।

প্রভাত। কথাটাকে তুমি সুন্দর করে' বল্‌লে বটে, কিন্তু এক ফুঁয়ে এর ভাবের কুয়াসা কেটে দিচ্ছি। প্রসবের বেদনাটা খুব বড়ো বেদনা নয়—তা হ'লে appendicitis operation করার বেদনাও তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাল্লা দিতে পারে। ধর, রোগীকে ব্যথা না দিয়ে আজকাল যেমন সহজে দাঁত তোলা যায়, তেমনি যদি painless delivery-র প্রচলন হয় তখন এ-বেদনার গর্ব যাবে ধূলিসাৎ হ'য়ে। শারীরিক কষ্টের কথা যদি বল, ট্রামগাড়ির তলায় পড়ে' যার পা যায় আটকে অথচ যে বেঁচে থাকে—তীব্র বেদনানুভবের ক্ষেত্রে তা হ'লে সে হিরো। আমি সেই দুঃখের কথা বলছিনে। তুমি মেয়ে বলে'ই নিতান্ত অসহিষ্ণু হ'য়ে কথাটার গূঢ় অর্থ বোঝনি। বেদনা অর্থ আত্মার বেদনা, আনন্দ অর্থ সৃষ্টির আনন্দ—অভিনবতার আনন্দ।

অশ্রু। হয় তো তেমন ঢের আছে; আমি জানি না বলে' দৃষ্টান্ত দিতে পার্‌বো না।

প্রভাত। দৃষ্টান্ত নেই বলে'ই জান না। তেমন ভাবুক হবার সাধনা মেয়েদের নেই। তার জীবন স্বচ্ছ, প্রশান্ত, মন্থর—স্রোতের ফেনিল উচ্ছ্বাসে আবর্তসংকল নয়, বেগবান নয়, সন্ধানব্যাকুল নয়। তার প্রাণে না আছে তার, দেহে না আছে স্বাদ! আমার রেইন্-কোট্‌টার মতো—জল থেকে ত্রাণ করে এই তার উপকারিতা। পুরুষের চেয়ে মেয়ে কত খর্ব, কত সংকীর্ণ! পুরুষ বাস করে একমাত্র বর্তমানে নয়, অতীতের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখেনি, দুই চোখে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন। পুরুষ অতীতকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতের আবিষ্কারে

চলেছে। জীবন তার কতো বিস্তৃত, কত অগাধ। আর, মেয়েদের জগৎ হচ্ছে সামান্য সংকীর্ণ এই ছোট বর্তমানটুকু—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কোনো ভরসা রাখে না, বিস্মৃতির বালিতে অতীতকে সে মুছে দিয়ে এসেছে। তাই মেয়েরা জীবনে অগ্রসর হয় না, আত্মায়ো খর্ব হ'য়ে থাকে।

অশ্রু। যে-সমাজ খালি পক্ষপাতী পুরুষের সৃষ্টি, সেখানে মেয়েদের খর্বতা—

প্রভাত। তুমি এটা কেন লক্ষ্য করছ না আমি নারী-পুরুষের সামাজিক তারতম্য দিয়ে কথা বল্‌ছি না। আমি জানি সমাজ কৃত্রিম, বাইরের একটা খোলস মাত্র। সেখানে পুরুষ যদি অন্যায় করে' তোমাদের দাবিয়ে রাখে সেজন্য তোমাদের না হয় ক্ষমা কর্‌লাম।

অশ্রু। আমাদের ক্ষমা।

প্রভাত। হ্যাঁ, তোমাদের। কারণ, সেখানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে শক্তিতে ও বুদ্ধিতে তোমরা ছোট। কেউ কাকে পদানত করে' রেখেছে—এ-ব্যাপারটার মধ্যে এক পক্ষের অত্যাচারের যতোই কেন না প্রমাণ পাওয়া থাক্‌, অপর পক্ষের দুর্বলতাকে কি বলে' অস্বীকার কর্‌বে? রাজাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলে' গাল দিয়ে পরাধীন দেশের দাসত্বের না মেলে সান্ত্বনা, না বা সমর্থন। আমি জানি, সমাজ নিয়ে তোমাদের ওপর অনেক জবরদস্তি হয়েছে, আমি সে-দিক দিয়ে যাচ্ছি না, কেননা সমাজ হয় তো, হয় তো কেন নিশ্চয়ই উল্টে যাবে—কিন্তু অঙ্গারকে শতবার ধুলেও তার মলিনতা ঘুচবে না। প্রকৃতি যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন তাকে মার্‌বে কি করে'?

অশ্রু। তার মানে?

প্রভাত। তার মানে তোমরা সেই সংকীর্ণই থাক্‌বে, দৃষ্টি তোমাদের বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে না। ছোট স্বার্থ নিয়ে

কলহ করবে কেননা সৃষ্টি করতে বুদ্ধি ও বেদনাবোধের যে বিকাশ দরকার তোমাদের মস্তিষ্কে তাঁর জায়গা নেই।

অশ্রু। তুমি যতই কেন না বল—একদিকে পুরুষকে আমরা নিশ্চয়ই হারিয়েছি। সে আমাদের রূপ! কবিরা আমাদের পায়ের তলায় পড়ে' গড়াগড়ি যাচ্ছে।

প্রভাত। জানি এ কথা বলে' তুমি অনেকটা আশ্বস্ত হ'বার ভান করবে। ওটা তোমাদের no-trump-এর বড়ো bid। রূপ তোমাদের আছে—তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র আত্মবঞ্চনার বর্ম–হাতির যেমন দাঁত, গণ্ডারের যেমন খড়্গ। শক্তি যার নেই তা'রই অবলম্বন হয় চাতুরী। আর সেই রূপের স্থায়িত্বই বা কতদিনের? একটি দু'টি সন্তান হ'লেই সে-রূপ আইডিন্-লাগা মরা চামড়ার মতো খসে' পড়ে—প্রসব করবার পর পিঁপড়ের যেমন পাখা খসে।

অন্য বার্থে যে ভদ্রলোকটি শুয়েছিলেন তিনি এবার উঠে বস্‌লেন। খাপ্ থেকে চশমাটি বা'র করে, নাকের মাঝামাঝি বসিয়ে প্রভাতের দিকে একটি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' প্রশ্ন করলেন: মশাইদের কতদূর যাওয়া হচ্ছে?

প্রশ্নটা শুনেই বোঝা গেলো এ-সব কথা-বার্তা শুনে ভদ্রলোকের চিত্ত প্রসন্ন হ'য়ে ওঠেনি; তবু কণ্ঠস্বরকে বিনয়-স্নিগ্ধ করে'ই প্রভাত জবাব দিলো: কল্‌কাতা। আপনি?

ভদ্রলোক বললেন—আমিও সেইখেনে! কল্‌কাতায় কোথায় থাকা হয় মশাইদের? (অশ্রুকে লক্ষ্য করে') সঙ্গে উনি কে জিগ্‌গেস করতে পারি?

—পারেন না। বলে' প্রভাত মুখ ফিরিয়ে পুরোনো কথায় ফিরে গেলো: রূপের কথা বল্‌ছিলে না? পুরুষের তুলনায় মেয়ের রূপ যেন

সূর্যের পাশে জার্মানি দেশলাই। পুরুষের তুলনায় খর্ব—মনে ও বাক্যে ত বটেই—কায়মনোবাক্যে। এমন "unaesthetic sex" আর আছে কোথায়? কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত, কি ছবি—বধির, তোমরা বধির। বীঠোফেন্-ও বধির হয়েছিলেন কিন্তু সে বধিরতা তাঁর সৃষ্টি-সাধনাকে আহত করতে পারে নি; মিলটন্ হয়েছিলেন অন্ধ, কিন্তু সেই চিরসূর্যাস্তের অন্ধকারে যে-স্বর্গ রচনা করেছিলেন তার তুলনা নেই। আচ্ছা, সৃষ্টি-সাধনায় নারীকে ত' কেউ বাধা দিতে আসেনি, সে কেন কবি হ'তে পারলো না, কেন পারলো না ছবি আঁকতে? উত্তর দাও অশ্রু। প্রতিভার যে অধিকারী হয় অবস্থার বশ্যতা সে স্বীকার করে না। সে গৃহত্যাগ করে, ভাগ্যের সঙ্গে যুঝতে নিরস্ত্র হ'য়েই পথে বেরয়, অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে' প্রতিভাকে সে একটা মহান্ মর্যাদা দান করে। তোমরা কেন এত নির্জীব, কেন এত ভীরু, কেন এত পরীক্ষাকুণ্ঠ? গৃহের দায়িত্বের কথা যদি তোল—তা হ'লে পুরুষের বেলায় পৃথিবীর দায়িত্বের কথা তুলবো। যদি সে প্রতিভার স্পর্শ পায় গৃহকে সে মানবে কেন, ভেঙে বেরিয়ে পড়বে। প্রতিভাবানও কি তোমার এই সংসারের ready-made তুচ্ছ নিয়ম-কানুন দিয়ে বাঁধা থাকবে? সে নিজে নিজের নিয়ম তৈরি করবে, নিজের নিয়ম নিজে ভাঙবে। ধরণী দেন শস্য, তোমরা দাও সন্তান। তোমাদের দিয়ে রচনা লিখতে হ'লে এই বলে'ই উপসংহার করতে হয়। রূপ? সন্ন্যাসীরা যেমন গায়ে গেরুয়া টেনে ভণ্ডামি লুকিয়ে রাখে, তোমরাও তেমনি ছলাকলার আবরণে অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতা ঢেকে রেখেছো। কথা কইছ না কেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিবাণে অশ্রুর সর্বাঙ্গ এমন বিদ্ধ করছিলেন যে সে অসীম বিরক্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি মাঝের বেঞ্চিটায়

ভদ্রলোকেটির দিকে পিঠ করে' একেবারে প্রভাতের গা ঘেঁষে বসে' পড়লো। প্রভাত বুঝলো ব্যাপারটা। দু'জনে একসঙ্গে সামনের পরিত্যক্ত বেঞ্চিটায় পা ছড়িয়ে দিল - সাম্‌নে খোলা জান্‌লার ওপারে ধাবমান অন্ধকার। আলোটা নিভিয়ে দিলে ভালো হ'ত। কিন্তু ভদ্রলোকটি অস্পষ্ট একটি হুম্‌ বলে' ফের তেমনি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছেন এবার।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর মাথাটা প্রায় এলিয়ে দিয়ে বললে—কিন্তু প্রেমের বেলায় আমাকে যদি তুমি প্রাধান্য না দাও, তা হ'লে কথা কইবো না।

প্রভাত। তর্কের বেলায় অভিমান খাটে না। নারীর বেলায় প্রেম কখনো পরম নয়; স্নেহটা একটা instinct, সে একটা গরুরো আছে। কিন্তু প্রেমে শুধু emotion নেই intellectও আছে,—তোমাদের বেলায় খালি দুধের জলীয় অংশটুকু। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে যে-প্রেম—সে যতই সত্য হোক—অনেকটা সমাজের দাবি, সংসারের সুবিধে। বিয়ের আগে যে প্রেম—সে যতই সত্য হোক—বিয়ের পরে তার আর অস্তিত্ব নেই, সে অস্ত গেছে। বিয়ের পরে খ্যাতি বাঁচাতে একমাত্র মেয়েরাই বলতে পারে: ওঁকে আমি বোনের চোখে দেখেছিলাম, কিংবা ভাগ্নীর। মেয়েরা আত্মিক সাহসে এত অধঃপতিত যে তাদের সামান্য sense of justice পর্যন্ত নেই।

অশ্রু। তুমি মাতৃস্নেহকেও উড়িয়ে দেবে নাকি?

প্রভাত। উড়িয়ে দেব না তবে জুড়েও যে বসতে দেব এমন নয়। মাতৃস্নেহ খুব পবিত্র—ভালো ভালো পয়ার লেখা যেতে পারে ও-বিষয়ে; কিন্তু পিতৃস্নেহের সঙ্গে তার এই জন্যেই সমান আসন হয় না কারণ পিতৃস্নেহে যেখানে অহঙ্কার আত্ম চরিতার্থতা, মাতৃস্নেহে সেখানে মাত্র

হৃদয়াবেগ, একটা সামান্ত অভ্যেস। পিতৃস্নেহ instinctive নয় intellectual—instinct-এর চেয়ে intellect বড়ো।

অশ্রু। আমি তা মানি না। যতই কেন না বিরূপ তর্ক কর, আমি চট্‌ছিনে। বলে' অশ্রু আরো একটু ঘেঁষে এসে গুন্‌গুন্ করে' একটা স্বর ভাঁজ্‌তে লাগ্‌লো। এবার অশ্রু দস্তুরমতো প্রভাতের কাঁধে মাথা রাখলে। ব্যাপারটা এতো সাঙ্ঘাতিক নয় যে ট্রেন উল্টে যাবে। তবু পেছনের বেঞ্চি থেকে ভদ্রলোকের আরেকটি নকল হুঙ্কার শোনা গেলো।

প্রভাত বললে—ভালো হ'য়ে উঠে বোস।

অশ্রু। বাঃ, শরীরকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি তাতে তোমার আপত্তি হ'বার কারণ কি? পুরুষদের শক্তি সম্বন্ধে এতো সব লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে সামান্ত একটা মেয়েব খোপার ভাব বইতে পার্‌বে না এ-কথা শুন্‌লে এতক্ষণের নীরব ও অনুপস্থিত মেয়ের দল টিট্‌কিরি দিয়ে উঠবে।

প্রভাত। কিন্তু ভদ্রলোক কি ভাবছেন বল তো?

অশ্রু। তোমার সাহসের দৌড় এবারে বোঝা গেলো। তোমার ভদ্রলোক কি ভাব্‌ছেন ভেবে তো গ্রহ-তারায় কলিশান্ লাগ্‌ছে। তাঁকে যা খুসি ভাবতে দাও। শরীর যখন আহত হয় রুগ্‌ণ হয়—তখন সেই কষ্ট লোকের দেখতে খুব ভালো লাগে: সেটা বেশ সহজ, স্বাভাবিক, কিন্তু শরীরকে আরাম দিতে গেলেই লোকের চোখে তা সয় না, লাগে দৃষ্টিকটু। এর কারণ কি বল্‌তে পারো? আজ যদি আমার খুব জ্বর হ'য়ে কাঁপুনি হ'ত ও তোমার কাঁধে মাথা রেখে শুতাম তা হ'লে দৃশ্যটা মানাতো, হয়তো ঐ ভদ্রলোকের সহানুভূতিও পেতাম। কিন্তু সুস্থ শরীরটাকে একটু মোলায়েম আয়েস দিতে গেলেই যত

আপত্তি। প্রকাশ্যে ফোড়া কাট, দাঁত তোল,—বেশ; কেউ কিছু বলতে আসছে না, কেন না শরীর কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ্যে একটা চুমু দাও দিকি, লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে যাবে। নেংটি পরে' সন্ন্যাসী সেজে শরীরকে কষ্ট দাও লোকে বাহবা দেবে, কিন্তু একটা গরদের আলখাল্লা পর্‌লেই হ'ল সে বিলাসী হল সে খারাপ। কেন? শরীরটা তো প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছেই, একটু আরাম পেতে দেখলে লোকের হিংসে হয় কেন?

প্রভাত হয় তো কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলো, পেছন থেকে ভদ্রলোকটি রুখে উঠলেন: মশাইরা কি সারা রাতই এমনি বক্‌বক্ কর্‌বেন নাকি? চুপ করুন না খানিকটা। একে ভুগ্‌ছি Blood pressureএ, তায় যতো সব—। সঙ্গে থাক্‌তো পাঁচকড়ি—দিতো ঠাণ্ডা করে'।

কেউ চট্‌লে তার ওষুধ হচ্ছে তা'কে আরো চটিয়ে দেবার—মিষ্টি কথা বলে'। তাই প্রভাত পেছন ফিরে অতি-বিনয়ে সদ্যব্রাহ্মধর্মদীক্ষিত যুবককে পর্যন্ত হার মানিয়ে বললে—আহা, ভারি কষ্ট হচ্ছে তো আপনার। আপনি শুয়ে পড়ুন, আলোটা নিভিয়ে দিই। বলে'ই উঠে দরজার কাছে গিয়ে সুইচ অফ করে' দিলে।

গাড়িতে অন্ধকারের সঙ্গে বাতাসের বন্যা। অশ্রুকে অনুভব করে' নিতে প্রভাতের দেরি হ'ল না। অন্ধকারের মতো ঘন ও উদ্বেল।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো স্টেশনে। প্রভাত বললে—চল রেষ্টুরাণ্ট কার-এ, বেটাইম হলেও কিছু খাওয়া যাক। লোক থাকলেও এর চেয়ে ভালো company পাবো।

উৎফুল্ল হয়ে অশ্রু বলেল—চল।

রেষ্টুরাণ্ট কার-এ ঢুকে জানলার ধারে একটি ছোট টেবিল বেছে ওরা দু'জনে মুখোমুখি বস্‌লো। টেবিলের ওপর দু'টো কনুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে' অশ্রু বললো—যাই বল, আমি Eudemonist।

প্রভাত শব্দটার অর্থ জান্‌তো না, বললে—তার মানে?

অশ্রু। মানে খুব সোজা, শব্দটাই জাঁকালো। মানে হচ্ছে: যাতেই আমি আনন্দ পাবো তাই আমার ধর্ম। যেখানে আনন্দ সেখানে পাপ নেই।

প্রভাত। যেখানে পাপ আছে সেখানে আনন্দও আছে।

অশ্রু। সত্যিই আনন্দ থাক্‌লে সেটা আর পাপপদবাচ্য রইলো না। যেখানে আনন্দ নেই অথচ কর্তব্য আছে সেইটেই পাপ। যেমন ধরো, আজ যদি তোমাকে বিয়ে করি, পশু'ই সেটা পাপ হ'য়ে দাঁড়াবে, কেন না আনন্দ যাবে মরে'। তাই কর্‌বো না বিয়ে—আনন্দকে জীইয়ে রাখ্‌তে চাই। বিয়ে বড়ো না আনন্দ বড়ো?

ততক্ষণে বয় এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। প্রভাত বললে—তোমার মস্তিষ্ক যে-প্রকার উত্তেজিত হয়েছে তাতে মিছরির জল পেলে স্বাস্থ্যকর হ'ত, তা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু মাংসই নেওয়া যাক্‌ আপাতত।

ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে অশ্রু আঙুলের ডগাগুলি ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা ধরো যদি আমরা মরে' যাই?

প্রভাত। ওঃ, তুমি কী morbid।

মাংস-চিবোনো বন্ধ করে' অশ্রু বললে—সত্যিই, আনন্দদায়ক মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনি। দুঃখের সময় জীবন এসে উপহাস করে, কিন্তু আনন্দের সময় মৃত্যু করে আশীর্বাদ।

প্রভাত। দু'জনে একসঙ্গে রেষ্টুরাণ্ট কার-এ বসে' কুক্কুট খাচ্ছি—এটা এমন কি একটা আনন্দদায়ক মুহূর্ত যে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে হ'বে।

অশ্রু। তার মানেই তোমাদের তীব্র আনন্দানুভূতি নেই!

প্রভাত। এর আগে কোনোদিন বুঝি ফাউল খাওনি? ফাউলেই এত, বিফ-এ বোধহয় দশায় পড়বে। অত জোরে হেসো না, নামিয়ে দেবে। যদি একান্তই মরি এ-সময়, তবে যেন কপালে একটি জীবনী লেখক জোটে, এই প্রার্থনা করে' মরবো।

অশ্রু। কারণ?

প্রভাত। রেষ্টুরাণ্ট-কার-এ বসে' দুটি নরনারী ঝোলমাখা মুখ নিয়ে একসঙ্গে হার্ট-ফেইল ক'রে পরস্পরের মাথা ঠুকে' দিলো এ-খবরটা পেলে অনেক জীবনী-লেখকই কলম উঁচিয়ে আসবেন। রয়টারে এ-খবরটা উঁচু দামে বিক্রি হ'য়ে, সুদূর পৃথিবীতে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়বে। যাদের জীবন যত ব্যর্থ তাদের জীবনী তত জমে। সেই জন্যেই রবিঠাকুরের জীবন-স্মৃতিটা কিছুই হয়নি। জীবনী লিখতে বসে' ঘোমটা টানাকে আমি সইতে পারি না। একটা পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন চাই।

অশ্রু। তার জন্যে অতি তুচ্ছ ঘটনার বিবৃতি করতে হবে? কখন খে'লো কখন আঁচালো।

প্রভাত। না। জীবনের বড়ো বড়ো উপলব্ধির কথা বলতে হবে—বড় বড় আবিষ্কারের কথা, সেই উপলব্ধির পেছনে হয়তো নিদারুণ স্খলন আছে, মহান্ অধঃপতন! অথচ তাকে এড়িয়ে ভালো মানুষটি সেজে ধর্মভীরু জনতার বাহবা নেওয়ার মতো কাপুরুষতা আর কি আছে? খালি কবিকে জানবো মানুষকে জানবো না—সে-জানা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। জানো অশ্রু, ব্রাহ্ম-সংস্কার আমাদের এ বিষয়ে দারুণ ক্ষতি করেছে। আমরা বড়ো বেশি রকম prude, মিনমিনে, খুঁৎখুঁতে। প্রকাশব্যাপারে আমরা নিতান্তই দুর্বল, লাজুক, মুখ-

চোরা। তাই সাহিত্য আমাদের মেয়েলি থেকে যাচ্ছে—বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।

কথাটা অভ্র এড়িয়ে গেলো! দাঁত থেকে আঙুল দিয়ে মাংসের ভুক্তাবশিষ্ট অংশ বের করে' বললে—যাই বল, খুব সুখী জীবন নিয়ে ভালো জীবনী জমে না। সত্যিই, ব্যর্থতাটাই বেশি মজার! রাণী এলিজাবেথের চেয়ে জোয়ান্ অফ আর্ককে এই জন্যেই ভালো লাগে, যে, বেচারিকে পুড়ে মরতে হয়েছিল। Austerlitzএ নেপোলিয়ান্-এর যুদ্ধের খ্যাতি বহু-কীর্তিত, কিন্তু তোমার কি মনে হয় না St. Helenaতে এসেই তিনি অমর হ'লেন! তুমি বাইবেল পড়েছ?

প্রভাত। না।

অভ্র। বাইবেলে কথিত আছে Elijah এমন-কি মরেন নি পর্যন্ত, রথে করে' স্বর্গে বাহিত হ'লেন। অমন একটা সাঙ্ঘাতিক রকমের গৌরবময় জীবন নিয়ে কোনো বড়ো লেখা হ'তেই পারে না। মহাভারতে কোন্ নারী-চরিত্র তোমার ভালো লাগে?

প্রভাত। কা'দের ভালো লাগে না একধার থেকে নাম বলে' যেতে পারি: গান্ধারী, কুন্তী—

অভ্র। একটি মাত্র মেয়েকে আমার ভাল লাগে,—সে দ্রৌপদী।

প্রভাত। কারণ?

অভ্র। একজনকে ভালবেসে পাঁচজনের হ'য়ে গেলো। এমন আর একটা ব্যর্থ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তুমি সমস্ত স্বর্গ খুঁজেও পাবে না।

প্রভাত। কিন্তু সে-ব্যর্থতাবোধ দ্রৌপদীর ছিল না।

অভ্র। সেটা আরো দুঃখদায়ক।

প্রভাত। বাঃ, যেখানে বোধ নেই, সেখানে দুঃখ কোথায়? তুমি তো একবারো বোধ করছ না যে তাজমহলের তলে না জলে ভীষণ দুঃখ,

কিন্তু মমতাজকে তুলে আন্‌তে গেলেই দেখ্‌বে তাজমহলটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্‌-এর অধম হ'য়ে গেছে।

অশ্রু। কিন্তু দ্রৌপদী Polyandry নিয়ে সে-যুগে এত বড়ো একটা আধুনিক experiment কর্‌লো, কৃতকার্য হ'তে পার্‌লো না। যাকে সে অর্জন করেছিল সে-অর্জুনকে সে পাঁচজনের মধ্যে একজন ক'রে দেখতে পার্‌লো না। এটা কম ট্র্যাজিডি?

খাওয়া ফুরিয়ে গেলো, কিন্তু পরের স্টেশনের তখনো দেরি আছে। অগত্যা দুটো স্যাণ্ড্‌উইচ ও দু' পেয়ালা চা'র অর্ডার দিয়ে প্রভাত তার বুকপকেট্‌ থেকে এক কবিতা বা'র করে' বললে—তবে শোন:

দু'টি হাত জোড় করি' প্রথমে প্রণাম,
তার পরে হাত গিয়ে বাসা বাঁধে হাতের কুলায়ে
শীতল নরম,
তার পরে কথা নাই, চুপচাপ, একটু বা ঘাম,
তার পরে ঠোঁট ভাঙে অধরের পাথরের ঘায়ে—
এ-রকমি শুনেছি নিয়ম।
তার পরে? তার পরে আর কি শুনিবে?
মাথার উপর থেকে আকাশ গিয়েছে হ'য়ে চুরি।
একদম ফাঁকা!
বাতাস ফুরায়ে গেছে এক শ্বাসে, সূর্য গেছে নিবে'
তার পরে কবিতার খোলা খাতা রহে কোল জুড়ি',
তার পরে ভাষা ভুলে থাকা॥

ঢোঁক গিলে প্রভাত বললে—মানেটা বুঝতে পারছ ত?

অশ্রু। তার মানে, কি রকম হয়েছে আমার কাছ থেকে একটা মত চাও?

প্রভাত। তোমার মতকে আমি প্রাধান্য কোনো কালেই দিতে রাজি নই, বিশেষত সাহিত্যালোচনায়,—তবু যখন শোনালামই, মত জান্‌তে চাওয়াটা স্বাভাবিক।

অশ্রু। ছাই হয়েছে। প্রেমাস্পদা অন্তর্হিত হ'লে ও-রকম একটা অসহায় ভাব নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বসে' থাক্‌তে হবে—এ-দুর্বলতা ও অস্বাস্থ্য সইতে পারি না।

প্রভাত। তার মানেই, তুমি কিচ্ছু বোঝনি। কবিতাকে তোমরা হিতোপদেশ ছাড়া অন্য কিছু বলে' কবে বুঝবে? এ শুধু একটা মানস-ভঙ্গির বর্ণনা,—এটা ভালো না মন্দ এ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে বসেছে! খালি কোলাহলই করতে পার, রসগ্রাহিতা তোমাদের নেই। অস্থির হ'য়ো না, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। থিয়েটারে মেয়েদের মতো কাউকে চেঁচাতে শুনেছ? সেই জন্যে গ্রীসে থিয়েটারে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো।

অশ্রু। কবিতা-বোঝার সঙ্গে থিয়েটারে ঢোকার সম্পর্ক কি?

প্রভাত। সম্পর্ক এই, ললিতকলাচর্চায় তোমাদের দান কর্‌বার যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে কোলাহল। তোমাদের বুঝতে হবে বলে'ই সব-কিছুকে 'কথামালার' স্তরে নামিয়ে আন্‌তে চাও। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি কবিতা লিখিনি,—আমার Muse যদি খুসি হ'ন, তাই ঢের।

অশ্রু। তোমার কবিতা ভালো হয়নি, এ-কথা বলার যদি আমার স্বাধীনতা না থাকে তবে আমাকে তুমি বৃথাই পরিশ্রম করে' কবিতা শোনালে! কেন ভালো হয়নি, তার একটা যুক্তি পেলে তুমি খুসি

হও বুঝি, কিন্তু কেনই যে ভালো হয়েছে, তাই বা তুমি বোঝাতে পারবে? যতই কসরৎ কর, রবীন্দ্রনাথের সিংহাসন আর কাড়তে পাচ্ছ না। তিনি বাঙলা সাহিত্যে চিরজীবী।

প্রভাত। হোন্ তোমার রবীন্দ্রনাথ চিরজীবী, তাঁর আয়ুর অঙ্ক মহাকাল কষবে। কিন্তু তিনি চিরকাল বিরাট্ পর্বতের মতো পথ জুড়ে' বসে' থাকবেন আর আমরা সমস্বরে তাঁর সাহিত্যিক দীর্ঘায়ুতার জন্যে জয়ধ্বনি করবো, আমাদের সময় এত অপর্যাপ্ত নয়। রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার মানেই বাঙলা সাহিত্যটাকে রসাতলে পাঠানো। যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাধা হ'য়ে আছেন আমাদের বাঁচতে হ'লে তাঁকে আঘাত করতেই হবে।

অশ্রু। তুমি যে এখুনি কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লাগলে দেখ্‌ছি। যারা যতো বেশি দুর্বল যতো শ্লথপ্রাণ তাদেরই আস্ফালন বেশি। চমকের চকমকি ঠুকতে পারলেই তাদের চরম আত্মতৃপ্তি। এক লাফে সিঁড়ি ভাঙতে চায় acrobat-রা, আর্টিস্টরা নন্। রবীন্দ্রনাথকে ডিঙোনো সোজা, সমকক্ষ হওয়াই কঠিন সাধনা সাপেক্ষ।

প্রভাত। জান, কোনো স্বপ্নবিলাসীই সত্যিকারের কবি নয়— অন্তত বিংশ শতাব্দীতে নয়। খালি মলয় হাওয়া আর জ্যোৎস্নাটোজেনে খাঁটি মাটির সাহিত্য হয় না—

অশ্রু। আকাশের সাহিত্য হোক্—তা'বই বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আমরা চাই। মাটির নাম করে' আমরা পাঁকের উপাসক হ'তে চাই না।

প্রভাত। হাতে যা'র ধূলো লেগে নেই, ললাটে যার শ্রমের স্বেদবিন্দু শোভা পেল না, গায়ে যার লাগেনি দারিদ্র্যের আঘাত— তেমন কবিকে আমরা মেঘলোকে নির্বাসন দেব। মেঘ তরঙ্গ, আকাশ,

ঝটিকা—শেষ হয়েছে ; এখন চাই মাটি, প্রতি দিবসের সংগ্রাম, প্রতি দিবসের পাপ !

অশ্রু। কিন্তু প্রতি দিবসের সেই পরিচয়টাই পৃথিবীর বড়ো পরিচয় নয়। মানুষ যখন মরে তখনো তা'র চোখ অর্দ্ধ-নিমীলিত থাকে, জীবনকে দেখবার জন্যও চক্ষু আমাদের অর্দ্ধ-উন্মীলিত রাখতে হবে। চোখ দু'টো বড়ো করলেই বড়ো কোরে' দেখা হয় না। রবীন্দ্রনাথ খুব প্রকাণ্ড আর্টিস্ট বলে'ই জীবনকে এমন সত্য—রহস্যাচ্ছন্ন বলে'ই সত্য—করে' উদঘাটিত করেছেন। আর তোমরা অতি-আধুনিকরা সেই জীবনকে বীভৎস, বিকৃত, বিশ্রী করে' দেখাচ্ছ। তোমরা বিংশ শতাব্দীর ব্যাধি।

প্রভাত। তুমিও দেখছি সাধারণ riffraff-এর দলে। গত কাল যা হ'য়ে গেছে এদের পক্ষে তাই বড়ো নজির। অতীতের লাঠি দিয়ে তারা বর্তমানকে প্রহার করে। তোমাদের রবীন্দ্রনাথকেই ধর না। 'নষ্টনীড়' রচনা করে' তিনি তখনকার বাঙলা-সমাজে যে অনিষ্ট করেছেন বলে' অভিযোগ শোনা গেছল, সেই 'নষ্টনীড়'ই এখন অতি-আধুনিকদের কাছে সংযম-শিক্ষার standard হয়েছে। কে জানে দশ বছর বাদে এই অতি-আধুনিকদের অসংযমই তুলনামূলক সমালোচনায় পরবর্তী সাহিত্যিকদের কাছে মনে হ'বে বিরস, মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ নয় বলে'ই কুৎসিত। তুমি খানিক আগে জোয়ান অফ আর্কের নাম করেছিলে না ? তারই দৃষ্টান্ত নাও। ১৪৩১ খৃস্টাব্দে তাকে ঈশ্বরনিন্দার জন্য পুড়িয়ে মারা হ'ল, পঁচিশ বছর পরে সেই ডাইনি মেয়েকেই ফের গির্জা নবজীবন-দান করলে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তা'র প্রায়শ্চিত্ত হ'ল, ১৯২০ তে সে হ'ল canonized ! আজ যাকে তুমি ব্যাধি বল্‌ছ সেই এককালে হ'বে বিশল্যকরণী। নাও হ'তে পারে। তার জন্যে ভীরুর

মতো জীবনকে সম্পূর্ণ জানা ও জানানোর থেকে নিজেকে সঙ্গোপনে বঞ্চিত রাখ্‌বো—এ আর্টিস্টের ধর্ম নয়। গ্যয়টের Die Leiden des 'Jungen Werthers (উচ্চারণ ঠিক হয়নি নিশ্চয়ই) পড়ে' অনেক লোক নাকি আত্মহত্যা করেছিল। পরে গ্যয়টকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, এতগুলি মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী মনে করে' দুঃখ-বোধ কর্‌ছেন কি না। গ্যয়েট হেসে বল্‌লেন: মর্‌তে দাও ওদের—জীবনে আরো অনেক কলঙ্ক আছে, আরো অনেক কুশ্রিতা। প্রচুর, প্রচুর, এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। অতি আধুনিকের লেখা পড়ে' কেউ যদি ভ্রষ্ট হয় তবে উত্তর দেব: হ'তে দাও, এই উনিশ শতাব্দীর পাপ ও দুঃখের জন্যে অন্তত অতি-আধুনিকরা দায়ী নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে' যদি কেউ প্রেমে পড়ে' আত্মহত্যা করে তবে তোমাদের রবি-ঠাকুর কি তাঁর বইগুলি পুড়িয়ে ফেল্‌বেন? তিনিও কি বল্‌বেন না: মর্‌তে দাও ভীরুদের? কিন্তু আর না, স্টেশন এসে গেছে। এসো প্লাটফর্মে একটু হাঁটি। আজ রাত্রে আর ঘুম হচ্ছে না।

প্লাটফর্মের যেখানটায় চেঁচামেচি একটু কম সে রকম একটা জায়গা বেছে নিয়ে অশ্রু ও প্রভাত পাইচারি কর্‌তে লাগলো। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে। নতুন করে' কথা সুরু কর্‌বার মতো আবহাওয়া পেয়েই প্রভাত ব'লে চল্‌লো: অতীতে অভ্যস্ত জনসাধারণ আমাদেরকে যা'র জন্যে নিন্দে কর্‌ছে সে-ই আমাদের প্রথম গুণ আমাদের প্রধান মূলধন। আমরা সেই নিন্দনীয় গুণেরই অনুশীলন করবো—সে-ই আমাদের নিজস্বতা। আমরা নিজস্বতা বর্জন করবো না—আমরা ততোটা নির্ভীক। প্রত্যহের পৃথিবী নিয়ে public-এর কারবার, তারা অসাধারণের আবির্ভাবে উদ্ব্যস্ত হতে চায় না,—তারা আরামলোভী, যা কিছু ভূতপূর্ব তারা তাদের ভূত। ওদের কথায় আমরা কান পাতি

না—সেই আমাদের বড়ো বিজ্ঞাপন। ওরা ঝড়কেও ঢেলা মারে, বন্যার জলেও থুতু ছিটোয়। সত্যি অশ্রু, যে-আর্টিস্ট এই public-এর সঙ্গে চিরকাল মিতালি পাতিয়ে কায়ক্লেশে কলম বাঁচিয়েছে—কলমের খোঁচা মেরে এদের অস্থিব, ক্ষতবিক্ষত করে' দেয়নি—সে কখনোই বড়ো হ'তে পারেনি জেনো। যারা মাঝারি তারাই করে মীমাংসা, যারা করে মীমাংসা তারাই জেনো মাঝারি। বরং মূর্খ ভালো, মাঝারিকে সইতে পারবো না। আমাদের সঙ্গে public-এর চিরজন্মের বিরোধ—তাদের আমরা ঘাড় ধরে' নবপ্রভাতের দেশে টেনে নিয়ে যাব; যতই তারা হাত-পা ছুঁড়ুক, যেতে তাদের হবেই। তখন আবার দেখবে তারা আর সেখান থেকে অগ্রসর হ'তে চাইছে না। Public থেমে থাকতে চায়, ওরা ভীরু, সন্দিগ্ধ। আমরা এই জনতার শত্রু, জনতার মুক্তিদাতা।

খারাপ হওয়ার কথা বলছো? সন্নেসিনি দেখেও লোকের কামোদ্রেক হয় বিশ্বাস কর? কালীর চরণামৃত খেয়ে একজন কলেরা হ'য়ে অক্কা পেয়েছিলো সে-খবর রাখ? Angleo র ট্র্যাজিডির কথা জান ত'? জানো না? Isabela-র মতো পবিত্র, তাপসী মেয়েকে দেখে তার জীবনে ঘটলো পরম অধঃপতন। চৈত্রসন্ধ্যা এলেই অধরে চুম্বনস্পৃহা জাগে কেন? আমরা কী করে' খারাপ না হ'য়ে পারি? আমাদের চামড়ার নিচে যে রক্তস্রোত বইছে তা-ই আমাদের মাতাল করে' রেখেছে। যতদিন একলা ছিলাম, ভালো ছিলাম, চরিত্রবান ছিলাম। তারপর তুমি এলে।

গাড়িতে উঠে দেখা গেলো ভদ্রলোক তাঁর দিকের জানলা তিনটে তুলে দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আলো নেভানো, পাখা চলছে। হাইজিন-এর এটা কি-রকম নিয়ম ঠিক নিরূপণ করবার চেষ্টা না করে' অশ্রু আর প্রভাত এবার বেশ স্বচ্ছন্দে যথেষ্ট ঘেঁষাঘেঁষি করে'

বসতে পারলো। ফটো তুলে রঙ্ চড়ালে রাধা-কৃষ্ণের অসম্মান হ'তো না। ভাগ্যিস্ এটা শুক্লপক্ষ না; চাঁদ উঠ্‌লেই দৃশ্যটা হ'তো ফিকে, কথা-বার্তা হ'তো মাজা-ঘসা, পালিশ্-করা। প্রেমের ব্যাপারে কবিরা চাঁদকে কেন যে এত আস্কারা দিয়েছেন বলা কঠিন। অন্ধকারে কত সুবিধে।

এইখেনে অশ্রু ও প্রভাতের মুখ না এঁকে যদি ওদের দেহভঙ্গী দুটোকে নন্দলাল বসুর সূক্ষ্ম রেখায় এঁকে দেওয়া যেত, ত' ভালো হ'ত। অমন Pose-এর জন্যে কণ্টিনেণ্টের বড়ো-বড়ো আঁকিয়েরা পর্যন্ত বড়ো-বড়ো দাম নিয়ে আস্‌তেন। কথায় সেটা আঁকতে গেলে বেশি-রকম স্থূল হ'য়ে পড়্‌বে। বেশি কথা বলাও মুস্কিল। ভাষায় সব কথা খুলে বলার লোভ এমন প্রচণ্ড হয় যে সুর যায় কেটে। তবু খানিকটা বলি: ওরা পাশাপাশি বসে,' মাঝের বেঞ্চিটাতে প্রভাতের প্রসারিত পা-র ওপর অশ্রু আল্‌গোছে তা'র পা দু'টি তুলে দিয়েছে এবং কাজে-কাজেই centre of gravitation-এর স্থান-পরিবর্তন হওয়ার দরুণ অশ্রুর মাথা প্রভাতের কাঁধের ওপর পড়েছে এলিয়ে; এবং দু'জনে নেহাৎই কথা কইছে বলে' ওদের গালে গাল লাগ্‌তে পার্‌ছে না। ওটুকুন ব্যবধান না থাক্‌লেই যেন ওরা ধরা পড়ে' যাবে।

প্রভাত বল্‌ল—আচ্ছা ও-কবিতা তো তোমার ভালো লাগেনি। হস্‌টেলের কমপাউণ্ড থেকে তোমার সেই বিদায়-নেওয়া ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা লিখ্‌বো ভাব্‌ছিলাম; মাত্র চার লাইন হয়েছে। শোন:

> বক্ষের সম্মুখে আসি' যবে তুমি মাগিলে বিদায়,
> ভয়কুণ্ঠ দু'টি স্তন শিহরিল উত্তপ্ত আশ্লেষে:
> পলক পতন মাত্র সহিল না; বুঝিলাম হায়,
> চুম্বনের কালটুকু ফুরায়েছে চুম্বনের শেষে।

অশ্রু বলে' উঠলো : অশ্লীল।

বলা-র লাভ হ'লো এই অশ্রুর মাথাটা তার লোভনীয় উপাধান হারালো। প্রভাত সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো, বললে—কেন অশ্লীল? চুম্বন আর স্তন আছে বলে'? চা খাওয়া বল্‌তে পার্‌বো, চুমু খাওয়া বল্‌তে পার্‌বো না? তোমার ফুস্‌ফুস্ বল্‌তে পার্‌বো, বুকের পাঁজ্‌রা বল্‌তে পার্‌বো, স্তন বল্‌তে পার্‌বো না? লক্ষ্মণ যে সূর্পণখার স্তন কেটে ফেলেছিলো, কৃষ্ণ যে পুতনার স্তনাগ্র দংশন করে' তাকে ঠাণ্ডা করলে সেগুলো অশ্লীল?

অশ্রু দিলো হেসে, বললে—মোটেই তা'র জন্যে নয়, একটি মাত্র 'হায়' ঢুকে ব্যাপারটাকে বিশ্রী করে' তুলেছে। নইলে চলন্‌সই হয়েছে। ওখানেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত,—এর পর অগ্রসর হ'লে তোমাকে পুলিশে ধর্‌বে।

প্রভাত রীতিমত খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো : পুলিশে ধর্‌বে? অশ্লীলতার জন্যে? দুর্নীতির জন্যে? জান অশ্রু, heresy-র ভয়ে মধ্যযুগে কোনো বড়ো সাহিত্য হ'লো না, বিংশ শতাব্দীতেও কোনো বড় সাহিত্য হ'বে না এই morality-র ভয়ে। কথাটা অবিশ্যি জর্জ্জ ম্যুর্-এর।

অশ্রু। যাবই হোক, তোমরা অতি-আধুনিকরা এতো সব অশ্লীলতা লিখ্‌ছ যে রীতিমত তোমাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রভাত। কিন্তু বিচার কর্‌বে কে? এতো আর জমির চৌহদ্দি-বিচার নয়, এখেনে চাই সূক্ষ্ম রসবোধ, সূক্ষ্মতর কবিমনীষা—তোমাদের দেশের ক'টা বিচারকের তা আছে? আমেরিকা তো ভীষণ শিক্ষিত ও সভ্য দেশ, কিন্তু সেখানে *Replenishing Jessica*-র বিচারের সময় জুরিরা যে-বিদ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা শুন্‌লে তুমি হাঁ হ'য়ে যাবে। বারো জনের মধ্যে তিনজন রাতকাণা ব'লে কোনোদিন কোনো বই-ই

পড়েন নি, আটজন সমসাময়িক সাহিত্যের কোনোই খবর রাখেন না, বাকি একজন স্পষ্ট স্বীকার করলেন: বাড়িতে আমার হ'য়ে আমার স্ত্রী-ই পড়াশোনা করেন। এরাই ত করবে আমাদের বিচার? পুলিশের হাতে ভারতীয় এই বলাৎকার (কথাটা অবিশ্যি অতি-আধুনিক নয়) অসহ্য।

অশ্রু। তোমরা যে-রকম বাড়াবাড়ি করছ তাতে শঙ্কিত হবার কারণ ঘটেছে।

প্রভাত। বেশি দামের আরব্যোপন্যাস বা ব্যাসের মূল মহাভারত না হয় লোকে কিনতে পাবে না, কালিদাসের সমাস ভেঙে ভেঙে সংস্কৃত পড়বার ধৈর্য হয় ত' অনেকেরই নেই, ভারতচন্দ্র যোগাড় করা অনেকের পক্ষে দুষ্কর,—কিন্তু চার পয়সা দিয়ে খবরের কাগজে যে Legal Intelligence কিনতে পাওয়া যায় তা তুমি ঠেকাবে কি করে'? দু' পয়সার বাঙলা কাগজগুলোও ধর্ষণ-বৃত্তান্তে ঠাসা। সেখানে ত উপন্যাস নয় যে উড়িয়ে দেবে, মোটা সত্য কথা—প্রত্যক্ষ ও নিষ্ঠুর। তা পড়ে' পাঠকদের নৈতিক অবনতি হয় না? বেছে বেছে ঐ খবরগুলোর প্রাধান্য দেওয়ার কোনই উদ্দেশ্য নেই? তোমার সাহিত্যের বেলায় চরিত্র টল্‌মল্‌ করে' ওঠে। তা হ'লে law-reports অশ্লীল, বাড়িতে পারিবারিক চিকিৎসার জন্যে আনা হোমিওপ্যাথিক বই অশ্লীল, দেয়ালে টাঙানো কালীর মূর্তি অশ্লীল, নিরাকার ব্রহ্ম অশ্লীল,—কেননা কোনো অঙ্গই তাঁর নেই যে।

অশ্রু। Law-reports বা ডাক্তারি বই-র মর্ম বুঝতে হ'লে specialisation দরকার।

প্রভাত। সাহিত্যের বেলায়ই সে specialisation-এর কথা উঠবে না কেন? তুমি পদ্যমালা শেষ করে'ই পড়তে যাবে ভারতচন্দ্র,

Nursery Rhyme পড়ে'ই হুইট্‌ম্যান্‌, বড্‌লেয়ার, বায়রণ? এই আস্পর্দ্ধা তোমার আসে কেন? ছেলের হাতে Rabelais বা Boccaccio পড়তে পারে এ ভয় যতখানি, ছেলে তার দাদার Anatomyর বই খুলে genital organs-এর ছবি দেখে ফেল্‌তে পারে—এ ভয়ো কম নয়। পরিণত বয়সের চিন্তাকে শিশুর বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করে' তুল্‌বো—এ জবরদস্তি সাহিত্যের বিচারেই উঠে থাকে। ছেলেদের ত সিগারেট খাওয়া অপরাধ—সেই জন্য আমি খাবো না সিগারেট? বলে' প্রভাত একটা সিগারেট ধরালো।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রভাত বলে' চললো: তুমি হেন্‌রি ভিজেটেলির নাম শোননি। তিনি ছিলেন এক দুর্দ্ধর্ষ প্রকাশক—তেমন প্রকাশক বাঙলা দেশে ক' শতাব্দী বাদে আস্‌বে বলা যায় না। Zola-র ইংরিজি অনুবাদ তিনি ছাপিয়েছিলেন, তা ছাড়া তাঁর প্রিয় গ্রন্থকার ছিল সব অশ্লীল লেখক: Flaubert, Goncourt, Gautier, Murger, Maupassant, Paul Bourget। তাঁকে পুলিশে ধর্‌লে, তার অপরাধ এত জঘন্য বলে' বিবেচিত হ'ল যে তিনি তার পক্ষে একটা উকিল পর্যন্ত পেলেন না। সত্তর বছর বয়সে তাঁর তিন মাস জেল হ'য়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে অশ্রু, ভিজেটেলির তবু জোলার হুবহু অনুবাদ করান্‌ নি,—'an expurgated Zola outraged the sloppy Victorians!' এখন এই জোলা ইংলণ্ডেও বহুবরেণ্য! তোমার বইয়ের বাক্সে হ্যাভ্‌লক এলিসের *The Psychology of Sex*-এর দু' তিনটে ভল্যুম দেখ্‌লাম। এলিস্‌ এখন ঋষিতুল্য বলে' বিশ্বকীর্তিত, কিন্তু এই এলিস্‌কেই একদিন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হ'তে হয়েছিলো—ইংলণ্ডে বই তাঁর ছাপা হ'ল না। তেমনি দেখো একদিন অতি-আধুনিকদের অশ্লীল বই-ই স্কুলপাঠ্য হ'বে—সুইন্‌বার্ণ হয়েছে,

হুইট্‌ম্যান হয়েছে—অথচ জীবদ্দশায় এঁদের কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি।

অশ্রু। সমাজে যে-রুচি প্রচলিত আছে তাকে নষ্ট করতে এলে নিশ্চয়ই সমাজের ইষ্ট হয় না। সমাজ ওঠে ক্ষেপে।

প্রভাত। এককালে মেয়েদের সেমিজ-পরাটাও সমাজের রুচিতে বাধ্‌তো; তখন ব্লাউজের প্রচলন হয় নি বলে' উত্তমাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ আব্রু ছিলো না। সেও একটা রুচি। এখন সে-কথা স্বপ্নে ভাব্‌লে তোমরা স্বপ্নে জিভ কাট্‌বে—গরমের দিনে খালি গায়ে শুয়েও। এককালে সহমরণে যাওয়াটা খুব উচ্চাঙ্গের সতীধর্ম ছিলো; এখন সে-অনুরোধ করলে তোমারা assault-এর চার্জ্জ আন্‌বে। বরং দু'রাত্রি শোক করা সোজা, চিতেয় উঠে চিৎকার করাটা বর্বরতা। রুচির কথা বোলো না। ইংরেজ মেয়েরা দেখায় বুক, বাঙালি মেয়েরা পিঠ, আর হিন্দুস্থানি মেয়েরা পেট। সুচিরকালের জন্যে কোনো রুচিই আট্‌কে থাকে না। সব দেশেই সব সমাজেই রুচি তার চেহারা বদ্‌লাচ্ছে। জাপানে ও রাশ্যায় মেয়েরা একসঙ্গে উলঙ্গ হ'য়ে স্নান করে—শুনে তুমি নিশ্চয়ই লজ্জায় নেতিয়ে পড়্‌ছ—আমাদের কাছে এ-ফ্যাশান্‌ দস্তরমতো অশ্লীল—ইংরেজদের কাছেও। এককালে ইংলণ্ডে মেয়ে'দের স্কার্ট জুতো ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে' ধূলো না ঝাঁট দিলে আর রক্ষে ছিলো না, এখন সে-স্কার্ট হাঁটুর ওপর উঠেছে। পায়ের কোন্‌ point-এ এসে অশ্লীল বলে' থামতে হ'বে বল্‌তে পারো? তিরিশ বছর আগে ankle দেখে যে চাঞ্চল্য হ'ত এখন হাঁটু দেখে তা হয় না; ডিকেন্সের সময় যা বুক বলে' নিন্দিত হ'ত এখন তা মাত্র কাঁধ! কিন্তু, আবার শুন্‌ছি স্কার্টের নাকি অধঃপতন ঘট্‌ছে, অর্থাৎ ফের নিচে নেবে আস্‌ছে; এর যুক্তিটাও রুচিবৈষম্যের পরিচয় দেবে।

কারণ নাকি এই : অনাবরণ সৌন্দর্যকে বাধা দেয়। সৌন্দর্য আসলে হচ্ছে ইসারা, রূপে নয় রেখায়; রাসে নয় রসে; রহস্যে অর্থাৎ গোপনতায়। তাই এখন আবার সমস্ত শরীর ঢেকে ফেল্‌বার জন্যে সবাই ঝুঁকে পড়েছে দেখছি।

অশ্রু। তোমাদের মাথা খেয়েছে যতো পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। আমাদের সাত্ত্বিক দেশে তোমরা যে-সব ভাব আমদানি করছ তাতে হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। য়ুরোপের ছাড়া কাপড় পরে' তোমরা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যে সমস্যার সমাধানে কলম শানাচ্ছ সে-সব সমস্যাই ধোঁয়া, মনগড়া। য়ুরোপে যেটা জীবন-মরণের কথা, সেটা তোমাদের কাছে রঙিন ভাববিলাসিতা মাত্র।

প্রভাত। মুস্কিল এই, সাত্ত্বিক দেশের শিবের যে-পুজোর প্রথা আছে তা শুনে মিস্ মেয়োর মূর্চ্ছা হয়েছিলো। গৌহাটির কামাখ্যা আমাদের সব চেয়ে বড়ো দেবী। দরজা জানলা বন্ধ রেখে যে-হাওয়া আমরা বিষিয়ে তুলেছি তাকে আমরা মুক্ত দিয়ে পবিত্র করতে চাই। আমরা আজ ছোট শহরের ছোট গলির বাসিন্দা নই, বিরাট পৃথিবীতে আমাদের বাসা, সব মানুষের বেদনা আমাদের নিজের বেদনা। আমাদের সমাজে সমস্যা সেই, তো কোথায় আছে? পরাধীনতাই বড়ো সমস্যা; তারপরে sex। এই যে দিনের পর দিন নর-নারীর সুচির ব্যবধান চলেছে এটা কি দেশের পক্ষে খুবই শুভ; যে-দেশে নব-নারীর স্বাধীন বন্ধুভাব স্থান নেই—সে-দেশ উঠবেই ত' বিষিয়ে। পাশ্চাত্ত্যের ভাব আমদানি করছি বলে' যে অভিযোগ করছ তারো ভারি মজা আছে। বাঙ্‌লায় যেটা অশ্লীল, সংস্কৃতে সেটা নয়, ইংরিজিতে ত নয়-ই। আবার জার্মানিতে যেটা অশ্লীল নয় সেটা ইংরিজিতে জঘন্য। Dreiser-কে যখন তার *Sister Carrie*-র জন্য ধর্‌লো

(পড়নি বইটা? আমার কাছে আছে।) তখন সে বললে কি জান: আমার নাম Dreiser না হ'য়ে যদি Dreisershefsky হ'ত আর আমি যদি আমেরিকা থেকে না এসে Warsaw থেকে আসতাম তা হ'লে কপালে এই দুঃখ থাকতো না। কিন্তু তা যখন নয়, বিদায়। গ্রাম্য খাঁটি ভাষায় লিখ্‌তে গেলেই মুস্কিল, খুব পোষাকি ক'রে লেখ, মানিয়ে যাবে। ইংলণ্ডে বই-র দাম কম হ'লে অশ্লীল, বই মা'কে উৎসর্গ করলে আর অশ্লীল নয়।

অশ্রু। তুমি sexকে আমাদের দেশে খুব বড়ো সমস্যা ব'লে মনে কর?

প্রভাত। নিশ্চয়ই। ইথর্ণের মতো তাকে আমি ফুল নাই বললাম, তবে ঐ সমস্যাটার উপযুক্ত সমাধান হয়নি বলে'ই এত অস্বাস্থ্য এত চিত্ত-দারিদ্র্য। আমরা হাত বাড়িয়ে প্রতি কাজে নারীর সাহায্য পাই না, তাই কাজ আমাদের কাছে উৎসব হ'য়ে উঠেনি। এই আড়াল যদ্দিন না ঘোচে তদ্দিন sex বানান করতে গেলেই আমাদের দাঁত ভাঙবে। তাই আমাদের সাহিত্য মেয়েদের ব্রতকথার সামিল হ'য়ে উঠতে না পারলেই শিবের জটায় গঙ্গা গেলো শুকিয়ে। এমন বই লেখা চাই যা স্বচ্ছন্দে মেয়েদের পড়া-র টেব্‌লে পড়ে' থাকতে পারবে—যা বাপ-মা-ভাই-বোন্ মিলে পড়ে' কাঁদতে পারবে। কিন্তু জীবনে এমন সব ব্যাপার নিত্যই ঘটছে, অশ্রু যাতে আমরা বাপ-মাকে নিমন্ত্রণ করলেও তারা আসতে লজ্জা পাবেন। সাহিত্যের বেলায় তাদের এই অভিভাবকত্বের অর্থ কোথায়?

অশ্রু। কিন্তু সাহিত্য খালি যে যৌনসম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করবে এ-অস্বাস্থ্যও বা তুমি সমর্থন করছ কি করে'? জীবনব্যাপারে ওটাই কি summum bonum?

প্রভাত। যদি বলি তাই, তুমি আমাকে কী ভাববে জানি না। মানুষের যতো কিছু বৃহত্তর উপলব্ধি সব এই sex-এর সাহায্যেই ঘটেছে। ধরো প্রেম। প্রেম ত sex ছাড়া কিছুই নয়। তুমি ঐ শব্দ-টার একটা স্থানিক অর্থ করো না—ও একটা ধর্ম, বাঙলা ভাষায় ওকে অনুবাদ করতে গেলে বল্‌তে হয় ভালোবাসা। খালি তাই নিয়েই সাহিত্য হবে,—লেখকরা দর্জি বা ছুতোর হ'লে তেমন ফরমায়েস করা যেতো হয়তো,—কিন্তু যদি কারুর সাহিত্যে সত্যিই sex বড়ো উপাদান হ'য়ে ওঠে, তাকে যেন কৃত্রিম লজ্জা এসে অভিভূত না করে, সৃষ্টিকে সে যেন বলিষ্ঠ হ'তে দেয়। যে-লেখা গভীর উপলব্ধিপ্রসূত সে কখনোই অশ্লীল হ'তে পারে না—, তাই ভল্‌টেয়ার্ অশ্লীল নয়, হোরেস্ অশ্লীল নয়, বায়রণ অশ্লীল নয়, শেইক্‌স্‌পিয়ার অশ্লীল নয়। কিন্তু এক সময় ইংলণ্ডে শেইকস্‌পিয়ারের অশ্লীলতা সংশোধন করতে এক মহাপুরুষের উদয় হয়েছিলো—নাম তাঁর টমাস্ বৌড্‌লার, তিনি শেইকসপিয়া'কে কাটতে বস্‌লেন। কিন্তু আবার সেই মজা হ'ল, অশ্রু।

অশ্রু। কি?

প্রভাত। Victorianদের কাছে সেই bowdlerised শেইক্‌-পিয়ারই মনে হ'ল 'too frank'.

অশ্রু। আচ্ছা তুমি কি মনে কর না এই যে ঝাঁকে ঝাঁকে লালসা-লিপ্ত লেখা বেরুচ্ছে মাসিক কাগজে, তাদের বন্ধ করা উচিত?

প্রভাত। Gourmont-এর একটা কথা শোন: When morality triumphs, nasty things happen. প্রচার বন্ধ করলেই কলম বন্ধ হয় না। অশ্লীলতার বিচার যারা করবে তাদের বিদ্যে-বুদ্ধির পরিচয় তোমাকে নতুন করে' আর দিতে হ'বে না। 'কিন্তু কি কারণে বন্ধ করবে শুনি?

অশ্রু। *লেখা পড়ে' অপরিণতবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা নষ্ট হ'বে বলে'।*

প্রভাত। এটাই মজা অশ্রু, যারা এই অশ্লীলতা prosecute -করে তাদের নষ্ট হবার ভয় নেই, নষ্ট হবে তাদের স্ত্রী, তাদেব ছেলে-মেয়ে। নিজেদের এই প্রকাব নিশ্চিন্ত superiority-বোধটা অত্যন্ত কৌতুকেব কিন্তু। পবেব জন্যে তার মাথা-ব্যথা, নিজে সে নির্মুক্ত। আচ্ছা, সিনেমা দেখে ছেলে মেয়ে স্ত্রী খারাপ হয় না, রাস্তায় কুকুর দেখে, চৌরঙ্গিতে মেমদের পা দেখে? তুমি shocked হ'য়ো না অশ্রু। শাস্তি দেবে বলে' যে অশ্লীল বই তুমি কেড়ে নিলে, তোমাব সেই অশ্লীল নামাঙ্কিত কবে' দেবার দরুণই কি তা হু-হু কবে' উড়ে যাবে না? ছেলেরা ইস্কুলের ঠিকানায ভি পি করে' বই নেবে, স্ত্রীরা দেওরদের দিয়ে বাজার থেকে কিনে আনবে ডবল দাম দিযে। এইটেই সব চেয়ে মজার, সাহিত্যের শ্লীলতাব বিচাব হবে criminal law অনুসারে, সাহিত্যিক রসবোধেব নিয়মানুসাবে নয। যা সত্যিই বিশ্রী তা আপনিই যাবে শুকিয়ে, আদালতেব লাল ফিতে বেঁধে তাকে মর্যাদা দেবার কারণ কি? ছেলে-মেযেদের খাবাপ হ'বে ভেবে তোমারা যে মাথা ধরে' গেছে। ছেলে-মেয়েদের sex সম্বন্ধে train কর না কেন? বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল্ এর মতানুসাবে তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদেব সামনে ব্যায়াম করবার সময় নগ্ন হযে তাদেব মিথ্যা রহস্য সন্ধিৎসা নষ্ট করে' দিতে পারবে? যেখানে mystery সেখানেই অশ্লীলতা। ছেলে যখন বাপকে শুধোয়: এঞ্জিন কি কবে' চলে, এরোপ্লেন কি কবে' ওড়ে, বাপ তাঁর সাধ্যমত উত্তর দিতে কুণ্ঠা কবেন না। কিন্তু যখন ছেলে বলে: বাবা, আমি কী করে' হ'লাম, তখনই বাপ আম্‌তা আম্‌তা কবে' জবাব দেবেন: তুমি চাঁদ থেকে নেমে এসেছ, ঈশ্বর তোমাকে দিযে গেছেন। চাঁদ থেকে যে নেমে আসা যায় না, ঈশ্বরকে যে চোখে

দেখা যায় না এবং বাপের ঐ আমৃতা-আমতা করে' বলার জন্যেই ছেলের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়ায় রহস্যাচ্ছন্ন, বাপ দাঁড়ান মিথ্যাবাদী। ছেলের কৌতূহল বাড়ে, এবং যদি খারাপ হওয়া বল সে তখন থেকেই খারাপ হয়। সাহিত্য পড়ে' খারাপ হওয়ার ভয়, বাড়িতে গর্ভিনী আত্মীয়াবর্গকে দেখে ভয় নেই? আস্তে হেসো, ভদ্রলোক জেগে উঠ্‌তে পাবেন। ঘুমিযে আছেন বলে'ই এতো সব কথা বলা যাচ্ছে।

একবার আমেরিকায় স্কুল-মেয়েদের sex-informationএর আদি-কারণ জান্‌বার জন্যে চেষ্টা হ'য়েছিল; বেশি মেয়ে যোগ দেয়নি—মোটে ১৫৫ জন। তালিকা যা হ'য়েছিল তা দেখ।

প্রভাত পকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে' বললে,—এটা আমি টুকে রেখেছি।

অশ্রু পড়্‌তে লাগলো :

পড়ে'	৭২
কথাবার্তা করে'	১৪
মাষ্টার, নার্সদের কাছ থেকে	৬
চাকরদের থেকে	১৬
দেখে (পশুপাখি বাপ মা ছেলেপিলে)	২৬
আত্মীয় স্বজন	৮
বুড়োবুড়ির থে'কে	১৩
	মোট—১৫৫

অশ্রু বল্‌লো : তবেই দেখতে পাচ্ছ পড়ে'ই বেশি মেয়ে বকেছে।

প্রভাত হেসে বললো : কি কি পড়ে' বকেছে তারো একটা হিসাব নাও। বলে' আরেক টুক্‌রো কাগজ বার কর্‌লো।

অশ্রু পড়্লো :

বাইবেল

ডিক্সনারি

এন্সাইক্লোপিডিয়া

শেইক্স্পিয়ার্

ডিকেন্স

ডাক্তারি বই

স্পেন্সারের *Faerie Queene*

থ্যাকারে

জর্জ এলিয়েট্

স্কট্

মট্লির *Rise of the Dutch Republic*

প্রভাত। আমাদের দেশেও যদি হিসেব নেওয়া সম্ভব হ'তো তো এরি অনুরূপ মজার ব্যাপার ঘট্তো নিশ্চয়।

এন্সাইক্লোপিডিয়াতে অশ্লীলতার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তার বিচারের কোনো মানদণ্ড পাবে না। সব মিলে বই-র বিচার হ'বে, না, একটা লাইনে বা একটা মাত্র প্রাদেশিক শব্দে, তা বোঝা কঠিন। তুমি ত স্তন সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলে কিন্তু ফ্রান্সে বদ্লেয়ার স্তনের সঙ্গে প্রেয়সীর উদরের বর্ণনা করেছিলো বলে' কেলেঙ্কারির আর সীমা রইলো না। প্লেটো তো কবিতাকেই বনবাসে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর Republicএ, সেখানে "পাখী সব করে রব" এর মতো নিষ্পাপ কবিতারো স্থান হ'তো না, তিনি হোমারকে পর্যন্ত সাফ করতে চেয়েছিলেন। সায় দেবে তুমি? দেখ আমরা খুব ভালো দলে আছি—কে নেই আমাদের পক্ষে? ইউরিপিডিস্, শেইক্স্পিয়ার, শেলি—

অশ্রু। শেলি?

প্রভাত। হ্যাঁ শেলি। *Queen Mab*এ blasphemyর জন্ত অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তুমি নাম শুনে যাও: বায়রণ, মুসে, ওভিড, ভলটেয়ার, রুসো, গ্যযটে, মলিয়ার, ডষ্টয়ভস্কি—এমন কি সেণ্ট অগষ্টিন্ পর্যন্ত।

অশ্রুর খোলা চুলগুলি দু' হাতে মুঠি ভরে' ধরে' প্রভাত বললো: পৃথিবীর অনিষ্ট করবে মানুষের এই passion? এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো? সমালোচকদের মতো এই বিশ্বাসে আমরা সত্যিই আনন্দ পাই না অশ্রু, যে মানুষ সব সময়েই অবনত অধঃপতিত হ'বার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে আছে। আমরা মানুষের মহত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করি। তুমি কি মনে কর শেইক্সপিয়ার-এর *Venus and Adonais* না পড়লেই নিষ্পাপ ও নির্ম্মল থাকবে? এই পৃথিবীতে একমাত্র ঋতুসংহারই কি পুণ্যসংহার করতে বদ্ধপরিকর? এই পৃথিবীর পাপ ও লোভ, রোগ ও দারিদ্র্যের (সবগুলিই মানুষের অনিষ্টকারী) মাঝে থেকেও যারা দু'চারটে সংস্কৃত শ্লোক পড়তে ভয় পায়, sexএর নামে যাদের ধনুষ্টঙ্কার হয়—তাদের সঙ্গে কা'র তুলনা দেব? একবার কোন্ এক ফাঁসির কয়েদিকে ফাঁসি-কাঠে লটকাবে বলে' জেল থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলো। জেল থেকে ফাঁসির জায়গা কতটুকুনই বা পথ! বৃষ্টি এসে গেল হঠাৎ। কয়েদি বললে: ছাতা দাও, ভিজতে পারবো না। ছাতা মাথায় দিয়ে কয়েদি ফাঁসি-কাঠে গলা পাতলে। এরাও সব যেন তাই,—ফাঁসির কয়েদি হ'য়ে ছাতা খুলেছে! কিন্তু ঢের হয়েছে অশ্রু, আর না।

আর না মানে, আর কথা নয়—এইবার একটু বিশ্রাম করা যাক্। ঘুম অবশ্যি খুব পাচ্ছে না, তবু দেহটাকে একটু প্রসারিত করতে পারলে আয়েস হ'ত। এই ভেবে প্রভাত মাথাটা একটু হেলিয়ে দিতেই অশ্রুর

বুকের কুলায়ে আশ্রয় পেলো। গাড়ি পুরো দমে চলেছে,—অন্ধকার ক্রমেই আবছা হ'য়ে আস্‌ছে। ভদ্রলোক আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরলেন; অশ্রু চঞ্চল হ'য়ে উঠতে চাইছিলো, কিন্তু বুকের ভার রইলো অটল হ'য়ে। এমনি উদাসীন হ'য়ে আধ-শোয়া অবস্থাটা মন্দ নয়। গেলো অনেকক্ষণ কেটে। নৈহাটি ছেড়েছে। প্রভাত উঠে' বস্‌লো, কিন্তু বায়রণের কবিতার দু'টো লাইন্ বল্‌বার জন্যে। ঐ লাইন্-দু'টো বলবার প্রয়োজন হ'ত না যদি না অশ্রু (বোকার মতো) বলে' উঠত : কী গরম!

অতএব প্রভাত ভেবে দেখ্‌লো লাইন দু'টো বলা দরকার :

"What men call gallantry and the gods adultery,
Is far more common where the climate's sultry."

বলে' দু'হাত দিয়ে খুব বড়ো একটা গোলাপফুলের মতো অশ্রুর মুখ একেবারে নিজের মুখের কাছে তুলে আন্‌লে। হলিউডে হ'লে এখানে খুব এটা চমৎকার close-up হ'ত সন্দেহ নেই।

আগে থেকেই চিঠি দেওয়া ছিলো। সব ঠিক-ঠাক্। অশ্রুকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে প্রভাত হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে বাস্ নিলে। বাড়ি এসে গেল পনেরো মিনিটে। ওদের গলিতে পা দিয়ে দেখ্‌লো কিছুই বদ্‌লায় নি। আশ্চর্য্য। বাঁকে বসে' তেমনি উড়ে দোকানিটা ফুলুরি ভাজ্‌ছে, ফিরিওলা তপ্‌সে-মাছ হেঁকে যাচ্ছে, রাস্তার ওপরে কর্পোরেশানের একটা নো-বোর্ড লাগানো, দূরে একটা ষোলার দাঁড়িয়ে। এই ওর পরিচিত পৃথিবী! আশ্চর্য্য! বাড়ি ঢুকে নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাবে মা ছাতে ঘুঁটে দিচ্ছেন, নাটু গালের ওপরে মাছি তাক করছে। ওর বাড়িটা তেমনি বিবর্ণ বিমর্ষ হ'য়েই আছে। বাড়িটা মেঘলোকে প্রমোশান পায় নি।

নাটু বারান্দায় বসে' মহাশূন্যকে মুখ ভেঙ্‌চাচ্ছে; পাছে দাদার পায়ের শব্দ চিনে আনন্দে চিৎকার ক'রে ওঠে সেই ভয়ে প্রভাত অতি নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকলো। সারা রাত্রির অনিদ্রা—শরীর পড়্‌ছে ভেঙে; তবু জুতো-জামা না খুলেই ভাঙা চেয়ারটায় বসে' পড়ে' পা ছড়িয়ে দিলো। নাটু এখন তার মাথার চুলগুলো টেনে-টেনে দেখছে দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে ধরা যায় কি না।

এখুনি মা এসে পড়্‌বেন—অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়। মা এসে গেলেই ফুরিয়ে গেল! স্নান করতে যা, পোস্তর বড়া হয়েছে গরম-গরম, চল্ আফিসে, জুতো দুটো বুরুশ্ করে' নে—যা ধুলো জমেছে! মাথার চুলগুড়ি কবে কাটবি? কেমন লাগ্‌ল জলপাইগুড়ি? কি বল্‌লে অশ্রু? বাপ্ জায়গা দিয়েছে?

খেয়ে-দেয়ে পেটের বাঁ দিকে একটা বেদনা নিয়ে ছুটে ওর বাস্ ধরতে হ'বে—দাঁড়িয়েই যেতে হ'বে, আফিস-টাইমে জায়গা নেই বস্‌বার। আফিসে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতেই সামনে ওর সেই নাক্-চ্যাপ্টা ভবানীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে—দেশলাইর কাঠি বার করে' অনবরত দাঁত খোঁচাচ্ছেন। কে একজন নাকি পিন্ দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে মরে' গেছল। আচ্ছা, জাপানে না কি চুমু খাওয়া বারণ হ'য়ে গেছে, কারণ প্রতি চুমুতে নাকি হাজারে-হাজারে বীজাণু ঠোঁঠের খেয়া পারাপার করে। অশ্রুর যদি টি. বি থাকে? বাঙলা দেশে এত লোক টি. বি. তে মরে অথচ একটা স্যানটোরিযাম্ নেই। শেষকালে ন্যুট হাম্‌সুন্ পর্যন্ত টমাস্-মান্-এর দেখাদেখি স্যানাটোরিয়াম্ নিয়ে বই লিখলে: *Chapter the Last*। বাঙ্‌লা দেশে একটা থাকলে আরো কি গল্প লেখবার খোরাক জুটতো। আচ্ছা, টি. বি-টা খুব কাব্যির ব্যারাম, তাই সব লেখকই রক্তামাশয বা বেরিবেরি ছেড়ে টি. বি.-র রক্তরাগে রুমাল রাঙিয়েছেন। প্রেয়সীদের বেরিবেরি হ'য়ে পা ফুল্‌লে আর রক্ষে ছিলো না, কোনো প্রিয়াব গলগণ্ড হয়েছে বলে' শোনা যায়নি। পৃথিবীতে কী রোগ নেই? যদি কেউ এসে বলে: একটা লোকের বাঁ কানটা ডান কানের জায়গায় এসে উল্টে' বসেছে—প্রভাত তা-ও বিশ্বাস করবে। মানুষের এইটুকুন শরীরে ছ শ' ছাপ্পান্নটা ব্যাধি। তবু তাকে চোখ লাল করে' তম্বি করা হ'ল কি না—ভালো হও। শরীরে রক্ত দিয়ে বললে কি না—সচ্চরিত্র হও; মহুয়ার ক্ষেত তৈরি করে' বলা হ'ল—ওখান দিয়ে হেঁটো না, গড়িয়ে পড়বে। মহুয়া নামটি বেশ। বধূকে পাবার আগের ডাক-নাম, পেলে পরে তার নাম হওয়া উচিত দ্রাক্ষা। একবার কে এক মাষ্টার দ্রাক্ষার মানে করেছিলো কিসমিস। 'বক্ষে দ্রাক্ষা গুচ্ছে গুচ্ছে'—এমন একটা

লাইনের টুক্‌রো এতদিনে বাঙ্‌লা কবিতায় পাওয়া গেলো। বাঙ্‌লা কবিতা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে—মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেছে। ঘরের দিকে এসে পড়লেন বুঝি। ও এতক্ষণ অশ্রুকে না ভেবে বেরিবেরি নিয়ে রিসার্চ করছিলো। সত্যি, অশ্রুকে এত কাছে পেয়ে এসেছে অথচ ওকে ভাবা যাচ্ছে না। আকাশ-ভরা রোদের দিকে চেয়ে জ্যোৎস্নার কথা ভাবা মুস্কিল। অশ্রুর চোখ ভাবতে গিয়ে ভুরু মনে পড়ে, ভুরুর দীর্ঘতা অনুসরণ করতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ ঠোঁট দু'টি এসে আব্‌দার জানায়। এতো নিবিড় করে' অশ্রুকে স্পর্শ করা হোল অথচ ওর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়নি! সিংহের সৌন্দর্য যেমন কেশরে, নারীর সৌন্দর্য তেমন নথাঙ্কুরে! প্যারিস্ যে হেলেন্‌কে চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিলো তা শুধু হেলেনের আঙুলে প্রলুব্ধ হ'য়ে। রামের চেয়ে মেনিলিউস্ কত উদার—সীতাকে অগ্নিপ্রবেশ করতে হয়েছিলো, হেলেন্ একেবারে স্বামীর বাহুপ্রবেশ করলে। একেই বলে গ্রীক। আচ্ছা, টেলিমেকাস্-এর সঙ্গে হেলেনের সেটা কি সত্যি? টেলিমেকাস্‌টা ভারি ভীরু—আমাদের লক্ষ্মণ-টাইপের। লক্ষ্মণটা চোদ্দ বছর সীতার পা-ই দেখ্‌লে—এতো বড় গুজ্‌বুক বাল্মিকী ছাড়া কেউ কল্পনা করতে পারতো না। আচ্ছা, বাল্মিকী হ'লে ট্রেনের সেই ভদ্রলোককে সেই ব্যাধের মত অভিশাপ দিতেন? সেই ভদ্রলোক কেমন ঠেসে ঘুমুলে! ভুঁড়িটি কি অটুট! অশ্রুকে অত সব বক্তৃতা না দিয়ে কোলের ওপর ছোট খুকিটির মতো ঘুম পাড়িয়ে দিলেই ত' হ'ত ভালো। চোখের পাতায় চুমু খাওয়াটা এলিজাবেথান্ যুগে একটা ফ্যাশান্ ছিলো, ভালবাসারো ফ্যাশান্ বদ্‌লায়। passion-এর জন্যেই passion, যেমন আর্টের জন্যেই আর্ট—এ নিয়ম উঠে গেল কেন? Paolo ও Francesca-র

ভালোবাসো শুন্‌তে ভালো—নরকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয় নি, কিন্তু তেমন ভালোবাসা বিংশ শতাব্দীতে সইবে না—Paolo, Francesca-র কি-রকম আত্মীয় ছিলো, বিয়ে হ'তে পারতো না—তবু তাদের মিলন হ'ল। আচ্ছা, অর্জ্জুন তো তার মামাতো বোন্ সুভদ্রাকে পরম আরামে বিয়ে করলে। মান্দ্রাজে কোনো কোনো জাতে নির্বিবাদে ভাগ্নিকে বিয়ে করা চলে। বড়ো সব মজার আইন,—মনুর মতে বাপের ও মার দুই দিকেই সাত ঘর বারণ, পৈথিনসির মতে বাপের দিকে পাঁচ ঘর ও মার দিকে তিন। বাঙালি ব্রাহ্মণরা তাই নিষ্ঠা সহকারে পালন করছেন,—মনু এখানে অমান্য। আবার বেদ কী বলে শোন। বেদের মতে পিসির মেয়ে আর মামার ছেলেতে পরম বন্ধুতার সুযোগ আছে এবং উল্টোউল্টি। মান্দ্রাজিরা চালাক্—এই নিয়মটা লুফে নিয়েছে। অন্তঃপুরে cousinদের মধ্যেই যে প্রেম ভালো জমে এ-কথা অস্বীকার করা আর বেদকে ভ্রান্ত বলা সমান মিথ্যা। বাইরে আব্রু, ভেতরে মিল—এমন একটা মধুর সম্পর্কের ক্ষেত্র আছে বলে'ই বাঙালির অন্তঃপুর বলতে আজো আমাদের মন আনচান করে' ওঠে। আচ্ছা, এমন যদি হয় (হ'লেই হ'ল) অশ্রু ওর বোন—মামাতো মাসতুতো নয়—একেবারে সহোদরা! ধরা যাক্, শিশুকালে অশ্রু যায় মরে'—শ্মশানে নিয়ে যায়, খুব বৃষ্টি নামে, শব ফেলে সব শ্মশান-বন্ধুরা আশ্রয় খোঁজে, বৃষ্টি থাম্‌লে এসে দেখে শব অন্তর্দ্ধান করেছে। এবং সেই শব যদি আজ (ধরা যাক্) কুড়ি-বছর পরে বোন বলে' সার্টি-ফিকেট দেখায়—তবে? সত্যি, উগ্র ও উন্মুখ অধরোষ্ঠের কাছে অশ্রুর আত্মদানে মহত্ব আছে। অশ্রুর গলা ঠিক শঙ্খের মতো। এবার কাছে পেলে ও ভালো করে' অশ্রুকে দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেহের মতো সৌধ আর আছে কী? পৃথিবীতে কিছুই

সম্পূর্ণ করে' দেখা হয় না। মানচিত্রে ওপোর্টো বলে' যে-জায়গা আছে এ-জন্মে তার মাটি ও মাড়িয়ে আসতে পারবে না। এই সময়ে লণ্ডনে গ্রীন পার্কে যে মেয়েটি বেড়াচ্ছে (একটি না একটি মেয়ে নিশ্চয়ই সে-পার্কে এখন আছে) তার সঙ্গে আলাপ করা হবে না। সত্যি, কত অল্প আয়ু,—কী ভীষণ! এতো আশা অপূর্ণ থেকে যাবে—এতো সব স্পর্শাতীত হ'যে রইলো! হাত বাড়িয়ে আকাশকে পাওয়া যায় না বলে'ই নাকি আকাশ সুন্দর! পেতে পারে না ব'লেই মানুষ ছোট। ছোটখাটো জীবন—ছোটখাটো সংসার—মন্দ কি? ছোট একটি বিছানা—দু'টি করে' ছোট ছোট হাত পা—একটি শিশু! যদি শুধোয় কোত্থেকে এলাম—প্রভাত তার ঠিক উত্তর দেবে—অক্ষরে অক্ষরে। অশ্রুকে লজ্জিত হ'তে দেবে না।

দুপুরে একটা কাণ্ড ঘটে' গেলো। খাওয়ার পর খানিকক্ষণ পাইচারি করা অশ্রুর অভ্যেস্। এবং আজকে ইস্কুল বলে', কোনো উপদ্রব নেই বলে' দুপুরে নিশ্চয়ই একটু ঘুমুনো যাবে। বেশ পরিষ্কার তক্‌তকে বিছানা—অচেনা বিছানায় চট্ করে' ঘুম আস্‌বে না বলে' অশ্রু একটা দৈনিক কাগজ যোগাড় করেছে। এই শেষ বিজ্ঞাপনটা পড়া হ'লেই কাগজটা বাতাহত কদলী-পত্রবৎ ভূপতিত হ'বার আয়োজন করবে এমন সময় দোর গোড়ায় জুতোর শব্দ হ'ল। অশ্রুর জিহ্বা এমন অসাবধান যে চুল্‌কে উঠলো: এসেছ ? যেন আফিস্ পালিয়ে এলেই প্রভাতের চতুর্বর্গ ফললাভ হ'বে! কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জুতোর অধিকারীটি নিশ্চয়ই প্রভাত নয়—অশ্রুর সেজকাকা।

অশ্রু বিছানার ওপর উঠে বসে' দু'হাত পেছনে তুলে একরাজ্যের চুল নিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো। সেজকাকা সোজা চেয়ার টেনে বসে' পড়লেন, সার্চ করতে এসে পুলিসের কর্তার বোধকরি এম্‌নি মনোভাব হয়; অপারেশান্-এর আগের মুহূর্তের রুগীর মতো অশ্রু সহসা নার্ভাস হ'য়ে পড়লো। তবু তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে খাট থেকে নিচু হ'য়ে সেজকাকাকে প্রণাম করবার জন্য হাত বাড়ালো, কোঁচা দিয়ে সেজকাকা জুতো রাখলেন ঢেকে। বোঝা গেল প্রণাম তিনি নেবেন না।

কিন্তু কথা আরম্ভ হওয়া দরকার। সেজকাকাই গলা শাঁখ্‌রে নিলেন, বললেন,—কার সঙ্গে এলি ?

অশ্রু তখন খাটের একেবারে ধারটাতে বসে' হাঁটুদুটোকে একটা acute angle বাঁকিয়ে পা-দুটোকে দিয়েছে খাটের তলায় চালিয়ে! দুই চোখে বুদ্ধি ও প্রতিভা যেন চক্‌চক্ করছে,—ললাটে প্রতিভার দীপ্তি। হাত দু'টি যে টান্ করে' রেখেছে বিছানার ওপর তাতে পর্যন্ত

যেন নিঃশঙ্কতার একটা ভাব আছে। হাঁটু দুটো একটু দুলিয়ে ও ওর ক্ষণেকের স্নায়বিক দৌর্বল্যকে ধমক দিলে। বললে—জলপাইগুড়ি থেকে এক ট্রেনে একলা চলে' আসার মধ্যে অঙ্কেরো বীরত্ব নেই! তবে সৌভাগ্যবশত একলা ছিলাম না, সঙ্গে সাথী ছিলো।

সেজকাকার এত রাগ হ'ল যে পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খুলে ফেলতে হ'ল। বললেন—কে সে লোক?

অশ্রু অক্ষরগুলো স্পষ্ট করে' উচ্চারণ করলো: শ্রীপ্রভাতমোহন—

সেজকাকার মুখের যা একখানা ছাঁচ করলেন ষ্টাডি-হিসেবে যে কোনো মিউজিয়মে স্থান পেতে পারে: ঐ হতচ্ছাড়া বিশ্ববয়াটে ছোঁড়াটা—ঐ চরিত্রহীন—

অশ্রু রীতিমত কৌতুক বোধ করলো। প্রভাতের নাম মাহাত্ম্য এমন প্রবল ভাবে হিংসেও হ'ল একটু। হাসির ভুরভুরি চেপে একটা কিছু বলা দরকার, তাই: চক্ষু না থাকলে তাকে অনায়াসে চক্ষুহীন বলা যায়, কিন্তু চরিত্র বস্তুটি যে কোথায় আছে, বা কোথায় নেই occultistরা পর্যন্ত সন্ধান পান্ না।

এর উত্তর কি হ'তে পারে সেজকাকাকে তা ভাবতে দিয়ে ইতিমধ্যে আমরা তাঁর দেহবর্ণনাটা সেরে নি। এটা অবশ্য খুব জরুরি নয়, তবু সেজকাকাকে আমাদের মনে ধরেছে। সব চেয়ে যেটা প্রখররূপে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক তা হচ্ছে সেজকাকার নুয়ে পড়া নাক, অনেকটা ধনেশ পাখির ঠোঁটের মতো—এবং সেই নাকের ওপর একটি মটর দানার মত ছোট আঁচিল। দেখ্‌লেই কড়ে' আঙুলের টোকা মেরে ফেলে দেবার পরখ্ করতে ইচ্ছা করে—আঁচিলটা এমনি আল্‌তো হ'য়ে বসেছে। এটুকুন্‌ই যদি সে মুখের বিশেষত্ব হ'ত—তা হ'লে বোঝা যেতো সেজকাকা মাত্র পিউরিটান, কিন্তু সেই উদ্যতখড়্গের মতো

নাসিকার তলদেশে একটি স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট গুম্ফ বিরাজ করছে, শুধু বিরাজ করছে না, সম্মার্জনীর মতো একটা মার্জনাহীন রুক্ষতা নিয়ে সর্বদাই মারমুখো হ'য়ে আছে। গোঁফের প্রত্যন্ত প্রদেশ-দুটো আগে ঠোঁটের সমান্তরাল করে' ছাঁটা ছিল, কিন্তু একদিন অবাধ্য ক্ষুর গল্পের সেই আদর্শ বিচারক বাঁদরের মত সমান করে' গোঁফের চৌহদ্দি ভাগ করতে গিয়ে গুম্ফটিকে একেবারে নাসারন্ধ্রের তলায় ঠেলে এনে তার দাবোযানি দিয়েছে। এবং তাতেই চেহারার আরেকটি বিশেষণ বেড়েছে: পরনিন্দুক।

অশ্রুর কথার উত্তরে সেজকাকা কিছুই ভাবতে পারলেন না। অতএব প্রশ্ন পাল্‌টানো আবশ্যকীয় হ'য়ে উঠলো। বললেন—বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে উঠেছিস্ যে?

মিহি করে' হেসে অশ্রু বললে—বাড়ির দরজা ত' তোমরাই বন্ধ করে' দিয়েছ। আমাকে তোমরা যে অপমান করেছো একমাত্র মেয়ে হয়েছি বলে'ই আমাকে তা পিঠ পেতে সইতে হবে এতো বড় অমানুষ হ'য়ে তোমাদের বংশে আমি জন্মাইনি, সেজকাকা।

হেসে কথাটা বল্‌লে বলে' কথাটা সেন্টিমেণ্টাল্ হ'ল না। সেজকাকা তাঁর গুম্ফবিন্দুটি উন্নত করে' (ঘৃণার পরিচায়ক) বললেন—তুমি যথেচ্ছাচারী হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমরা অভিভাবক হয়ে তাই দেখে নির্লিপ্তের মতো হাই তুল্‌বো আমাদের কি এত বড়ো অমানুষ হ'তে উপদেশ দাও নাকি?

বোঝা গেলো সেজকাকা চট্‌ছেন, সম্বোধনের ভাষা তাঁর মধ্যমপুরুষে পদস্থ হয়েছে। অশ্রু বিনীত স্বরেই বললে—ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগের জন্যে কতগুলো কথার অপপ্রয়োগ ঘট্‌ছে, নইলে যথেচ্ছাচারী কথাটা

শুনতে যতো খারাপ তার সত্যিকারের অর্থটা তত ন্যক্কারজনক নয়। নিজে যা ভাল বলে' বুঝবো অকুণ্ঠচিত্তে তাই পালন করবো,—এর মতো চরিত্রগর্ব আর কি আছে? পরেচ্ছাচারজনিত অপমান আর আত্মহত্যা সমান জিনিস।

সেজকাকার এবার দাঁত দেখা গেল, পান-খাওয়া পোকা কাটা দাঁত, অর্থাৎ—খেলো কথ্য ভাষায় বলতে গেলে—সেজকাকা দাঁত খিঁচোলেন: তাই বিয়ের সভা থেকে পালিয়ে যাওয়াকে তুমি চরিত্র-গর্বের নমুনা বলে' আত্মতৃপ্তি লাভ করছো?

ঘাড়ের ওপর খোঁপাটাকে জুৎ করে' বসিয়ে অশ্রু শাদা থরথরে গলায় বল্‌ল—সে তিন বছরের কথা। কেন পালিয়ে এসেছিলাম তার অর্থটা এখন অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে বটে, কিন্তু মিথ্যা হয় নি। যদি তুমি শুনতে চাও ত বলি।

গুম্ফবিন্দুকে সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ করে' সেজকাকা বললেন—শুনি।

অশ্রু ডান হাটুর ওপর অতি ধীরে বা calfটি স্থাপন করলো, বিছানায় আধখানা কাৎ হ'তে পারলে অতীত দিনের গল্প বলায় যে সহজ একটা সুখ আছে তা সম্পূর্ণ করে' সম্ভোগ করা যেতো, কিন্তু সেজকাকা নেহাৎই সেজকাকা। পায়ের ওপর পা তোলাটি পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না। অশ্রু বল্‌ল—বিয়েতে সম্মত হওয়াটাই প্রথমত আমার ভুল হয়েছিলো, শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালি মেয়ের মতো আমিও যাচাই করে' দেখ্‌লাম না—বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত আছি কি না। নানান্ পারি-বারিক ঘটনা-আবর্তে পড়ে' আমিও একটা খড় ধরতে ছুটেছিলাম। কিন্তু ভুল আমার ভাঙ্‌ল,—ঠিক বিয়ের লগ্ন এসে পৌঁছুতেই। ভুল যদি ভাঙ্‌লই, ভাঙুক, তার সময়টা ঠিক পাঁজির সঙ্গে মিল রাখছে কি না সে-দেখবার সময় আর ছিলো না। পালালাম। কেন বিয়ে করছি,

কাকে বিয়ে করছি এই প্রশ্নগুলো এমন গোলমাল বাধিয়ে তুললো যে বিয়ের বাঁশি আমার কানেই ঢুকলো না।

সেজকাকা। বিয়েটা ভুল হচ্ছিল কিসে? এমন সুযোগ্য পাত্র।

অশ্রু। সেখানেই লাগলো খট্‌কা—ঠিক সুযোগ্য কি না। তা ছাড়া পাত্র সুযোগ্য হ'লেই মিলনটা সুভোগ্য হবে কি না—

সেজকাকা ধমকে উঠলেন: তার মানে?

অশ্রু। ঐ তো মুস্কিল, তুমি সেজকাকা হ'য়ে বসে' থাকলে খোলা-খুলি কিছুই বলা যাবে না। সম্পর্কের মিথ্যা সৌজন্যের খোলস না খসাতে পারলে পদে পদে আমার বাধবে। Confession করতে গিয়ে যদি দেখি যে পুরোত ধমকাচ্ছেন তা হ'লে পুরোতেরো ধর্মচ্যুতি ঘটে। ডাক্তারের কাছে রোগের হিষ্ট্রি বলতে রুগীর লজ্জা করলে চলে না, উকিলের কাছে মক্কেল যদি মিথ্যাবাদী হয় তা হ'লে মোকদ্দমা যায় ফেঁসে। তোমার অভিভাবকত্বের সিংহাসন ছেড়ে তুমি যদি আমার সঙ্গে সমতল জায়গায় এসে না দাঁড়াও, তা হ'লে আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা।

চেয়ারে সামান্য স্থান পরিবর্তনপূর্বক দেহভার পুনঃস্থাপন করে' সেজকাকা বললেন—আচ্ছা।

অশ্রু বাঁ পায়ের পাতাটি সামান্য একটু দুলিয়ে-দুলিয়ে বলে চললো: শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালি মেয়ের মতো দূরদর্শিতাহীন অন্ধ আত্ম-দানের লজ্জা আমার সইলো না, আমি ঐ বাকি একজন। আমি অসাধারণ। বাঁ হাতে ত্যাগ করবার স্বাধীনতা না রেখে দক্ষিণ হস্তে আমি গ্রহণ করতে রাজি নই। আমি বারে বারে গ্রহণ করবো, বারে বারে আমার যাত্রার প্রতিবন্ধককে উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবো। সেই পণ করে'ই সেদিন বেরিয়েছিলাম।

সেজকাকা। তাই আমাদের সবাইব মুখে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে তুমি এমন একটা অনাচার কর্‌লে!

অশ্রু। কণ্ঠের হাড়ে যদি থাইসিসের পোকা পাওয়া যায়, তবে সে-হাড় উপড়েই ফেলা উচিত, কণ্ঠাভরণ শোভা পাবে না ভেবে সেই পচা হাড় পুষে' রাখা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তোমাদের কলঙ্কের কালির ভয়ে আমার জঘন্য আত্মবলিটা নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে যতই কীর্ত্তিত হ'ত না কেন, আমার পক্ষে সেটা হ'ত পরম অসতীত্ব। (এখানে সেজকাকা একটা মুখভঙ্গী কর্‌লেন) একটা ভুল যদি করে'ই থাকি তা সংশোধন কর্‌বার স্বাধীনতা আমার থাক্‌বে না—সমাজের এই জুলুম আমি মান্‌বো না। একটা গোটা মানুষের চেয়ে তোমাদের দশ জনের আরামের সমাজ নিশ্চয়ই বড়ো নয়। তা ছাড়া—

সেজকাকা দু'পাটি দাঁত দৃঢ়বদ্ধ করে' কীটকৃত দন্তরন্ধ্র দিয়ে আওয়াজ কর্‌লেন: তা ছাড়া?

অশ্রু। তা ছাড়া আমার এই বিয়ের পেছনে একজনের বেদনা ছিলো। তখন মন ছিলো কাঁচা, আমার মিলনোৎসবে কোনো উপবাসী আত্মা পিপাসার্ত্ত চাতকের মতো চেয়ে আছে এ ভাবতে আমার হৃদয় কেঁদে উঠ্‌লো। সে-দিনের কথা বল্‌ছি, নইলে সেই মিলন যদি আমার সত্যি হ'ত তা হ'লে অন্যের অনাহূত অশ্রুবর্ষণকে আমি গ্রাহ্য কর্‌তাম না। সে মিলন শালগ্রাম পাথরের মতোই মিথ্যা বলে' আমি বেরুলাম, এবং যেখানে এসে প্রথম বিশ্রাম নিলাম সে হচ্ছে প্রভাতের বাড়ি।

সেজকাকা। যে ছেলে এমন করে' কাঁদলে তাকে বরণ কর্‌লেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো।

অশ্রু। ওর কান্না মোছাতে গিয়ে আমাকে হ'তো কাঁদ্‌তে,—ল্যাঠা চুক্‌তো না। তা ছাড়া কাঁদ্‌তে পারাটাই ভালোবাসার পরম মূল্য নয়।

সে-পরীক্ষাই আমার, সে-অনুসন্ধান। তোমাব সঙ্গে এ-সব বিষয় নিয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা করায় অসুবিধা আছে। তুমি যে আমার সেজকাকা এ-কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছো না।

সেজকাকা জোর দিয়ে উঠলেন: নিশ্চয়ই না। ছেলে হ'লে বেত নিয়ে আস্তাম, একান্ত মেয়ে হয়েছিস বলে'ই—

অশ্রু গম্ভীর হ'যে বললে: তাই শুধু ধম্‌কে অভিভাবকত্বের মাইনে নিতে এসেছ?

ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে' সেজকাকা বললেন—তাই পুরুষ দেখে বেড়ানোই তোমার পরমার্থ? এই তোমার পরীক্ষা!

অশ্রু কঠিন হ'য়ে বললে—Don't be vulgar. (হঠাৎ ওর যেন জয়েস-এর কথা মনে পড়লো। সব অশ্লীলতাই ষ্টাইলে, ব্যবহারে। *Per se* কোনো জিনিসই অশ্লীল নয়। ঐ কথাটাই যদি সেজকাকা এ-রকম ক'রে বল্‌তেন: নব নব জীবনের স্পর্শ ও স্বাদ পাবার জন্যে—তা হ'লে ভাষাটা রবীন্দ্রনাথেরো অযোগ্য হ'ত না।)

সেজকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে' বললেন—তা হ'লে যাচ্ছিস না তুই বাড়ি?

অশ্রুও উঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে খোঁপাও গেলো ধুপ্‌ করে' ভেঙে। এবার অশ্রু আর খোঁপা মেরামত করতে বস্‌লো না। দীর্ঘ, ঘন চুল—ঠিক এমিলিয়া ভিভিয়ানির চুলের মতো। সর্বাঙ্গে ওর greek contour (contourএর বাঙ্‌লা করা যাক দেহবঙ্কিমা)

অশ্রু বললে—এর পরেও তুমি যেতে বল? তোমাদের কলঙ্কভাজন হ'য়ে।

সেজকাকা। কিন্তু তোমার নামে চতুর্দিকে তো ঢি ঢি পড়ে' গেছে। জলপাইগুড়িতে তো কম কেলেঙ্কারি কর নি।

অশ্রু। জীবনের অভিধানে ও শব্দটার বিভিন্ন অর্থ, সেজকাকা। সে-জন্যে আমি মাথা ঘামাই না, তোমরাও না ঘামালে ঘুমুতে পারবে। যে পঞ্চসতীর নাম ক'রে তোমাদের মহাপাতক নাশ হয়, আমিও না-হয় তাদের দলভুক্ত হ'লাম। ক্ষতি কি ?

ইদানি বেলাগুলো আচমকা পড়ে' আসে; আকাশকে রোগী ভাবলে ভাবা যেতে পারে ও হার্ট-ফেইল্ করলে। এমনি সময় ব্যাপারটা ঘোরালো হ'য়ে উঠলো প্রভাতের আবির্ভাবে—আকস্মিক ও প্রত্যাশিত। সেজকাকা বলে' উঠলেন : এই যে।

এবং কালবিলম্ব না করে' প্রভাতের একটা হাত ধরে' তাকে বাইরে বারান্দায় টেনে আনলেন। ব্যাপারটা বেশ নাটকীয়, নাই বা হ'ল ভদ্রতাসঙ্গত—আমাদের রঙ্গরঙ্গমঞ্চে অনায়াসে চলতে পারে। ওরা বেরিয়ে গেলে অশ্রু খোঁপা বাঁধতে বস্‌লো।

বারান্দায় দু'টো চেয়ারে দু'জনে বস্‌লো। স্বর নিচু ক'রে নাকের আঁচিলটি একটু চুলকে সেজকাকা বললেন—আপনি ত অশ্রুকে ভালোবাসেন, না ?

প্রভাত ঘাব্‌ড়ে গেলো; তার চেয়ে, আকাশে ক'টা তারা আছে জিগ্‌গেস্ করলে একটা আন্দাজি উত্তর দেওয়া সহজ হ'তো। উত্তরের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে প্রশ্নকর্তারই হ'তো মুস্কিল। এমন একটা প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিজ্ঞানই ভয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে নি। যা-ই উত্তর দাও, সম্পূর্ণ হ'বে না। যদি বল, হ্যাঁ, সন্দেহ ঘুচবে না; যদি বল, না; ঘুচ্‌বে না ভয়।

প্রভাত বল্‌লো এখনো বুঝতে পারিনি।

সেজকাকা ভাবলেন এই বিনয়ই চরিত্রহীনতা। তবু অসন্তোষ দমন করে বললেন—অশ্রুকে বিয়ে করুন না কেন! আপদ যায় চুকে'।

এর উত্তর হ'ল কাটখোট্টা। প্রভাত ঠাট্টার সুরে বললো—মোটে মাইনে পাই পঁয়ষট্টি টাকা, ঐ টাকার মাইনেতে কিছুই চলে না মশাই।

সেজকাকা একেবারে হাওড়া ব্রিজ্ থেকে গঙ্গায় পড়লেন; কিন্তু ডাঙা পেতে দেরি হ'ল না। ডাঙা যখন পেলেন চোখ তাঁর রাগে ও অপমানে রাঙা হ'য়ে উঠেছে। সাম্‌নের শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর একটা ভীষণ ঘুষি মেরে বলে' উঠলেন: তোমাদের এই নষ্টামি আমি দেখে নেব। বলে'ই ডান-হাতে কোঁচা ধরে' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাঁ সাঁ করে' বেরিয়ে যাচ্ছেন, অশ্রু তাড়াতাড়ি চৌকাঠের কাছে এসে হাঁক্‌লে: তিনুকে একদিন পাঠিয়ে দিয়ো কিন্তু।

প্রভাত সেই বারান্দার চেয়ারে বসেই হাঁক দিলে: বয়! চা নিয়ে এসো।

ম্যানেজারকে বলে' অশ্রু ঘরে একটা ইজি-চেয়ার আনিয়েছে। রাতের খাওয়ায়ো অনেকগুলি কোর্স দেয়; অশ্রু ভোজনব্যাপারে অতিমাত্রায় বর্বর হ'লেও এত সে গলাধঃকরণ করতে পারে না। ইস্কুলে যখন পড়তো তখন কম খাওয়াই ছিলো লেডি হওয়ার নিশান,—কিন্তু লেডি হওয়ার সাধনায় ইদানি ঢিলে দিয়ে অশ্রু বড় বড় গ্রাস মুখে পুরে' শব্দ করে' খায় আর অব্রাহ্ম পোষাক পরে' ব্যায়াম করে। শরীর তার এত সেরেছে যে অটো ভ্যাক্সিন্ নিয়েছে বলে' ভুল হয়।

ইজি-চেয়ারে চিৎ হওয়া যতটুকুন সম্ভব শরীরকে ততটা ঢেলে দিয়ে অশ্রু তন্ময় হ'য়ে কী সব ভাবতে বসলো। মানুষের ভাবনায় অন্তত কোনো ডিসিপ্লিন্ খাটে না—তা প্রজাপতির মতো পাতলা পাখা মেলে উড়ে' চলে। রাত এখন মন্দ হয় নি, এগারোটা বাজে। পাশের ঘরে কে একটি ভদ্রলোক গুন্ গুন্ করে' গান গাইছেন। সাম্‌নের দরজাটা খুলে অশ্রু তার ঘরেই চেয়ার পেতে শুয়েছে। শিগগির ঘুম আস্‌বে না।

ইজি-চেয়ারটা সম্ভব হয়েছে পৃথিবীতে monarchy-র পতন হয়েছে বলে'। ডেমোক্রেসির যুগ না এলে এমন হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার কথা ভাবাই যেতো না। তখন সব সময়েই শিরদাঁড়া খাড়া করে' বুক ফুলিয়ে বসে' থাক্‌তে হ'ত—কখন ওপরওয়ালার হুঙ্কার আসে, এখুনিই হুকুম তামিল করতে হ'বে, সময় নেই। এখন আর আমরা ওপরওয়ালা বলে' কাউকে স্বীকারই করি না—আমাদের হাতে এখন ঢের সময়, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। যদি কিছু বলবার থাকে, একটা চেয়ার টেনে সামনে বসো, আস্তে আস্তে শোনা যাবে, আমার হাত পা গুটোনো চলবে না। শরীরকে আরাম দেওয়ার মতো কীর্তি আর কিছুতে হ'তে পারে না। শরশয্যায় শুয়েও ভীষ্মদেব আরাম করে' গঙ্গোদক পান করবার জন্যে অর্জ্জুনকে অনুরোধ করেছিলেন। আত্মহত্যা করবার

জন্যে টেবিলের ওপর থেকে বিষের শিশি আন্‌তে গিয়ে চেয়ারের পায়ায় গুতো খেয়ে আত্মঘাতী আহা করে' ওঠে, পায়ের ওপর হাত বুলোয়। শরীর দেবতা—private divinity। এই শরীর স্পর্শ করে'ই নোফালিস্ মন্দির স্পর্শ করতেন। St. Paulটা এমন মূর্খ, শরীর ও তার আচ্ছাদনের পবিত্রতার অর্থ ই নাকি আত্মার অশুচিতা। তাঁর মতে উকুন হচ্ছে দেবপূজার বড়ো নৈবেদ্য! এই সুস্থ দৃঢ় pagan শরীর একটা প্রকাণ্ড সম্পত্তি। একে সহজে কষ্ট দিতে নেই। শ্রান্ত হ'য়ে দুই বলিষ্ঠ পরুষ বাহুর উপাধান পাওয়ার মতো শান্তি আর কোথায় আছে। প্রভাত বেশ বলশালী, তবু যেন কোথায় খুঁৎ আছে। ওকে দেখা আর নন্দনকাননে ইভ-এর সাপ দেখার একই অর্থ। মিলটন্ পর্যন্ত তাঁর *Paradise Lost*এ মেয়েদের ওপর চটে' গেলেন। য়্যাডাম হ'ল খালি ঈশ্বরের জন্যে, ইভ হ'ল য়্যাডামের মাঝে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর জন্যে। ইভ-এর চেয়ে য়্যাডাম্ হ'ল বেশি সুন্দর —অশ্রুর চেয়ে প্রভাত। প্রভাতের মুখে ভীরুতাময় নির্মলতা নেই, তাই ভালো লাগে, তবু সব মিলিয়ে কেন আবার ভালো লাগে না। আকাশের ঝড় ভালো লাগে বলে' নিদ্রাহীন নিদাঘনিশীথের শ্রান্তিও ভালো লাগবে এটা বাড়াবাড়ি। কত রকম contradictions নিয়ে মানুষের জীবন। ট্রেনের প্রভাতকে মনে হয় pagan, কল্‌কাতার প্রভাতকে মনে হয় philistine। অশ্রু যেন কায়াহীন নীহারিকা। কভু ম্যাডানো, কভু মেসালিনা, কভু ব্লু-স্টকিঙ। কভু রাধা, কভু রামী। তরকারির স্বাদ যেমন নুনে, জীবনের স্বাদ তেমনি তার contradictionsএ। এক নিয়মকে চিরকাল আঁকড়ে থাকে তারাই যারা বামন, আকাঙ্ক্ষায় যারা বেঁটে। ক্যাস্টর-অয়েল শরীরের পক্ষে মাঝে মাঝে উপকারী ব'লেই তাকে চিরকালের জন্যে খাদ্যে রূপান্তরিত করে' নেওয়া

ও চিরকালের জন্যে জীবনধারণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া এক জিনিস। একমাত্র তারাই consistent যারা মৃত। যে বাঁচবে সে বাড়বে, আপনাকে নিয়ে বারে বারে ছাঁটকাট করবে, ফ্ল্যানেলের জামার মতন জীবনো তার বারে বারে খেপে যাবে। নইলে না আঁচিয়ে খালি বসে' বসে' একঘেয়ে খাওয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য নেই। নিজের সঙ্গে বারে বারে মুখচন্দ্রিকা হওয়া দরকার, নানা আত্মার দর্পণে নিজের নানা প্রতিকৃতি। একই নারী একজনের স্ত্রী হ'য়ে আরেকজনের মা। Prism যেমন আলোর বিভিন্ন রঙ প্রতিফলিত করে, তেমনি মানুষের আত্মা। নির্মলের কাছে সে যা, প্রভাতের কাছে তা নয়। নির্মলটা সত্যিই কী কঠিন, নির্মলো ঠিক স্ফটিকের মতো। আত্মা এবং দেহের পার্থক্য বোঝে না। যাকে আত্মা দেবে তার কাছে আত্মদান করতে না পারলে ওর প্রেমের পরিপূর্ণতা নেই। যার আত্মা ও আবিষ্কার করতে পারবে না তাকে স্পর্শ করতেও ওর লজ্জা। প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে বিবাহ—ওর কাছে। তাই অশ্রুর উৎসুক অধরকে উপবাসী রেখে ও বললে: যদি আমার সঙ্গে গৃহ নাও, তবেই আমার ইহকালটা তোমার তৃষ্ণাত অধরে ক্ষয় করে' দিতে পারি, নচেৎ নয়। অশ্রুকে ও প্রত্যাখ্যান করলে। অশ্রু বিয়ে করতে চায় না অথচ প্রেম প্রত্যাশা করে এটা নির্মলের কাছে ব্যভিচার। নির্মল এখনো টেনিসের প্রতিবেশী। বিয়ে করবার কুৎসিত কৌতূহল অশ্রুর নেই বলে' দু'টো চুমু খাওয়ায় যেন সূর্য্য চন্দ্র ধর্মঘট করে' বসবে। আক খাবার জন্যে দাঁত উপযুক্ত মজবুত নয় বলে' মোহনভোগ খাওয়া যাবে না এটা চরিত্রের একটা বড়ো কৃতিত্ব নয়। তা হ'লে একজামিন দিতে যাবার আগে লিখে-পড়ে' প্রস্তুত হওয়ারো কোনো সার্থকতা নেই। স্টেজে নামবার আগে যেন রিহার্সেল দিতে হ'বে না। সাঁতার শিখতে

গিয়ে জলে একবার ডুব দিলেই সেটা ব্যভিচার। নির্মল ওকালতি করলে পয়সা পেতো। নির্মল! ওদের ইস্কুলের একটি মেয়ে একবার নির্ম্মল বানান্ করেছিলো দন্ত্য ন-য় দীর্ঘ ঈ দিয়ে। ঐ বানানটি ভুল হ'লেও ওর ভালো লাগে। ঐ ভুল বানানে শব্দটার একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। শব্দের বানান্ ও মানুষের ব্যবহার নিয়ে কোনো কানুন করতে যাওয়াই অন্যায়। বাঙ্লা ভাষা থেকে তিনটে স, দুটো ন, দুটো জ কবে নির্বাসিতা হ'বে। সোজা হ'তে পারলেই সব সহজ হ'য়ে যায়। বাঙ্লা টাইপ্-রাইটারে একটা উ লিখতে হ'লে তিনবার চাবি টিপ্তে হয়, ততক্ষণে ইংরাজিতে God বা Sex লেখা হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ যে বাঙ্লা অক্ষরগুলিকে রোমান্ অক্ষরে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছেন সেটা ভালোই। অশ্রুর নাম ভাগ্যিস নগেন্দ্রবালা হয়নি। নামের মধ্যে সত্যিই একটা চরিত্রাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শেলি বললেই মনে কেমন আবেশ আসে, *Adonais*-এর frail form-এর কথা মনে পড়ে। রসেটি ছাড়া ইংরেজ লেখকদের কারুর নামে vowel-ending আছে বলে' তো মনে হয় না! ফিললজি পড়তে বড়ো ইচ্ছা করে। একবার ওদের ইংরিজি অনার্স ক্লাশের একটি মেয়ে মাস্টারকে বলেছিলো: আমাদের ফাইললজি ক্লাশ কখন হ'বে? মাস্টার বলেছিলেন: ফাইলসপি ক্লাশের পরে। আরেক বার কোন্ একটা ছেলে-কলেজে মাস্টাব বোর্ডে নোটিশ দিয়েছিলেন: Mr So and So will not take his classes একটা ছেলে দুষ্টুমি করে' classes এর c-টি দিলো মুছে। পরদিন মাস্টার এ'স ব্যাপারটা দেখলেন এবং গম্ভীর হ'য়ে l-টিও মুছে দিলেন। ওদের ক্লাসের মেয়েগুলি কী অসম্ভব রকম খারাপ কথা বলতো। কলেজের মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেদের ধারনা ওরা যেন সব Dresden

China, ঝক্‌ঝকে, নির্মল। আবার নির্মল! অশ্রুকে সে হয়তো ভাবতো Psyche. নিজে কিন্তু Pan হ'য়ে ওর গুহায় কোনো দিন এলো না। কী কঠিন, স্বয়ং Circe এলেও হয়তো কেঁদে কেঁদে আত্মহত্যা করতো। সেই বিশ্রী দঙ্গলের মাঝে একটি মেয়ের সে দেখা পেয়েছিলো —ক্ষণকালের জন্যে—নাম তার ইন্দিরা। রবীন্দ্রনাথকে চুরি করে' বলতে হয় মেয়েটি যেন আত্মার শিখা; আর অতি-আধুনিক ভাষায়—আত্মার ফোয়ারা! শেলির Asiaও এর তুলনায় স্থূল। সমস্তটি দেহ যেন একটি ভঙ্গী, ইসারা! যেন দেবী Diana! বাঙ্‌লার সরস্বতীর চেয়ে সুকোমল, ঊর্মিলার চেয়ে নিঃশব্দচারিণী! গোধূলির শেষ রশ্মি দিয়ে ওকে তৈরি করা হয়েছে। মাটিতে এসে যে কেন ও পা ঠেকালো তারারা বলতে পারে। কী চমৎকার গান গাইত! ওর শরীরে যেন স্নায়ু নেই, খালি সুর। এই ধূলির ধরিত্রীতে ও আকাশের বাণী নিয়ে এসেছিলো। কলেজে কারু সঙ্গে মিশতো না, চুপ করে' কোণটিতে বসে' বই পড়তো। একবার আমাকে শুধু বলেছিলো: প্রেমের চেয়ে আর্ট বড়ো, আমি সেই আর্টের উপাসিকা। সেই ইন্দিরাকে নির্মল বিয়ে করেছে। বিয়ে না করতে পারলে যেন ওর ঘুম হ'তো না। আনন্দের চেয়ে যেন আরাম বড়ো। প্রেমকে দীর্ঘায়ু করতে ও ভোগকে দীর্ঘ করতে চায়। যেন প্রেমের তীব্রতার চেয়ে সম্ভোগের দীর্ঘতাটাই বেশি কাম্য। যেন কতকগুলি তালি দিলেই জুতো টেঁকে! আমরা খালি টেঁকাবার জন্যই ব্যস্ত; গ্রীন্‌-হাউসে কৃত্রিম উত্তাপ দিয়ে যেমন পরদেশী গাছ বা অগাছাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তেমনি বিয়ে করে' আমরা প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। কাঁচের ঘরে ঢিল পড়ে, গাছ যায় কুঁকড়ে, মরে'; তার চেয়ে খোলা হাওয়া অনেক ভালো। সন্তানকে বৈধ করতে গিয়েই প্রেমের ঘটছে সর্বনাশ। তবে বিয়ে করায়

অনেক সুবিধে—ঝক্কি কম। খাও, দাও, প্রসব কর—ইহকালের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল। জন্মশাসন পর্যন্ত নীতিসঙ্গত নয়, কেন না ধর্মের আদিম উপদেশকে অমান্য করা হয়। কলকাতায় কোনো বার্থ-কনট্রোল clinic নেই কেন? ধন্য শহর এই কলকাতা। সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন শুনে যেমন মন প্রশান্ত হয়, কলকাতাও তেমনি আত্মবিস্মৃত করে। ল্যাম্বের মতো শহর খুব ভালো লাগে আমার। কবিত্ব শক্তি থাকলে আমি এই জনতার কবি হতাম। গাঁয়ে যাও, সামান্য একটা মাছির শব্দ তোমাকে উচাটন করে' দেবে,—সব আওয়াজ সেখানে আলাদা-আলাদা. বাঁশের পাতায় হাওয়ার শব্দ, ঘরে চলা গরুর ডাক, পাপড়ির ওপর শিশির পড়ার শব্দ। বাবাঃ, কান পেতে এত শুনতে হয় বলে'ই গাঁয়ে মন ওঠে বিষিয়ে, সব কিছু দেখা ও শোনার অর্থ ভীষণতমরূপে স্পষ্ট ব'লেই গাঁয়ে গিয়ে মনের আর ছুটি থাকে না, সেটা প্রকাণ্ড জুলুম। লাখো লাখো কোলাহলকে পাঞ্চ্ করে' খেয়ে কল্‌কাতা যেন একটা মস্তমত্তা দানবী-র মতো আর্তনাদ উগ্‌রে দিচ্ছে। কান খাড়া করে' রাখতে হয় না, মন জুড়োয়, ঘুম পায়। বিকালবেলা যে-মুটেটা মোটরের মাড-গার্ডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে-পড়ে' গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো তার কান্না ঐ ফিরিওয়ালার হাঁক থেকে আলাদা করে' নেওয়া অসম্ভব,—একটা ঢেউ থেকে আরেকটা ঢেউকে ছিনিয়ে নেয় কার সাধ্য। সমুদ্রে ফেনা, শহরে মানুষ। কেউ কাকে চেনে না। পাশের ঘরে ভদ্রলোকটি যে গুন্‌গুন্‌ করে' গান গাইছেন তিনি এটিকেট বাঁচাতে কক্‌খনো এঘরের চৌকাঠ মাড়াবেন না; আর আমি যদি দরজা ঠেলে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকি গল্প করবার জন্যেই, নির্মলের ভাষায় সেটা হ'বে ব্যভিচার। ঐ ভদ্রলোক যদি আজ রাত্রে আত্মহত্যা করেন, তবেই ঐ ঘরে ঢোকা আমার সম্ভব হ'তে পারে; কিংবা

এখুনি যদি হোটেলে আগুন লেগে যায়, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা অসতর্ক কোলাকুলি হ'লেও বেমানান হ'বে না। শুক্তির মতো আমরা নিজের নিজের খোলার মধ্যে আত্মগোপন করে' সংকুচিত হ'য়ে আছি। কাছে থেকেও দূরে'—কথাটায় কবিত্ব আছে, সেটা অর্থবান হ'য়ে ওঠে প্রতিবেশীর বেলায়। এত কাছে যে মনে হয় nuisance, এত দূরে যে গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আমরা প্রভাবিত হ'লেও কোনো কালে প্রতিবেশী দ্বারা হ'বো না। এমন মেয়ে নেই যে আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখের চেহারা না দেখেছে এবং না ভেবেছে আমি একজন পরমা সুন্দরী। মানুষের মুখের চেয়ে সত্যিকারের আয়না কী আছে পৃথিবীতে। সেখেনেই আমাদের সত্যিকারের ছায়া পড়ে, সেখেনেই আমরা সৌন্দর্যের পরখ করতে পারি। সৌন্দর্য খালি গুণবত্তায় নয়, আত্মার মাধুর্যে নয়—পোষাকে, খোঁপায়, দাঁড়াবার বা শোবার ভঙ্গীটিতে। বাঙালি মেয়েদের পোষাকে রঙ নেই, বৈচিত্র্য নেই,—এটা জাতীয় শুভলক্ষণ নয়। আজ গ্লোবে গিয়ে যতগুলি মেম দেখলাম সব ক'টার পোষাকের রঙ আলাদা,—দেখলে রামধনু লজ্জায় মিলিয়ে যাবে। তবু পরিচ্ছদ আমরা ভালবাসি, ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে আমরা পরস্পরের শাড়ি ও খোঁপার তারতম্য বিচার করি। ছেলেরা ফুটবল আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে' যেমন সুখ পায়, আমরাও বেঁচে যাই পোষাক বা স্বামীর কথা বলে'। সে-থিয়েটারে আমরা যাইনে যেখানে সামাজিক নাটক অভিনীত হয়, কেননা পোষাক নেই। 'সীতা'র পরে 'ষোড়শী' দেখে অনেক মেয়ে ভেবেছিলো ওটা একটা কমিক, কেন না serious হ'লে পোষাক থাকতো। যাই বল, পোষাকের একটা নৈতিক মূল্য আছে। একটা ভালো ছাঁটের ব্লাউজ গায়ে দিলেই পৃথিবীকে লাগে সুন্দর, আকাশকে মনে হয় লোভনীয়। শাড়িটা যদি লম্বায় মোটে চুয়াল্লিশ ইঞ্চি হয় তবে

নিশ্চয়ই সে রাতে ভালো ঘুম হ'বে না, দুঃস্বপ্ন দেখবো। শিল্ক না পর্‌লে রবীন্দ্রনাথ ককৃখনো এত বড়ো কবি হ'তে পারতেন না। সাহেবরা যে ডিনারের আগে ড্রেস করে তা শুধু ভালো হজম হ'বে বলে'। কিন্তু পোষাক অর্থ কি তার দৈর্ঘ্য না হ্রস্বতা। পোষাকের বেলায় একটু বাহুল্য থাকা ভালো, নইলে বহুস্ত্রবিরহিত হ'লে মেয়ে আর মোয়া একজাতীয় হ'যে উঠবে। চুল ছেঁটে ফেলায় সুবিধে অনেক, কিন্তু ওটাই বাঙালি মেয়েব বিশেষত্ব, তার নিজস্ব হেডড্রেস। দেশের একটা নিজস্বতা থাকা ভালো, যদিও Bendaর মতে স্বদেশ-প্রেমই হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে অনিষ্টকারী। সেটা ভারতবর্ষের বেলায় খাটে না। কেন না যে-দেশ পরাধীন তার বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন দেখা আর কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়া সমান হাস্যাস্পদ। উৎকট স্বদেশপ্রেমের জন্যে সব দেশ মিলতে পাচ্ছে না—এটা তখনিই ভারতবর্ষের পক্ষে সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌বে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন, স্বতন্ত্র। আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে কী কর্‌লাম? চুল বাঁধলাম আর প্রেম করলাম। তা ও একটা মনের মতো করে' করতে পার্‌লাম কৈ? কোথাও যেন পূর্ণতা নেই। আচ্ছা, চোখ বুজে' বিয়ে করে' ফেললে কেমন হয়—একেবারে একটি নিরীহ অচেনা লোককে। সেই বিয়ের সভা থেকে পালিযে না এলে এতদিনে আমার কী রকম চেহারা হ'ত। সেই চেহারায় আমাকে মানাতো না। কতগুলি চেহারা আছে যাদের মর্‌লেই বেশি মানায়—যেমন ধরো ইফিজেনিয়া। বার্ণাড শ'-র ছেলেপিলে থাকলে তাঁর লেখার দাম অনেক ক'মে যেতো। আমার সমবয়সী পিস্‌তুতো বোন্ পুষি যে ছ'টি সন্তান প্রসব করে' শরীরে ও মনে মীইয়ে পড়েছে তার এক চুল এদিক-ওদিক হ'লে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকতো না। পুষিকে ওর স্বামী যে-সব চিঠি লিখতো তার দুয়েকটা

পড়েছিলাম—উঃ, কী ভাল্‌গার। অথচ ওর স্বামী একজন সংস্কৃতে এম-এ। স্বামীর বিরুদ্ধে ডিফামেশান্ আনা যায় কি না জানি না; বাঙ্‌লা দেশে ডিভোর্স থাক্‌লে ঐ রকম একটা চিঠিই যথেষ্ট। এগুলি ন্যায়সঙ্গত, এতে চরিত্রহানি হবার সম্ভাবনা নেই। স্ত্রী-র সঙ্গে ব্যবহারে ব্যভিচার বলে' কোনো শব্দ নেই।....দেয়ালে একটা টিকটিকি পোকা ধর্‌বার জন্যে ওৎ পেতেছে। পোকাটা এমন বোকা যে বুঝতে পার্‌ছে না, ধরা দিলেই যেন ওর মোক্ষলাভ হ'বে। আরশুলা, টিক্‌টিকি, ছারপোকা, ইঁদুর, কেঁচো, জোঁক, কচ্ছপ, ক্যাঙ্গারু, বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি। লরেন্স্ মশা নিয়ে কবিতা লিখেছে—কচ্ছপ নিয়ে। শুধু তাই নয়, চামচিকে আছে, গুগ্‌লি আছে। যাব কোথা? গো-সাপের কথা নাই বললাম। বিধাতার রুচি ভালো। লিংকন্ বল্‌তেন: গরিবদের ওপর ভগবানের গভীর মমতা, নইলে ঝাঁকে-ঝাঁকে এত গরিব সৃষ্টি কর্‌বেন কেন? ফুলের চেয়ে আগাছাকেই প্রকৃতি বেশি ভালোবাসে, তাই পৃথিবীতে যতো ফুল তার চেয়ে ঘাস বেশি। দুয়েকটা মশা কামড়াচ্ছে, ঘুমুতে যেতে বলছে। ঘুমুবার আগে বাথ্ রুমে যেতে হ'বে —দাঁত মাজ্‌তে হ'বে। দাঁত না মাজলে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখবো। দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধর্‌বার লোক নেই পাশে। থাক্‌লে সেটাই একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন হ'তো। বিছানায় পাশ-বালিশ আমি পছন্দ করি না। প্রভাতের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে রাখলে মন্দ হ'ত না, এখন একটু চেষ্টা করা যেতো। এমন কোনো dentifrice নেই যে নিকোটিন্‌এর কোটিং তুলতে পারে। সিগারেটটা unaesthetic তো বটেই, চুমোর স্বাদ কেড়ে নেয়। তবু এখন একটু ধোঁয়া ছাড়্‌তে পার্‌লে কী এমন মন্দ হ'ত। কোনো ভদ্র মেয়ে কোনো দিন গাঁজা খেয়েছে? খায় নি, অথচ গাঁজার গল্প করতে ওস্তাদ। কেন খায় নি? কৌতূহল

হয় না? গাঁজা না খেয়ে মরলে সেই মৃত্যুটা অসার্থক মনে হয় না? বায়স্কোপের সবগুলি গল্প গাঁজাখুরি—মানে, conclusionগুলি। সব filmএর শেষেই জোড়াতালি দিয়ে বিয়ে ঘটাতেই হ'বে। বিয়ে অমনি হ'লেই হ'ল। যেখান থেকে গল্পের সুরু হওয়া উচিত, সেখানেই ওরা যবনিকা ফেলে দেয়। মাতার জঠরে শিশুর বন্দীত্ব নিয়ে কেউ একটা গল্প লেখেনি কেন, কিংবা মৃত্যুর পরে। অভিজ্ঞতাই কাব্যকারক নয়, প্রতিমা বা কল্পনা। সংস্কৃত আলংকারিকরা তা বুঝ্‌তেন। বামন কিন্তু রীতি বা স্টাইলকেই বলেছেন কাব্যের প্রাণ, রস নয়। বাঙলা দেশে সবাই বেমালুম আওড়াচ্ছে: সত্য, শিব, সুন্দর। ঐ তিনটে শব্দের কোনো মানে নেই, এমন কি ওদের ধ্বনি-মাধুর্য পর্যন্ত কমে' এসেছে। বাথ্-রুমের বাল্‌ব্-টার আবার কী হ'ল? মুস্কিল। এখন মুখ ধুই কি করে'? যাক্। এতেই হ'বে—হ্যাঁ, জলের টাম্ব্‌লারটা পাওয়া গেছে, জলগুলিতে স্বাদ নেই। আঃ, মোলায়েম। রবিঠাকুর প্রেম-এর সঙ্গে 'এলেম' মিলিয়েছেন, তার চেয়ে 'মোলায়েম' ভালো মিল্। মশারি টাঙানো আমার দ্বারা পোষাবে না। যে গরম, ব্লাউজটা খুলে' ফেল্‌তে হ'বে—শাড়িটাও নিতে হ'বে বদলে। নাঃ, মশা আছে—না-ঘুমিয়ে ছট্‌ফট্ করে' রাত কাটাবার মতো প্রেমের বয়স চলে' গেছে—আমার ত' বটেই, পৃথিবীরো। দরজাটায় খিল ভালো করে' আট্‌তে হ'বে বৈ কি, কেননা আততায়ী এলে স্যুটকেস থেকে ছোরা বার করে' প্যাঁচ দেখানোর হাঙ্গাম অনেক। আততায়ীর হাতে নিশ্চয়ই এতটা সময় নেই যে ইজি-চেয়ারে বসে' দু'ঘণ্টা তর্ক করবে। শোয়া যাক্। আমি ত' শুলাম, কিন্তু এ কথা খুব সহজেই ভাবা যেতে পারে যে এ-রাত্রে এখন কারু কারু ঘুম আসছে না। ধরা যাক্ রোগী, এঞ্জিন ড্রাইভার, সিগনেলার, নবদম্পতি,

বেশ্যা। আমার আবার মস্ত দোষ আছে। শাদা ঘোড়ায় চড়ে' টগবগ করে' ছুটছি—এই কথা না ভাবতে পারলে আমার ঘুম্ আসে না। আমাব পেছনে তেত্রিশ কোটি সৈন্য,—আমার তুলনা শুধু আমিই। আমার আগে কোন ইতিহাস হয়নি। বা কাৎ হ'যে পিলেব দিকটা চেপে ধরলে আমাব সহজে ঘুম আসে—শাদা ঘোড়া কুযাসা হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, টিক্‌টিকি, ক্যাঙ্গারু, ইজিচেয়াব, তোয়ালে, বার্ণার্ড শ'র দাড়ি, চেস্টারটনেব ভুঁড়ি, সেজ-কাকাব আঁচিল, টিঙ্কচার আইওডিন, হাইড্রোজেন পেরোক্‌সাইড, বাক্যং বসাত্মকং কাব্যং, সেনেট্‌ হাউস্, স্মেলিং সল্ট, বৈঠকখানা রোড, বাডেন-বাডেন, মুসোলিনি, শরৎ চাটুজ্জে, ক্যালগুাব, পাটনা, গোলঘর, গঙ্গা ..

প্রভাত বললে—তিন দিনের আগে তুমি বার্থ পাচ্ছ না। তা-ও 13 up-এ শেয়ালদা থেকে যে-ট্রেনটা বেনারস হ'য়ে দিল্লি যায় সেটায়। 7 up-এ একটা আপার বার্থ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তোমার পক্ষে সেটা সুবিধের হ'বে না।

অশ্রু বললে—তাও একটা মাত্র।

প্রভাত। আপাতত একটা হ'লেই চল্‌বে।

অশ্রু। তার মানে? আমি একা যাব নাকি?

প্রভাত। কাজে কাজেই। ছুটি পাওয়া গেলো না।

অশ্রু। ছুটি পাওয়া গেলো না মানে?

প্রভাত। যদি শুদ্ধ ভাষায় বল্‌লে কথাটা তোমার বোধগম্য হয়, তা হ'লে বলি, অবকাশের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

অশ্রু। এ-চাক্‌রি তুমি ছেড়ে দাও।

প্রভাত। প্রেমের জন্যে এত বড়ো আত্মত্যাগের কথা শুনলে বিংশ শতাব্দী সভ্য জগৎ আমাকে উপহাস কর্‌বে! বিবহের চেয়ে ক্ষুধা মারাত্মক তোমার সঙ্গ—আমার খুব কামনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্যে চাকরি খুইয়ে মা ও নাটুকে শুকিয়ে মার্‌বো এত বড়ো প্রেমিক তোমাদের সত্যযুগেও মানাতো না। সে-সব যুগে সুবিধে ছিলো এই, বাড়িতে সব সময়েই খাবার থাকৃত। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তিটা প্রশংসনীয় হ'তে পার্‌লো এই জন্যই যে উর্মিলাকে উপোস করতে হয়নি। ইস্কুল-মাস্টাররা ত' নর-নারীর প্রেমের চেয়ে ভগবদ্ভক্তিকে উঁচু আসন দেবেন—যদিও সত্য কথা বল্‌তে গেলে হু'টোর কোনোটাই ক্ষুধার মতো প্রবল নয়। তবু আজ যদি আমি ধর্মেরো ডাক শুনে মা ও ভাইকে ফেলে গৃহত্যাগ করি, এতো বড়ো অধর্ম পরশুরামও ভাব্‌তে পার্‌তো না।

অশ্রু। তা হ'লে কী হ'বে?

প্রভাত। সমস্যা মোটেই কঠিন নয়। টিকিট লাহোরেরই কেটে সোজা পাটনায় চলে' যাও এখন। সেখানে না তোমার কে বন্ধু আছেন!

অশ্রু। সে এলাহাবাদ-ব্যাঙ্কে বদ্‌লি হয়েছে।

প্রভাত। ব্যাঙ্কে বদ্‌লি হয়েছে মানে?

অশ্রু। ঐ hybrideটায় দু'টো অর্থ বোঝা গেলো। মানে সে ব্যাঙ্কে কাজ করে—নিশ্চয়ই ইম্পিরিয়্যাল্ ব্যাঙ্কে—এবং পাটনা থেকে বদলি হয়েছে এলাহাবাদে।

প্রভাত। (হেসে) তা হ'লে তোমার পাটনা পিট্‌টান দিলে?

অশ্রু। তা ত' দিলে, কিন্তু তুমি কর্‌বে কী?

প্রভাত। কী আর কর্‌ব! আফিস থেকে এসে হাই তুল্‌বো আর তুড়ি দেব। নিত্যকালের মতো কল্‌কাতা আবার কালিয়ে যাবে।

অশ্রু। না, ঠাট্টা নয়, be serious.

প্রভাত। সিরিয়াস্‌ই তো হচ্ছি। ছুটি পেলাম না এর চেয়ে গুরুতর বা গম্ভীর কথা আর কী হ'তে পারে। আজ বুধবার, চল শনিবারে তোমাকে তুলে দিয়ে আসি। সোজা এলাহাবাদই যাও।

অশ্রু। হ্যাঁ, ঐ বদ্দি ট্রেনে চড়ে' একা একা ছটফট কর্‌তে কর্‌তে আমি মারা যাই আর কী। ঐ ট্রেনে চড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনে। তার চেয়ে এক কাজ করি, এস। তোমার পুজোর ক'দিনো কি ছুটি নেই?

প্রভাত। আছে। মোটে তিন দিন। সেই তিন দিনে এলাহাবাদে যাওয়া এবং আসা ছাড়া তিনটে কথা বলবারো সময় পাব না। কিন্তু সেই পুজোর তিন দিনেরো দেরি আছে। তুমি ততদিন কলকাতায়

থাকতে চাও নাকি? এই হোটেলেই? তা হ'লে ততদিনে তোমার মনি-ব্যাগটি পটল তুলবেন।

অশ্রু। না, আমি এই ফাঁকে ক'টা দিন পুষি-দিদির বাড়ি কাটিয়ে আসি।

প্রভাত। সে কোথায়?

অশ্রু। দিলদারনগরে,—মোগলসরাইর ডাইনে। মেইন্ লাইনেই পড়বে। তোমার সাধের 13 up বোধ হয় ওখানে একটু বিশ্রাম নেবেন। দেখি টাইম টেব্‌লটা?

টাইম্-টেব্‌লটায় চোখ বুলিয়ে অশ্রু বললে—একটা দশ মিনিট। মন্দ নয়। তোমার ছুটির তারিখ আমাকে জানাবে, আমি সেই অনুসারে দিল্‌দারনগর ছাড়্‌ব। দু'জনের সাক্ষাৎকার হ'বে এলাহাবাদে।

প্রভাত। আমাকে কি তোমার সেই বন্ধু জায়গা দেবেন?

অশ্রু। কেন, এলাহাবাদে পঁচিশ গণ্ডা হোটেল তা ছাড়া যমুনা আছে।

প্রভাত। তা ত' বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কেনই বা যেতে হ'বে—

অশ্রু। সেটা বুঝছ না? এম্‌নি, বেড়াতে—দু'টো দিন অন্যরকম আকাশ দেখ্‌তে, অন্যরকম আবহাওয়া। তোমার যদি যেতে ইচ্ছে না করে, সে আলাদা কথা। জোর করে' সম্মতি আদায় করবার মতো অসভ্যতা আমার নেই। বেশ, আমি একলাই যাবো।

অশ্রু রীতিমত অভিমান করেছে। তাড়াতাড়ি কোনো কথা কয়ে' এই অভিমানের কুয়াসাটুকু উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই বোকামি। প্রভাত চুপ করে' রইলো।

অশ্রু বলে' চল্‌লো: আমাকে নিয়ে তোমার মনে নানারকম সন্দেহ চলেছে আমি বুঝি। কী যে তুমি আমাকে ভাবছ না, জানি না। এই

দীর্ঘ তিন বছর পরে হঠাৎ অজ্ঞাতবাস ছেড়ে কেন আবার তোমার একান্ত কাছে এসে পড়লাম—এই প্রশ্নটার উত্তর আমি দেব। শুনবে?

ট্যাক্সি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে। এস্প্ল্যানেডে ওদের যাত্রার আজ শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অশ্রু ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বারণ করলে। গাড়ি চল্‌লো দক্ষিণে।

প্রভাত বল্‌লো—যাবে না?

অশ্রু। না। তোমাকে সেই ধাঁধাটা বুঝিয়ে দেব, শুনবে ব্যাখ্যাটা?

প্রভাত। তা যদি বল, ব্যাখ্যার চেয়ে ধাঁধা অনেক সত্য, অনেক মধুর। ধরে' নাও গ্রহতারার ষড়যন্ত্রে আবার আমাদের দেখা হয়েছে।

অশ্রু। না, ষড়যন্ত্র নয়। আমি এতদিন ইচ্ছে করে'ই নিজেকে লুকিয়ে ছিলাম। এই তিন বছরে আমি তোমার পরীক্ষা নিয়েছি। দাঁড়াও, আমাকেই সবটা বলতে দাও। পরিষ্কার কথাকে আমরা ভয় করি বলে'ই দেহ-মনে এত অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে আছি। সামান্য রুমাল নিয়ে ওথেলো যে কাণ্ডটা করে' বসলো, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তা নিয়ে পাঁচ মিনিট ডেসডেমোনার সঙ্গে কথা কইলে ব্যাপারটা ট্রাজিডি না হ'য়ে ফার্স হতো। তোমার সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতা হয়েছিলো এবং তারই টানে বিয়ের সভা থেকে আমি উঠে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলে'ই তোমাকে বিয়ে করে' তোমার পরম সর্বনাশ ঘটাবো, আমি তোমার তেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নই। তা ছাড়া তখন বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, আজো হইনি, কারণ আজো আমি শান্ত নই, নিজেকে নিরাশ্রয় নিরালম্ব ভাববার মতো দৌর্বল্য আমার আসেনি। চলে' গেলাম জলপাইগুড়ি সামান্য টিচারি নিয়ে। বাড়ির সদর দরজায় খিল পড়্‌লো, বাবা দুর্ভাষায় দুর্বাসাকে পর্যন্ত অতিক্রম করলেন; আত্মীয়-স্বজনরা কলঙ্কিনী বলে' আখ্যাত

করে' আমাকে তাঁদের পুত্রী-পৌত্রীদের কাছে নরকের দ্বাররূপে দাঁড় করিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন। সে-সব আমি নীরবে সহ্য করেই' তীব্র প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু তারপরে জলপাইগুড়িতেই একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো।

প্রভাত নিবিষ্টমনে সিগারেট্ টান্‌ছে। অশ্রু খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর জুৎ করে' বসিয়ে বলে চল্‌লো: সেই কথাই তর্শু 'সেজকাকা বল্‌তে এসেছিলেন। কাণ্ডটা আর কিছু নয়, আরেকজনকে ভালো বাসলাম। তোমাকে তখনো ভুলিনি, তোমার প্রতি আমার মমতা স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের মতোই অপরিসীম, তবু চিত্ত আবার উন্মুখ হ'যে উঠলো। নবাবিষ্কারের আশায় অধীর মনকে বাঁধি কি করে'? তুমি shocked হচ্ছ?

হাওয়ায় সিগারেটের ছাই উড়িয়ে দিয়ে প্রভাত বললে—না।

—এমন পুরুষ আছে যার জন্যে হৃদয়ে শুভকামনার আর অন্ত থাকে না, রাতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে তার কথা ভাব্‌তে ইচ্ছে হয়, ভাবলে ভালো লাগে এবং এত ভালো লাগে যে চোখে জল আসে। সে অসুস্থ হ'লে অজস্র সেবায় তার জন্যে স্নেহপাত করতে সাধ হয়, সে বিপন্ন হ'লে তার জন্যে নিজেকে রিক্ত উন্মুক্ত করে' দেবার উন্মত্ততা আসে। সে আমার তুমি। কিন্তু এমন পুরুষেরো দেখা পেলাম যাকে জয় করবার জন্যে প্রাণে জাগে প্রচণ্ড লোভ; যার নৃশংস ঔদ্ধত্যকে স্ত্রৈণতায় রূপান্তরিত করবার ইচ্ছা হয়। সে তার অবিচল পবিত্রতার পাহাড় থেকে নেমে এসে আমার পায়ের ধুলায় কলঙ্কিত হ'বে এত বড়ো প্রলোভন দমন করতে ক্লিওপেট্রা পার্‌তো কিনা জানি না, আমি পার্‌লাম না। আমি গেলাম এগিয়ে, কিন্তু হটে' এলাম। সে আমার নির্মল। তুমি শুন্‌ছ?

প্রভাত। শুনছি, কিন্তু কথাটা এমন কিছু নয় যে তোমাকে এতো উত্তেজিত হতে হবে!

অশ্রু। নির্মলের কথা বলতে গিয়ে আমি উত্তেজিত না হ'য়ে পারি না। খুব ধীরে ধীরে একটা যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের বর্ণণা করলে সে-বর্ণনা ব্যর্থ হবে। আমি দু'জনকে ভালবাসলাম, কিন্তু সত্য কথা বলতে যদি বাধা না দাও ত' বলি, আজো আমার ভালবাসার অন্ত পাইনি।

প্রভাত। যেন না পাও, তাই প্রার্থনা করি। নব নব অচবিতার্থ-তায় প্রেম তোমাব মহনীয় হ'য়ে উঠুক।

অশ্রু। নির্মলকে পারলাম না পরাভূত করতে, আমাব প্রেম কিন্তু তবু সংকুচিত হ'ল না। যে-প্রেমেব পরিণতি বিবাহ নয় এবং যে-বিবাহের পরিণতি সন্তানজনন নয় সে-প্রেম ও সে বিবাহকে নির্মল ঘৃণা করে। আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হ'লুম না বলে' সে আমার চুম্বন পর্যন্ত সহাস্যমুখে প্রত্যাখ্যান করলে। জলপাইগুডিতে প্রায় দু'বছর আমার এই ভীষণ পরীক্ষা চলেছে। বাইরে হারালাম বটে, কিন্তু অন্তরে বলবতী হ'যে উঠলাম। সেই পবীক্ষার সাক্ষীরূপে যাকে পেলাম সে আমার ব্যর্থতা।

অশ্রু চেয়ে দেখলে প্রভাত গদিতে ঠেস দিয়ে তন্ময় হ'য়ে শুনছে।
—নির্মলকে হারালাম বটে, কিন্তু তোমাকে হারাবো ভাবতে মন কেঁদে উঠলো। এই তিন বছরে তুমি হয় ত' অনাত্মীয় হ'য়ে গেছ, হয় ত' অশ্রর নাম তোমার সেদিনকার অশ্রুর মতোই মুছে গেছে, তবু তোমাকে না ডেকে পারলাম কৈ? দেখলাম সেই ডাকে তুমি সাড়া দিয়েছো, মনে হ'ল আমি যদি ভুলক্রমে নির্মলের অন্তঃপুরিকাও হ'তাম, তুমি এমনি করে'ই সাড়া দিতে!

প্রভাত। আর আমি যদি এতো দিনে একটি অন্তঃপুরিকাকে অন্তরে এনে প্রতিষ্ঠিত করতাম!

অশ্রু। তা হ'লেও আমার ডাক অনুচ্চারিত থাকতো না। তোমার স্মৃতি আমার জীবনের একটা বিশ্রাম-নীড। তোমাকে নিয়ে যদি আনন্দার্ত্ত নাই হ'তে পারি, তবু তোমার প্রতি আমার সুশীতল এই স্নেহটি অমর হ'য়ে থাকতো। কিন্তু এই দীর্ঘ বিরহক্লিষ্ট দিন-রাত্রির অত্যাচার তোমাকে বশীভূত করতে পারেনি,—আজো তুমি মুক্ত। তুমি নির্মলের মতো বিয়ে করনি। কেন করনি?

প্রভাত। সে একটা accident! যদি আমাকেও পরিষ্কার করে' কথা বল্‌বার অনুমতি দাও তো বলি, তোমাকে ভালবেসেছি ব'লেই অন্য কাউকে আমি বিয়ে করবো না সন্ন্যাসধর্মের এই উচ্চাদর্শ আমার সামনে উপস্থিত নেই। তা ছাড়া বিয়ে-করার কতকগুলো ব্যাবহারিক সুবিধে আছে; আমার মা বুড়ো হয়েছেন, অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে রান্নার ঠাকুর রাখি—মা-ই সব করেন, বৌ এলে মাকে ছুটি দিতে পারতো। তাই বলে' বৌকে যে ভাল লাগতো না, তা-ও নয়—বিনা-দামের উপহারের প্রতি যেমন মমতা হয় আমার এক তিলো কম হ'ত না তার তুলনায়। কিন্তু যাই বল অশ্রু, নির্মলের কথায় সুগভীর একটা সত্য আছে। সেই সত্য তোমার আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ নয় বলে'ই তাকে অস্বীকার করবার সংস্কার যেন আমাদের না হয়।

অশ্রু। প্রতিদিনকার ছোটখাটো গ্লানিতে সে-প্রেম কি মলিন হ'য়ে উঠতো না?

প্রভাত। যাতে মলিন না হয় তার চেষ্টা করতে, সে-চেষ্টায় পরাঙ্মুখ বলে'ই তো আমাদের নর-নারীর সম্পর্কে এতো কুশ্রিতা আত্ম-প্রকাশ করছে। স্ত্রীকে যত দিন আমরা সামগ্রী মনে করবো, এবং

স্বামীকে যতো দিন তোমরা দেহদাস মনে করবে ততদিন আমাদের সংসার অশুচি হ'য়ে থাকবে। এবং তারই প্রতিকারকল্পে প্রেমের প্রয়োজনীয়তা আছে। নির্মলের কথা মিথ্যা নয়, অশ্রু। যে-প্রেম জীবনেব পরম উপকার সাধন করে সে-প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখলে জীবনে না থাকে স্বাদ, না তৃপ্তি। আমবা স্ত্রী-পুরুষরা পরস্পরকে পবিচ্ছন্নরূপে আয়ত্ত করে' ফেলি বলে'ই আমাদেব জীবনের রহস্য যায় মরে,' মিলন হয় মলিন। কিন্তু তুমি যে নির্মলেব অন্তঃপুরিকা হ'যেও আমার প্রতি অন্তঃশীল স্নেহ লালন করবাব গর্ব কবছ, তা মিথ্যা। দাঁডাও, আমাকে শেষ কবতে দাও। তোমার স্নেহেব খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আমি না-ই বা করলাম, কিন্তু যে-স্নেহেব বাহ্যাভিব্যক্তি নেই আমি তাব দাম দিতে বিমুখ থাকবো। আবো কথা আছে। সান্নিধ্য না থাকলে স্নেহের সার্থকতা কোথায়। প্রেম শুধু চিত্তের প্রসাধান নয়, জীবনেব সর্বব্যাধি নাশক মহৌষধি। যে-মন অন্যত্র একবার বিক্ষিপ্ত হয় সে-মনেব একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় বলে'ই স্নেহের ঘটে অপমৃত্যু।

অশ্রু। দৈনিক প্রয়োজন-কথাটা যদি ব্যাপকভাবে নাও তো বলি, দৈহিক প্রয়োজনেই যদি বিয়ে ক'রতে হয়, তবে তাই বলে' ব্যক্তিত্বকে নিশ্চহ্ন করে' লুপ্ত করে' zero হ'য়ে বসে' থাকতে হ'বে— সমাজের দেওয়া এই বিধিব আমবা বিপদ ঘটাবো। একজনের স্ত্রী হয়েছি বোলে' আবেকজনেব বন্ধু থাকতে পারবো না এতো বডো একনিষ্ঠতার বডাই করলে আমাব গা জ্বলে। গৃহিণী অর্থ সমস্ত বাহিরকে ঠেলে ফেলে গৃহবন্দিনী হ'যে থাকা নয়। সামান্য সংসারে আমার প্রকাণ্ড ভবিষ্যতকে কুণ্ঠিত, সংকুচিত করে' রাখতে পারবো না।

প্রভাত। দোষ সমাজবিধির নয়, অশ্রু, দোষ যদি কারুব থাকে, তবে এই মানুষেব চিত্তবৃত্তির ভঙ্গুরতার। প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না

বলে'ই তা মধুর, বিরহের উত্তেজনা সমগ্র জীবনব্যাপী হ'লে আমরা অথর্ব, পঙ্গু হ'য়ে থাকতাম। আমরা খুব অল্প দিন বাঁচি বলে'ই জীবনকে এতো নিবিড় করে' আঁকড়ে ধরতে চাই। দৈহিক প্রয়োজন কথাটা ব্যবহার করে' ভালোই করেছ। কেননা এই দেহই তোমার চিত্তের পরিপন্থী হ'য়ে উঠতো; উঠতোই। তখন তুমি বহুসন্তানপরিবৃতা, সংসার-ভারে নুয়ে পড়েছ, মন তোমার তখন বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে, দায়িত্বের তোমার আর সীমা নেই—অতীত কালের দিকে ফিরে তাকাবার তোমার না আছে অবকাশ, না বা অভিলাষ। যৌবন যে অবিনশ্বর নয় তার জন্যে সমাজকে দায়ী করলে ঘোরতর অন্যায় হবে। এবং যৌবনকালে যদি তুমি কাউকে পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচাবার পরামর্শ দিয়ে থাক, পরে তুমিই তা কেটে ফেলবার বিধান দেবে। যাক, লেইক এসে গেছে। তোমার কাঁধের সেফ্‌টিপিন্‌টা যে আমার চাদরে আটকে রাইলো, দাঁড়াও, ছাড়িয়ে নি।

লেইক্ থেকে ফিরে এসে অশ্রু দেখলে তার ঘরের কাছে চেয়ার টেনে তিনু বসে' আছে। 'এই যে দিদি' বলে তিনু তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে অশ্রুকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো। প্রথমটা আনন্দে অভিভূত হ'তে গিয়ে পরক্ষণেই অশ্রু উঠ্‌লো চমকে। দু'হাতে তিনুর মুখ তুলে ধরে' শুধোল: তোর মাথায় এ[illegible]সের ব্যাণ্ডেজ?

তিনুর মুখ দীপ্ত, দুই চোখে খুসির চাঞ্চল্য, বললে—মোটর-য্যাক্‌সিডেণ্ট হ'য়েছে, দিদি। তেমন কিছু লাগেনি, ইঞ্চি দুয়েক কেটেছে মাত্র।

অশ্রু ছোট ভাইটির চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললে: কিছু খাবি?

তিনু বললে: খাওয়ার সময় নেই দিদি, আমাকে এখুনি এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে। বিকেলে কাল জাহাজ ছাড়বে আমাদের। কলম্বো হ'য়ে যাচ্ছি দিদি। ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। এখন যাই?

ব'লে' তিনু নত হয়ে অশ্রুর পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিলো, অশ্রু তাকে একেবারে শিশুটির মতো বুকে টেনে নিলো। বললো—বাবা জানেন?

তিনু দিলে হেসে। বললে—বাবা? যে-দিন আমাকে বাড়ির বার ক'রে দিলেন সে-দিনই জান্‌তেন পাতালের দিকে পা বাড়াতে আমার আর দেরি নেই। মন্দ কি, পাতালই আবিষ্কার করে' আসি না হয়। কালকে খবরের কাগজে নামটা যদি বেরোয়, বাবার অগোচর থাকবে না। হয়তো মনে-মনে আবার অভিশাপ দেবেন।

তিনুর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' অশ্রু বললে—বাবা তোকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন নাকি।

তিনুর মুখ আনন্দে আবার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। বললো—নিশ্চয়। তুমি যে অন্যায় করেছো তার চেয়ে আমার এই সাগরলঙ্ঘন ঘোরতর পাপ। বাবার আদেশকে মান্য করবার মতো বিবেক পেলাম না দিদি। বাবার চেয়েও বড়ো অভিভাবক আছে সে আমার সত্যোপলব্ধি, আমার মনুষ্যত্ব। সেই প্রথম আমি বিদ্রোহ করতে শিখলাম। বাবাকে আমি দোষ দিতে পারি না। আর আমার সময় নেই। তোমার জন্যে বসে' বসে' অনেক সময় আমার চলে' গেছে। আরেকটু

দেরি করলে হয় তো দেখা হ'ত না। যোগাড়-যন্ত্র এখনো অনেক বাকি আছে।

অশ্রু বললে—প্যাসেজ জোটালি কী করে'?

—সে জুটে যায় দিদি। আমি যে খালাসী সেজেছি। একবার যেতে পারলেই হ'ল—তারপরে আমাকে পায় কে। সময় নেই দিদি।

অশ্রু নীরবে তিন্নুর ললাটে চুম্বন করলে, বললে—তোর জন্যে উদ্বেগের আমার অন্ত থাকবে না, তিন্নু।

আকাশে রঙের মতো তিন্নুর মুখে হাসি লেগেই আছে। তিন্নু দরজার দিকে দু'পা এগিয়েছিল, থামলো। বললে—আমার জন্যে বৃথা উদ্বেগ করে' মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে' কিছুই লাভ হ'বে না। যে-পথে আমি চলেছি, বেগে চলেছি, পিছে তাকিয়ে দেখবার সময় নেই। উদ্বেগ না করে' আশীর্বাদ করো। বলে' তিন্নু অন্তর্হিত হ'লো।

বুকটা খালি হ'য়ে গেছে। তিন্নু! কী আশ্চর্য চক্ষু। ঐ চোখ কার ছিলো মনে করতে পারছি না,—স্বপ্ন আর বিদ্যুৎ—শেলির ছিলো হয় তো। সমুদ্র উত্তীর্ণ হবে বলে' এতো আনন্দ, যেন একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি। ও-ও গৃহছাড়া! 'বাবার দোষ নেই', মহত্ত্ব,—ও ঘর ছেড়ে আকাশকে পেয়েছে—অগাধ, বিস্তীর্ণ! কোথায় গেলো ছুটে'। পথে আবার কোনো দুর্ঘটনা না হয়, স্বচ্ছন্দে যেন সাগরে দুলতে পারে। তিন্নু কত সুন্দর হয়েছে—কী বলিষ্ঠ। ওর চোখের মাঝে বসে' মা

যেন হাসছেন! আশীর্বাদ করবো বই কি তিনু, সত্যোপলব্ধির জন্যে সক্রেটিস থেকে আজ পর্যন্ত যারা মরেছে তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত তোমাকে প্ররোচিত করুক। তুচ্ছ শাসনের কাছে তোমার সত্যকে লজ্জিত করো না,—হোক্ সে পিতা, হোক্ সে প্রভু, হোক্ সে ভগবান্! তোমার জন্যে উদ্বেগ করে' লাভ নেই—তুমি যদি তোমার সত্যের জন্যে মর-ও, আমি তোমার চিতায় ফুল দিয়ে আস্‌বো। সত্যকে আবিষ্কার কর্‌বার জন্যে তুমি সহস্র ভুলের মধ্য দিয়ে যাও, লক্ষ লাঞ্ছনার মধ্যে—সে-গৌরবে তুমি অমর হ'য়ে থাক্‌বে। তিনু, তিনু, তিনু। তোমার প্রশস্ত উন্নত কপাল, ঘন কুঞ্চিত চুল, বিস্ফারিত বুক, দৃঢ় দীর্ঘ বাহু, ঋজু দেহ যেন ঊর্ধ্বশিখা! চোখে বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন, চিবুকে তেজস্বিতা, দুই হাতে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা। তিনু।

অশ্রু সেকেণ্ড ক্লাশে মেয়েদের কাম্‌রাতেই উঠলো। টিকিট শেষ পর্যন্ত লাহোরের না কেটে দিল্লির কেটেছে। গাড়ি ছাড়বে রাত ন-দশটায়। মন্দের ভালো—গায়ের ওপর একটা পাতলা চাদর টেনে দিয়ে ঘুমুনো যাবে,—সকালবেলা ঝাঝায় পৌঁছুবার আগে ও হাই তুলছে না। এটার সঙ্গে আবার রেষ্টুরাণ্ট্ কার্ নেই, থাকলেও একা-একা খাওয়ায় আরাম নেই; ঝাঝা কিংবা কিউল-এ পৌঁছে প্ল্যাটফর্ম থেকে চার-পয়সা-দামে এক পেয়ালা পান্‌সে চা খেলে ওর আর জাত যাবে না। একটা বই কিন্‌বে এড্‌গার ওয়ালেস্‌-এর? এই ষ্টলে যে মারি ষ্টোপ্‌স্‌ও পাওয়া যায়। ট্রেনে বসে' বই পড়ার মতো ন্যাকামি নেই; তার চেয়ে বাসর-ঘরে বরের গান গাওয়া বরং সহ্য করা চলে। গাড়িটা ছেড়ে দিলেই একটা নতুন জগতে এসে পড়্‌বে; গীতায় মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা আছে তারই একটা লৌকিক উদাহরণ! বাথ্-রুমে যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে ত'? স্নান করতে না পারলে মরে'ই যাবে অশ্রু। একটা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে উঠলো। একা যাচ্ছে বুঝি। ওর সঙ্গে আলাপ করা যাবে—বর্দ্ধমানের বেশি নয় কিন্তু! মেয়েটি মোজা পরেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ পরেছে—বাঁচা গেলো। মাঝের বার্থটা কিন্তু খালি রইলো। রাত্রে শীত করলে ওটায় না হয় উঠে আসবে—তার জন্যে জানালাগুলো ও কিছুতেই তুলে দিতে পার্‌বে না।

—ঘণ্টা দিয়েছে, উঠে পড় অশ্রু। দিলদারনগরে পৌঁছেই চিঠি দিয়ো কিন্তু। আমার আপিসের মর্জি বুঝে এলাহাবাদ যাবার দিন ঠিক করা যাবে। জান্‌লা দিয়ে মুখ বার করে' থেকো না যেন। (স্বল্প হাসি)

—আর তুমি সাবধান হ'য়ে বাড়ি যেয়ো। বাস্‌-এর জান্‌লা দিয়ে হাত বা'র করে' রেখো না, সেদিন কাগজে পড়লাম কা'র কনুই গেছে থেঁৎলে। (স্বল্প হাসি)

অশ্রু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে, প্রভাত তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলো।

অশ্রু। কীট্‌সের হাত ধরে' কোলরিজ তো মৃত্যুর স্পর্শ পেয়েছিলো। আমার হাত ধরে' তুমি কী স্পর্শ করছো? (স্বল্প হাসি)

প্রভাত। মুক্তি। (স্তব্ধতা)

বিচ্ছেদে গভীর বেদনা আছে,—এমন বেদনা যে, যেন কে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিচ্ছে- তবু ট্রেন চলে গেলে ট্রেনের ফাঁকা লাইন দু'টোর মতোই মনে জাগে মুক্তি, উপশম। যেন একটা নিদারুণ উদ্বেগ থেকে বাঁচলাম, উৎকণ্ঠা গেলো ঘুচে'। না আছে দ্বৈততা, না বা দ্বিধা। বেশ একটা নিশ্চিন্ত অবস্থা,—পীড়াবসানে সামান্য একটু দুর্বলতা মাত্র। যাই বলো, পরিচিত জগতে ঔজ্জ্বল্য নাই থাক, অন্ধকারস্নিগ্ধ একটি জাদু আছে—মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। চেনা জায়গায় সহজে হাত-পা ছড়াতে পারি, হোঁচট্ খেতে হয় না,- সে-জায়গার চারপাশে খোদ্‌নই। প্রেমের পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায়, স্থান সেখানে এতো সংকীর্ণ যে দু'জনকে স্পর্শ না করে' দাঁড়ানো যায় না। একটু এ দিক ও-দিক হ'লেই সেই উঁচু চূড়া থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে হ'বে, তারপর সে-চোট্ সয়ে' সুস্থ হ'য়ে ফের নিজের পুরোনো জায়গাটুকুতে আর ফিরে যাওয়া যায় না, জীবনে দেখা দেয় পক্ষাঘাত। ঐ পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তেই পতনের আশঙ্কায় পীড়িত আর্ত হ'য়ে থাকাটা

প্রাণের একটা আদর্শবৃত্তি নয়। তার চেয়ে নিরীহ অনলঙ্কৃত সমতল জায়গাটি বেশি কমনীয়। স্বস্তি ভালো সুখের চেয়ে। আমার চেনা জগতে স্তব্ধতা; প্রেমের জগৎ প্রগল্ভ,—তাই আসে শ্রান্তি। প্রেমের জীবন একটা নিয়মাতিরিক্ত অস্বাভাবিক জীবন। প্রেম ক্ষণস্থায়ী বলে'ই তার এত প্রশংসা। প্রেম অবিনশ্বর হয়নি বলে'ই জীবনধারণে মাধুর্য আছে।

এই অবসাদটুকু ভারি আরামদায়ক।

দিলদারনগর

বন্ধু,

স্টেশনে নেমে দেখলাম স্বয়ং নগেনবাবুই উপস্থিত আছেন। খুব সমারোহ করে' অভ্যর্থনা করলেন—এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন যে কুণ্ঠিত হ'তে হ'ল। অথচ লোকটি বেশ। ভদ্রলোক বললে সব মিলিয়ে আমাদের মনে যে একটি সৌম্য শান্ত ও বিনয়স্নিগ্ধ চেহারা মনে পড়ে নগেনবাবু তার এক চুল ফারাক নয়। আমার আসার টেলি পেয়ে তিনি যেন হাতের মুঠোয় চাঁদ পেয়েছেন। উপমাটা সেকেলে বলে'ই কথার আন্তরিকতা নষ্ট হয়েছে, ভেবো না। তাঁদের বাড়িতে আমি পদার্পণ করব—এতো বড়ো সৌভাগ্যের বর তিনি পরজন্মেও নাকি চাইতে সাহস করতেন না। লোকটি বেশ অমায়িক; সম্পর্কের সুবিধা পেয়ে আমার সঙ্গে অসংকোচে আলাপ করতে পারছেন। আমার মন্দ লাগেনি।

একাই আমার পছন্দ হ'ল—দড়ির একা। জিনিস-পত্রগুলো আরেকটা এক্কায় বোঝাই হ'ল। নগেনবাবু যত দূর সম্ভব সংকুচিত হ'য়ে বসলেন, বললেন: হঠাৎ গরিবদের ঘরে?

বললাম: আশার মধ্যে আনন্দ নেই বরং ক্লান্তি আছে; যদি আনন্দ থাকে তবে আকস্মিকতায়। এবং সে-আনন্দ উভয়ত।

নগেনবাবু সসম্ভ্রমে বললেন: কিন্তু এই হতচ্ছাড়া দেশ কি তোমার ভালো লাগবে? (নগেনবাবু আমাকে আপনি বলে' সম্বোধন করলে ভালো লাগতো না—প্রথমত তিনি বয়সে আমার ঢের বড়ো, দ্বিতীয়ত সম্পর্কের মর্যাদা তাঁকে দেওয়া উচিত।)

বললাম: দেশ দেখতে যে অন্তত এখেনে আসিনি সেটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। এসেছি আপনাদের দেখতে। পুষি-দির সঙ্গে শেষ দেখা প্রায় ন'-বছর আগে—যে-বার ওর প্রথম ছেলে হয়। পুষি-দিকে দেখবার

জন্যে মনটা আইঢাই করছে। ওর সঙ্গে ছেলেবেলাটা আমার কী ফুর্তিতেই যে কেটেছে। এক দিনের একটা মজার গল্প শুনে রাখুন। গল্পটা বল্‌ব মনে করে'ই আগে থেকে এক চোট হেসে নিলাম। যারা হাসির গল্প নিজে গম্ভীর থেকে বলতে পারে না তাদের তুলনা হয় ঠিক সেই জাতীয় কবির সঙ্গে, যারা কবিতা লিখবার অবকাশে অন্যকে ছন্দ বা শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। হাসি থামিয়ে গল্পটা ফের বলবার আয়োজন করছি, নগেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে মুখ আমার শুকিয়ে গেলো। স্ত্রীর শৈশবকালের এমন একটা গল্প শুনবার কৌতূহল দমন করে' নগেনবাবু তাঁর মুখের চেহারাকে হঠাৎ এমন নিরুৎসাহ করে' তুলেছেন দেখে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। মুখের সামান্য একটি রেখায় আবহাওয়া গেল বদলে। নগেনবাবু কিছু একটা বল্‌বেন ই, তার প্রত্যাশায় চুপ করে' রইলাম।

স্টেশন থেকে গাড়ি অনেকটা পথ এসে গেছে, কিন্তু বেলা তখনো দূরে। কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব পাতলা করবার চেষ্টা করে' নগেনবাবু বললেন: আমার তৃতীয় ছেলেটি মৃত্যু-শয্যায়—

শুনে' পরম ব্যথায় চম্‌কে উঠলাম। খবরটা যেন তেমন কিছু অসাধারণ নয় এমনি ভাবে নগেনবাবু এই বেদনাদায়ক সংবাদটা আমাকে জানালেন, কিন্তু তাঁর ঐ কষ্টকল্পিত cynicism আমার ভালো লাগলো না। এতক্ষণ এই ভীষণ খবরটা গোপন করে' আমার কৃত্রিম সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে তিনি এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন বলে' আমার মন অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠলো। আমার এই হাসি-খুসি ও আনন্দকোলাহলের মাঝে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়লে পাছে আমি বিরক্ত,—হ্যাঁ, বিরক্ত হই—সেই ভয়ে তিনি এমন একটা খবর প্রকাশ করেন নি। ছেলেকে মৃত্যু-শয্যায় রেখে আমাকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন।

বললাম : বলেন কি ? কী অসুখ ? অবস্থা কি খুবই খারাপ ?

আমার গলায় সহানুভূতির আমেজ পেয়ে নগেনবাবুর গলা এবার অনায়াসে ভারি হ'য়ে উঠলো : ডবল নিমুনিয়া। কাল রাত্রেই যাচ্ছিল, আজকের দিনটুকু আর যাবে না হয়তো। গিয়ে দেখি কি না সন্দেহ।

চিন্তিত হ'বার কারণ ঘটলো। এক সঙ্গে কত চিন্তা যে মনে ভিড় করে এলো তার ইয়ত্তা নেই। আমার চিন্তার সূত্র অনুসরণ করতে না পেরে নগেনবাবু বললেন : বাড়িতে উঠলে তোমার অনেক অসুবিধে হ'বে। এমন জায়গা, একটা ডাক বাংলো পর্যন্ত নেই। বক্সারে যেতে পারো, ডাউন ট্রেন কাছাকাছিই আছে। ফিরবে নাকি ?

কঠিন হ'য়ে বললাম : আপনি পাগল হয়েছেন ?

দেখ দেখি আমার সম্বন্ধে লোকের কী অন্যায় ভুল ধারনা। আমি ভালো শাড়ী পরি বলে' যেন ধুলোর ওপর বস্‌তে পারবো না। এই নিয়ে তর্ক করে' কোনো লাভ হ'ত না, যে-তর্কের major premiseগুলো প্রমাণ সাপেক্ষ নয়, সে-তর্কে আমি সাধারণত চুপ করে' থাকতেই ভালোবাসি। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ বড়ো—এটা আমার কাছে উপদেশ মাত্র নয়—এটা আমি কায়মনোবাক্যে মান্‌তে চাই। দেখ, মানুষের অন্তর্দৃষ্টি কত কম, তার সব বিচার নির্ভর করে বাইরে মার্কার ওপর। আমার বাবা পুরুষদের বড়ো চুল রাখা দু'চোখে দেখতে পারেন না। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বাবার দেখা হ'লে বাবা তাঁকে যে কী বলে' সম্বর্দ্ধনা করতেন ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। মানুষের অন্তরের পরিচয় পেতে হ'লে গুপ্তচরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে আত্মার অনুধাবন করতে হয়—কার বা তত সময় ও ধৈর্য আছে বল। একটা সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি না আসতে পারলে মনের অসাম্য অবস্থাটা আমাদের পীড়া দেয়। তাই তুমি দেখ্‌তে পাবে আমাদের দেশের বেশির

ভাগ বাঙলা নভেলই এই ভুল-বোঝাকে কেন্দ্র করে' বেড়ে উঠেছে ওটা একটা নেহাৎ শস্তা চালাকি। যেমন ধরো শরৎ চাটুজ্জে। তাঁর যে বইগুলো উৎরেছে সবগুলিতে এই ভুল-বোঝার ঘোর-প্যাঁচের জটিলতা এত বেশি যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে বলে' ভালো লাগে। আমরা পরস্পরকে প্রকাশ্যে সন্দেহ করি, করি অবিশ্বাস ও অবহেলা; কিন্তু নিভৃতে বসে' একে-অন্যের কথা ভেবে প্রেমবিগলিত হ'য়ে কাঁদি আর কপাল কুটি—এই দৃশ্য দেখ্‌লে আমি পড়তে পড়তে পর্যন্ত উচ্চহাস্য না করে' থাকতে পারি না। ভাবি: লোকগুলি কী ভীষণ বোকা। এই জন্যেই দেশ আমাদের এগোচ্ছে না। সাম্‌না-সাম্‌নি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা কয়ে' দু' মিনিটে যার মীমাংসা হয় তাকে এমনি করে' অনাবশ্যক ঘোরালো করে' তোলায় আমাদের আয়ুক্ষয় হয় না? ভুল-ও বুঝবো, ভাল-ও বাসবো, এ কী অত্যাচার! তুমি বল্‌বে এটাই স্বাভাবিক চিত্ত-বৃত্তি। আমি এটা মানি না, তোমার সেই বৃত্তিকে শাসন করতে হ'বে। স্পষ্টতা থাকবে না কেন, কেন থাকবে না সাহস? যাচাই করবো না অথচ যা চাই তা না পেলে গাল ফুলাবো—এই 'ছিঁচ কাঁদুনে নাকে-ঘা' স্বভাব আমাদের যাবে কবে? জীবনে যা ঘটে তাই আর্টে ঘটাতে হ'বে এই সাহিত্যধর্মে যদি তুমি বিশ্বাসবান্ হওই, তবে তোমাকেও বলি আর্টে এমন অনেক জিনিস real হ'তে বাধ্য যা জীবন কোনদিন প্রত্যক্ষই করে নি। যেমন ধরো কথোপকথন। মানো ত?

অতএব, তুমি বুঝতেই পাচ্ছ, এম্‌নি সব আজগুবি চিন্তায় ব্যাপৃত হ'য়ে বাকি রাস্তাটা নগেনবাবুর সঙ্গে আর কোনো কথা হ'ল না। আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে যেখানে এসে এক্কাটা দাঁড়ালো, দেখে বিশ্বাস হচ্ছিলো না,—শুন্‌লাম সেটাই নগেনবাবুর বাসা। আস্তাবলে সহিসদের মাচা করে' শুতে দেখেছি, কিন্তু নগেনবাবুর বাসায় মাচাবো

বালাই নেই। সব সমতল। এত অপরিষ্কার তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বীভৎস রস বলে' একটা রস আছে, ঐ রস নিয়ে আমাদের দেশে কোনো লেখকই চর্চা করেন না দেখে আমার কষ্ট হয়। একমাত্র করুণ রসই বাঙ্‌লা দেশে কাটে—এটা নরম মাটির দোষ। যদি পরকে কাঁদাবে আশা করে' লেখায় নিজে খানিকটা কাঁদ্‌তে পারো তো বাঙ্‌লা দেশে সেই সাহিত্য তোমার সফল রচনা হ'ল। গল্পের ফর্ম বা টেক্‌নিকের জন্যে নয়—কান্নার কাদা থাক্‌লেই তার দাম হ'বে। দেশের চরিত্রগুলো স্যাঁৎসেতে, খট্‌খটে নয়। কিন্তু, সত্যি বলছি, যদি কেউ আন্তরিক অনুভব করে' পুষিদির এই বাসা নিয়ে কবিতা লেখে, খাঁটি বীভৎস রস সে নিশ্চয়ই জমাতে পার্‌বে, এবং সেটা রসসৃষ্টি হিসেবে পিছিয়ে থাকবে না।

ছোট্ট বাসা, তিনটে ঘর—টিনের চাল, ভেতরে একটুখানি উঠোন। তিনটি ঘর ভরে' কিলবিল করবার জন্যে বিধাতা যেমন পুষিদির কোলে ছ'টি সন্তান দিয়েছেন তেমনি উঠোন ভরে' দিয়েছেন আগাছা। যেখানেই পা দেবে পায়ের ধুলো নিতে কোনো অনুগত ভক্তই সেখানে দাঁড়াবে না, ছুটে পালাবে। যে ঘরটাতে এসে আমি প্রথম দাঁড়ালাম সে-ঘরটার অবিকল বর্ণনা দিতে পারলে তোমাদের দলীয় অনেক সাহিত্যিককেই আমার তাঁবেদারি করতে হ'ত। মেঝেটা মাটির, তার ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে পুষি-দি বসে' আছে, কোলে মুমূর্ষু সন্তান,—ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর কয়েক মাস হ'বে, চার পাশে স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতা। কতকগুলি ময়লা কাপড়, ময়লা বিছানা (তোলা হয় নি), কতগুলি থালা-বাটি (মাজা হয় নি), কতগুলি অর্ধনগ্ন ছেলে-পিলে (তারস্বরে চেঁচাচ্ছে)। পুষি-দির চেহারা কি রকম ধস্‌কে গেছে, নগেনবাবু কিন্তু যেমন মস্ত, তেমনি মজবুৎ) ওর দিকে চেয়ে আমার

ভারি করুণা হ'লে। ওকে নিচু হ'য়ে প্রণাম ক'রে ওর পাশে বসে' পড়লাম। পুষি-দির দু' চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুরেখা নেমে এসেছে। ওর ছেলের শরীরে একটু হাতবুলিয়ে বললাম : ডাক্তার দেখে কি বল্‌ছে ?

পুষি-দি ছেলের মুখের ওপর নির্নিমেষ দৃষ্টি রেখে বললে : আর ডাক্তার! দেখছিস না কেমন করছে। বাছাকে আর রাখতে পারলাম না!—পুষি-দির বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

নিজেকে যে কী অসহায় লাগতে লাগলো তুমি বুঝে নিয়ো। সেই ঘরের চেহারা দেখে কাকে অভিশাপ দেবো ঠিক করতে পারলাম না। রোদের পানে তাকানো যায় না, অথচ এত বেলা পর্যন্ত ছেলেপিলে-গুলির না হয়েছে স্নান, না বা খাওয়া। সকালবেলা যা ক'টি মুড়ি খেয়েছিলো তারো জায়গাগুলো এখনো ধোয়া হয়নি। নগেনবাবুর ছোট ভাই-এর বৌ এইখেনেই আছে—সেই তদারক করছে, কিন্তু একা মানুষ পেরে উঠছে না। মেয়েটি আনাড়ি; ভাসুর বর্তমান বলে' ব্রীড়াবনতমুখী—মাথার ওপরে ঘোমটা তার সব সময়েই আনমিত। সংসার সাম্‌লানো তার কাজ নয়। পুষি-দি ছেলে কোলে করে তিন দিন ধরে' বসে' আছে, মমতার খুব বড় নিদর্শন হ'লেও এটা স্বাস্থ্যকরতার বড়ো লক্ষণ বলে' মান্‌তে পারলাম না। কিন্তু পুষি-দিকে সে কথা বল্‌তে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা আর কিছু হ'তে পারে না। দুঃখের এত নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আমি আগে আর কোথাও দেখেনি। মুমূর্ষু ছেলেকে কোলে নিয়ে পুষি-দির শংকাকুল পীড়িত মুখের তুলনা দিতে পারি, আমার হাতে বাঙ্‌লা ভাষা আজো তত শক্তিমান হ'য়ে ওঠেনি। এমন নিদারুণ নিঃসহায়তার ছবি আর নেই।

আমার মতো অপরিচিত আগন্তুককে দেখেই ছেলেমেয়েগুলো কান্না থামিয়ে দম নেবার চেষ্টা করছিল, ওদের চোখে আমার আবির্ভাবটা

পরম বিস্ময়কর, ওদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমি মোটেই খাপ খাচ্ছি না বলে' ওরা কান্না থামিয়ে আমাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এমন কাঙাল হতচ্ছাড়া চেহারা দেখে আমার বরাবর ঘৃণাই হয়েছে, ছেলেবেলায় তিনুর কানে একবার পূঁয হয়েছিলো বলে' তিনুকে আমি কতদিন ছুঁইনি (ভাবতে পারো—তিনুকে ?), কিন্তু ওদের প্রতি কখন যে বুকে স্নেহ সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে—টের পেলাম না। ওদের আত্মীয় করবার জন্যে ওদের দিকে এগোব ভাবছি এমন সময় পূর্বোক্ত বউটি এসে সেই ঘরে কুণ্ঠিত হ'যে দাঁড়ালো। এতক্ষণে রান্না তার শেষ হয়েছে বুঝি—এবার ছেলেপিলেগুলোর গাত্রমার্জনা হ'বে। বৌটি আসতেই নগেনবাবু (তিনি এতক্ষণ একটা চেয়ারে অবসন্ন হ'য়ে বসেছিলেন) তাকে লক্ষ্য করে' বললেন: ওদের পরে হবে'খন। তুমি আগে অশ্রুর স্নানের বন্দোবস্ত করে' দাও। রান্না হয়েছে কিছু? (বৌটি আস্তে মাথাটি একটু নামিয়ে সম্মতিসূচক সঙ্কেত করলে) তা হ'লে, গরিবের ঘরে য হয়েছে তাই চারটি বেড়ে দাও ওকে। কলকাতা থেকে আসছে, নিশ্চয়ই খুব tired, না অশ্রু?

তোমাদের পুরুষদের এই একটা প্রবল দোষ মেয়েদের হিতসাধনের বেলায় তোমাদের সীমাজ্ঞান থাকে না। নগেনবাবুর এই অতিশয়োক্তি আমার কাছে এত অন্যায্য মনে হ'ল যে দস্তুরমতো অপমানিত বোধ করলাম। এতগুলি অভুক্ত আর্ত শিশুকে ফেলে আমার কাল্পনিক শ্রান্তি লাঘবের জন্যে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, তাঁর এই আতিথ্যের দৃষ্টান্ত এ-যুগে অচল। অতিথির তৃপ্তির জন্যে কর্ণের যুগে পুত্রহত্যার পুরস্কার মিলতো, অর্থাৎ মরা ছেলে বেঁচে উঠতো ফের, কিন্তু এ-যুগে ছেলে একবার মরলে আর বাঁচে না—তাই অনাবশ্যক আতিথ্যের মূল্য দিয়ে ফতুর হবার ভদ্রতা আমাদের পোষায় কৈ। এ-যুগে এমন কতকগুলো

সুবিধে ছিলো যে হিংসে হয়। শিবিরাজা নিজের দেহমাংস আতিথির জন্যে অনায়াসে কাটতে লাগলেন, তাতেও ওজনে তার সমান হ'ল না বলে' নিজে তুলাদণ্ডে আরোহণ করতে দ্বিরুক্তি করলেন না—জয়-জয়কার পড়ে' গেল, এমন আত্মদান আর দেখা যায় নি; কিন্তু মজা এই যে, অতিথি শুধু-অতিথি নয়, ছদ্মবেশী ইন্দ্র। যখনই এমনি একটা মহৎ অভিনয় হয়েছে—তখুনিই দেখতে পাবে পরীক্ষাকর্তারা আগে থেকেই ছদ্মবেশী হ'য়ে এসেছেন; নইলে যেন অমন একটা ত্যাগের মর্যাদা হয় না—তাকে পুরস্কৃত করতেই হ'বে ভেবে দেবতাদের আগে থেকে পরামর্শ চল্‌ছিল। সে-যুগে ত্যাগ বা আতিথেয়তাটাই বড়ো ছিল না, বড়ো ছিল তার পুরস্কারের লোভটা। সে জন্যে সে-যুগের ত্যাগের কথা পড়ে' হাত-তালি দিতে হাত ওঠে না। বৃষকেতুকে কর্ণ যখন স্বহস্তে বধ করলে—মান্‌লাম সেটা একটা বড়ো রকমের অতিথি-পরায়ণতা—কিন্তু পেটুক বামুনটা কেন দেবতা হ'য়ে দেখা দিলো? বৃষকেতু ফের বেঁচে উঠলো বলে'ই কি কর্ণের আতিথেয়তাটা জোলো হ'য়ে গেলো না? এই জন্যেই ত' সন্দেহ হয় যে কর্ণও আগে থেকে জান্‌ত বৃষকেতু তার নিজের মাংসই খেতে বসবে। আমাদের ত্যাগ ঐ বাজে ঠুন্‌কো ত্যাগের তুলনায় কত মহনীয়—আমরা ঘুণাক্ষরেও আশা করি না যে আমাদের বেলায় নিষ্ঠুর অতিথি প্রেমিক দেবতা হ'য়ে উঠ্‌বেন। যা আমরা হারাই হাসিমুখেই হারাই, ফিরে পাবার লোভ রেখে সে মহান্ ক্ষতিকে আমরা কলুষিত করি না। এমন কি পরজন্মে এ-ক্ষতির পূরণ হ'তে পারে এমন একটা সামান্য ইচ্ছাকে পর্যন্ত লালন করতে আমাদের ঘৃণা বোধ হয়! আমাদের ভাগ্যের ছদ্মবেশ নয়, সে নগ্ন নৃশংস—আমরা জানি সে-ভাগ্য চেহারা বদ্‌লে এসে বর দিয়ে আমাদের আত্মদানের অমর্যাদা করবে না। এবং তা জেনেই আমরা আত্মোৎসর্গ করতে অকুণ্ঠিত থাকি।

নগেনবাবুর কথার কোনো প্রতিবাদ না করে' আমি পুষি-দির ছেলে-মেয়েদেব নিয়ে পড়লাম। ওরা প্রথমে কেউ ভয় পেলো, কিন্তু আমার বাক্সে যে একটা বিস্কুটের টিন্ আছে তা বের করে' ওদের বন্ধুতা কিনে নিতে আমার দেরি হ'ল না। তুমি বল্‌লে বিশ্বাস কববে, আঁচলটা বুকের ওপর বিস্তৃত না রেখে দড়ির মতো পাকিয়ে কোমরে বেঁধে নিলাম, খুলে ফেল্‌লাম জুতো; ছেলেমেয়েদের কুয়োর ধাবে নিয়ে গিয়ে বাক্স থেকে সাবান বার ক'রে স্নান করাতে বস্‌লাম। বউটি নিজে জল তুলে দিতে এসেছিলো, বললাম: তুমি ততক্ষণ ঘরগুলো নিকোও, আমি এ-সব একাই পার্‌বো। স্নান কর্‌তে কর্‌তে ছেলেমেয়েদেব কলরবের আর বিরাম নেই, কে আগে স্নান কর্‌বে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগেছে—তাদের কত দিনকার কত ছোট-খাটো ইতিহাস – দুঃখের ও সুখের—টুক্‌রো-টুক্‌বো করে' আমাকে শুন্‌তে হ'ল, আমি ওদের রাঙা-মাসি হ'য়েও এতদিন বিস্কুটের টিন্ ও সাবান নিয়ে আসিনি কেন এটা ওদের একটা বড়ো নালিশ। একজনের কথায় বেশিক্ষণ মনোযোগ দিয়ে অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখাবাব সাধ্য নেই, বাকি হাতগুলি আমার চিবুক ধরে' টেনে তাদেব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার জন্যে সচেষ্ট হ'যে আছে। স্নান করিয়ে একটা বড়ো থালার চারধারে ওদের বসিয়ে নিজেই ওদের খাইয়ে দিতে লাগলাম। বৌটিই পরিবেষণ কর্বছিলো। আমি যে অন্নবণ্টনব্যাপারে মোটেই সমদর্শী নই—প্রত্যেকের মুখেই এই অভিযোগ। রাত্রে ঠিক আমার পাশটিতে কে শোবে তাই নিয়ে ওরা ঘরোয়া বিবাদ সুরু করে' দিলো; ওরা দুষ্টুমি করলেও ওদের মা'র মতো আমি প্রহার করব না এই অভয় পেয়ে ওরা উঠ্‌লো লাফিয়ে। খাইয়ে দাইয়ে মিষ্টি করে' বললাম: তোমরা এবার চুপটি করে' ঘুমোও গে; কাকিমা ঐ বারান্দায় মাদুর পেতে দিয়েছেন।

গোলমাল চেঁচামেচি করো না, দেখছ না ভাইটির অসুখ করেছে, নগেনবাবু বললেন, আমি নাকি জাদু জানি—সবাই সুড়সুড় করে' মাদুরে গিয়ে শুল! শিয়রে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পাখা করলাম' (আমার পাখা-চালানোও পক্ষপাতিত্বহীন নয়) ওদের ঘুমুতে দেরি হ'ল না। সব চেয়ে ছোট মেয়েটির বয়েস এগার মাস; বউটিই তাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে।

পুষি-দিকে গিয়ে বললাম: এবার তুমি ওঠ, তিন দিন তোমার স্নান নেই, খাওয়া নেই। ছেলেকে আমার কোলে দাও, তুমি এই ফাঁকে মাথায় একটু জল দিয়ে মুখে দুটো গুঁজে এস গে।

পুষি-দি এমন আবিষ্ট হ'যে আমার দিকে তাকালো যে বি এ পাশ করে' ও এত কলঙ্কভাগিনী হ'য়ে আমার এমন একটা কথা বলবার কথা নয়। নাক সিঁটকে বরং 'বক্সার ফিরে যাচ্ছি' বলে' সেজে-গুঁজে এক্কায় গিয়ে উঠলেই আমাকে মানাতো। তা ছেড়ে, এ কী রূপ! যে-চালের শাড়িটা পরেছিলাম কাদায় আর জলে তা সপসপ করছে; মাথার খোঁপাটার আর ইজ্জত নেই। আমার সম্বন্ধে এরা যতো ধারণা করেছিল তার সঙ্গে মিল রাখতে পারছি না বলে' ওদের হতাশ করলাম যা হোক্।

পুষি-দি কিছুতেই ছেলে ছেড়ে উঠ্‌বে না, যেন এমনি করে' ধরে' রাখলেই ওকে রাখা যাবে। শেষে অনুনয় করে', পায়ে ধ'রে, শাসিয়ে, ধমকে পুষি-দিকে স্নান করতে পাঠালাম। আর ওর মুমূর্ষু সন্তানটিকে আমিই কোলে নিয়ে বস্‌লাম। এত সন্তর্পণে এত স্নেহে কোনো জিনিস ছুঁয়েছি বলে' মনে হ'ল না। নির্মল করতলটি মমতায় কোমল করে' ওর কপালের ওপর রাখলাম—জ্বরে পুড়ে' যাচ্ছে। হাত পা ঠাণ্ডা,—নিশ্বাসের জন্যে কসরৎ করে' ওর ক্ষীণ কঙ্কাল-কল্প দেহটা

বারে বারে সংকুচিত হচ্ছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে পৃথিবীর কোনো সুন্দর দৃশ্যের কথাই মনে করতে পারলাম না। কিন্তু পরে যখন কোনোদিন আবার সুন্দর দৃশ্যের মুখোমুখি হ'ব, তখন পুষি-দির এই ছেলের মৃত্যুর দুঃখটা ভুলেও মনে আন্‌বো না। বাস্তবিক আমাদের জীবনে যদি অতীতকাল বলে' কিছু থাকতো এবং যা আমরা ফেলে এসেছি তা যদি ভুলতে না পারতাম—অর্থাৎ পৃথিবী গোল না হ'য়ে চৌকোণ ও সমতল যদি হ'তো—অর্থাৎ কিছু-কিছু অদৃশ্য না থেকে সবই যদি থাকতো উন্মুক্ত, উদ্ঘাটিত—তা হ'লে আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর গতি ছিলো না।

দেখ, আমরা প্রাণী-হিসেবে বড় অসহায়। বিজ্ঞান দিয়ে সব জিনিস আমরা বুঝতে গেছি ব'লেই আমাদের মুস্কিল আরো বেড়েছে। মৃত্যু বুঝি, কিন্তু মৃত্যুর সার্থকতা বুঝি না। এখেনে আমাদের কোনো প্রতিকার নেই বলে' প্রতিবাদ করতে লজ্জা পাই। এতকাল বুদ্ধিমান থেকে মরবার বেলায় আমাদের অজ্ঞানতা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন প্রলাপ বকতে আমাদের সুখ হয়: ভোগ, ভাগ্য, ভগবান। আমরা এখেনে পশুরো অধম হ'য়ে গেছি। বুঝতে চাই অথচ বুঝতে পারি না বলে' আমাদের শোক তীব্রতর হ'য়ে ওঠে। সহজে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। দু'টি দিনের জন্যে এসে এই শরীর নিয়ে এত টানা-হেঁচড়া, এত উদ্বেগ, এত গ্লানি—দন্তশূল থেকে সুরু করে' মৃত্যুশেল - তবু আমাদের কবিতা লিখতে হয়, প্রেম না করলে পৃথিবী পবিত্র হয় না। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, প্রকৃতির রাজ্যে কোনো একটা শৃঙ্খলা নেই, নীতি নেই -ইচ্ছে মতো অর্ডিন্যান্স জারি করে'ই ত'ার রাজত্ব চলেছে। যৌবন কখন আসবে প্রকৃতি তার একটা সময় নির্ধারিত করে' দিয়েছে, মৃত্যুর বেলায় তার এই অব্যবস্থা কেন? বিয়ে করে' যৌবন

প্রমাণিত করবার আগে আমরা কেমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সংসারের দায়িত্ব ও কলুষ থেকে আত্মরক্ষা করে' আনন্দ পাই ; তেমনি এমন যদি একটা তারিখ থাকতো যার আগে প্রকৃতি মৃত্যুবাণ হান্‌বে না, তা হ'লে আমরা পৃথিবীর চেহারা দু'দিনে বদলে দিতে পারতাম। তুমি হয় তো বলবে আমরা এত স্বল্পায়ু যে আমরা চিরজীবিনী প্রকৃতির নীতির বিচার কি ক'রে করব ? প্রকৃতি কোটি কোটি বৎসর পরেও তাঁর ভুল সংশোধন করলে তাঁর আয়ুর অনুপাতে সেটাকে অতি-বিলম্বিত বলে' নিন্দিত করতে পারবো না। আমরা আমাদের মূর্খতার নানারকম হেতুবাদ বা'র করে' ফেলেছি। নইলে টিকতাম কি করে' ?

আমি গল্প-লিখিয়ে হিসেবে একজন কাঁচা আর্টিস্ট বলে' তোমাকে আগেই বুঝতে দিয়েছি যে পুসি-দির ছেলেটি নেই, কিন্তু অত সহজে তোমাকে বুঝতে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। তুমি অনেক মৃত্যু দেখেছ—তোমার দুটি বোন একসঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে মারা গেছ্‌ল—মৃত্যুর খবরে তুমি হয় ত' আর চঞ্চল হও না, ওটা তোমার কাছে হয় ত' বাজার-দরের মতোই একটা বাজে খবর। কিন্তু এমন প্রত্যক্ষ ও পরিষ্কার করে' কোনো মৃত্যু আমি দেখিনি, অনুভবও করি নি। আমার জীবনে একমাত্র মা'র মৃত্যুর বেদনা আছে, তবে মা যখন মারা যান আমি তখন ময়মনসিংহে বিদ্যাময়ী বোর্ডিং এ ঘুমুচ্ছি। সে-দিনের কান্নায় আমার তীব্রতা ছিল, কিন্তু মনে হয় প্রাণ ছিলো না। শিশুর মৃত্যুর চে'য় করুণ কিছু কল্পনা করা যায় বলে' ভাবা আমার দুঃসাধ্য।

ঘড়ি থাকলে দেখতে পেতাম স্নান করে' খেয়ে নিতে পুষি-দির দু'মিনিটো লাগে নি। এই যে সামান্য সময়টুকু দূরে রয়েছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই যমের পেয়াদাগুলো ভিড় করে' এসেছে— মাকে দেখেই বোধ

হয় সসম্ভ্রমে এবার সরে' দাঁড়াবে। পুষি-দির কোলে ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে দু'হাতে তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেললাম। নগেনবাবু ও তাঁর ভাই ইতিমধ্যে আহার সেরে যথাক্রমে ডাক্তার ও শ্মশানবন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

বালতি তিনেক জল কোন রকমে মাথায় ঢেলে দু'টি মুখে তুলতে বউটির সঙ্গে এক পালে বসে' পড়লাম। সেই অত্যল্প কালের মধ্যে ভাব হ'য়ে গেলো এবং বি. এ. পাশ করে' ওর বরের বিষয় প্রশ্নাদি করছি দেখে বউটির খুসির আর শেষ রইলো না। বউটির নাম কালিদাসী। ভারি লাজুক, স্নিগ্ধ মেয়েটি। বর ছাড়া আর কোনো কথোপকথনের বিষয় নেই বলে' কাজে কাজেই সেখানেই আমার রসনাকে বসিয়ে নিতে হ'ল। বর্ণনাটা রূঢ় হ'লে ক্ষমা করো। কালিদাসীর বরের নাম খগেন্দ্রনাথ। দেখ, নাম সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা নতুন নিয়ম করা উচিত।

শৈশবাবস্থায় আমাদের মূক অসহায় পেয়ে বাপ মা যথেচ্ছাচারে আমাদের ওপর নামের এই জুলুম চালাবেন এটা অসহ্য। এবং সেই নামের বোঝা চিরকাল অম্লানমুখে বহন করে' আমাদের পিতৃভক্তি সাব্যস্ত করতে হ'বে। নামের মধ্যে মনস্তত্ত্ব আছে বলে' ফ্রয়েড কিছু লিখেছেন কি না জানি না, তবে খগেনবাবু যে চাকরি-বাকরি না করে' বসে' বসে' দাদার অন্নধ্বংস করছেন তার কারণ ওঁর বাপ মা ওকে খগু বলে' আদর করতেন বলে'। আমরা যখন বড়ো হ'য়ে চিন্তা করতে শিখি তখন আমাদের নামের উপযোগিতা পরীক্ষা করবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। গোত্র থেকে না-হয় আমাদের ত্রাণ নেই, কিন্তু জোর করে' চাপানো এই নামের দাসত্ব আমাদের চিরকাল করতে হ'বে—এতেই আমাদের দাস-মনোভাবের প্রথম সূচনা।

অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও খগেনবাবুর কথাটা সেরে নি। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেন নি, ভালো লাগতো না নাকি। ছেলেবেলা থেকে দাদার ছায়ায়ই বর্ধিত হয়েছেন। এ-পর্যন্ত এক পয়সাও রোজগার করেন নি, তবুও তাঁর বিয়ে করায় যে সমাজের পক্ষ থেকে একটা আপত্তি উঠতে পারে তা শোন্‌বার তার ধৈর্য ছিলো না। নির্মলের সমাজনীতি কিন্তু উল্টো রকমের। বেকার হয়েছে বলে' তার বিয়ে করার অধিকার লুপ্ত হ'বে এবং বেকার হয়েছে বলে' তার হাত দু'টো কাটা যাবে—এ দু'টো নিয়মই ওর কাছে সমান বর্বর। নির্মল বলে: খাওয়া যদি তার পাপ না হয়, ঘুমোনো যদি তার পাপ না হয়, বিয়ে করাও তার পাপ হবে না। উত্তরে বলেছিলাম: এই জন্যেই পাপ হ'বে যে কতগুলি নির্দোষ ছেলে পিলে মারা যাবে। এর পরে নির্মল যা বলেছিলো তা একান্ত ছেলেমানুষি। বিষয়বস্তু ছেড়ে তর্ক যদি অবশেষে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তা হ'লে তাকে বাচালতা ছাড়া আর কি বলবো? বাড়িতে একটা টাইপ-রাইটার আছে, খগেনবাবু রোজ খান চারেক করে' আফিসে আফিসে দরখাস্ত পাঠান, লম্বা হ'য়ে ঘুমোন, আর গলা ছেড়ে গান ধরেন। কালিদাসীর যে দু'টি ছেলে পেটেই মারা গেছে সে লজ্জাটিও সে গোপন করতে পারলো না। মারা তারা যেতোই; নির্মল হ'লে বলতো: বড়ো লোকের ছেলেরা বড়ো হ'য়েও মারা যায়। নির্মলের সঙ্গে এই জন্যে তর্ক করে' সুখ হয় না। ঢাল তরোয়াল না নিয়ে যুদ্ধে গিয়ে মুণ্ডটা দিয়ে আসাই ওর মতে প্রকাণ্ড adventure। ছেলেদের না খেতে দিয়ে না চিকিৎসা করে' মরতে দেওয়াটার কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। নির্মলের মতে সন্তান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মরলে আপশোষ থাকতো কেন য়্যালোপ্যাথি করালাম না, য়্যালোপ্যাথিতে গেলে আপশোষ থাকতো গলিতে এত বড়ো জলজ্যান্ত একটা

কবরেজ ছিল। ও সব ধোঁকা, ওর মধ্যে সত্য নেই। না খেতে পেয়ে মরাটা নাকি আমাদের কল্পনার আতিশয্য, খেয়ে পেট ফেঁপেও ঢের লোক মরে। বিয়ে করাটা ওর মতে শুধু সংস্কার নয়--আচরণীয় ধর্ম।

এই খগেনবাবুর সঙ্গে আমার পরে আলাপ হয়েছিলো,— সে-কথা পরে বলা যাবে। এখন পুষি-দির ঘরে ফের গিয়ে বসি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো, ছেলে-পিলেগুলো জেগে উঠে কেউ কান্না ও কেউ কলরব করে' বাড়ি মাথায় করবার যোগাড় করছিলো, আমি যে যাইনি তা দেখে আশ্বস্ত হ'য়ে ওরা মুখগুলিকে এমন নম্র ও কমনীয় করে' তুললো যে চুমু না খেয়ে পারলাম না। বিকেলে ওদের খাওয়া বলে' কোনো হাঙ্গাম নেই, বাড়ির সামনের মাঠে ওদের ছুটোছুটি করতে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের লুকোচুরি খেলায় কতক্ষণের জন্যে আমাকে বুড়ি হ'তে হ'ল। তোমাকে এত সব কথা খটিয়ে লিখছি তা'র কারণ আমি পুষি-দির সংসার দুই হাতে নিবিড় করে' স্পর্শ করে' একটা একটি পরম তৃপ্তি লাভ করেছি—হোক তা মৃত্যু দিয়ে বিক্ষত, দারিদ্র্যে মলিন, দুঃখে কলঙ্কিত।

এইটুকুন্ পড়ে' তোমার কি মনে হচ্ছে না আমি যদি পুষি দির অবস্থায় পড়্তাম, তো কী করতাম? হয় ত' এই রকম করে'ই মানিয়ে যেতে হ'তো। আমি কিন্তু এ-ঘরের বাইরে যখন বেরুতে পারো তখন এই দিনের স্মৃতিটা কী কুৎসিতই যে লাগবে। তবু আজকে পুষি-দির সংকীর্ণ সংসারের সীমায় ক'টি মুহূর্ত আবদ্ধ থেকেই সত্যিই হাঁপিয়ে উঠছি না।

হ্যাঁ, দেখ্তে দেখ্তে বিকেল হ'য়ে গেলো। ছেলেটি তখনো ধুক্‌ধুক্ করছে। রোগীর সেই বিভীষিকাময় স্তব্ধতার তুলনা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আসন্ন ঘটিকার উপমাটা

নেহাৎই অবাস্তব হ'বে। তারপর এলো কালো রাত্রি। মাঝখানের অনেকটা সময় মুছে' দিলাম, কেননা চিঠি তা হ'লে অত্যন্ত বড়ো হ'য়ে যাবে। ডাক্তার বলে' গিয়েছেন, আজ রাত্রে টিকেও যেতে পারে। পুষি-দিকে বললাম: এবার ওকে আমার কোলে দিয়ে তুমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর। পুষি-দির আপত্তি আমি শুনবো কেন? ছেলের গায়ের ওপর একখানি হাত রেখে পুষি-দি আমার কোল ঘেঁষে একটু শুল, এবং খানিক বাদেই টের পেলাম সে-হাত শিথিল হ'য়ে বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়েছে; বুঝলাম মৃত্যুকে পারলেও ঘুমকে ঠেকায় পুষি-দির সে-সাধ্য আর এখন নেই। নগেনবাবু বারন্দায় খানিক পাইচারি করে' একটা চেয়ারেই বসে' বসে' ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, খগেন-বাবু সস্ত্রীক দ্বার রুদ্ধ করে' তাঁর ঘরে অধিষ্ঠান করেছেন। কোনোদিন গভীর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছি বলে' মনে হয় না, কিন্তু মরন্ত ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুপ করে' বসে থাকতে-থাকতে আমার সত্যিই ভারি ভয় করতে লাগলো। মনে হ'ল মৃত্যুর একটা স্পষ্ট মূর্তি আছে, আর সে-মূর্তি মমতাময়ী মা'র মূর্তি নয়। আচ্ছা, বাঙলা সাহিত্যিকরা মৃত্যুবর্ণনা করতে এত কুণ্ঠিত কেন? সে-তেজ সে-কল্পনা তোমরা কবে লাভ করবে? তোমাদের মধ্যে নাকি একটা প্রবাদ আছে যে গল্পে নায়কের মৃত্যু হ'লেই সে গল্প জোলো, ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো। তোমরা নেহাৎই বাঙালি, ভিক্টর হিউগো-র টুপি ধরবারো তোমাদের যোগ্যতা নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের স্বপক্ষে এমন আরেকটা যুক্তি দেন যে আমার হাসি পায়। তাঁরা বলেন: সংসারে মৃত্যু তো আছেই, সাহিত্যে তাকে খুঁচিয়ে লাভ কী? সুখের ছবি এঁকে জীবনটাকে একটু রঙিন করে' নেওয়া যাক্। এর জবাবে যদি বলি: পৃথিবীতে ঢের লোকই ত' বেশ স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে, তাদের

নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করলেই বা কোন্ মোক্ষলাভ ঘটবে, তা হ'লে আমার এ-যুক্তিটা একই জাতের হবে নিশ্চয়। যা ঘটছে তা বলতে আমরা সর্বদা লুকিয়ে বেড়াই কেন? ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে কেন আমাদের এতো ভয়? আজ নগেনবাবু যদি মরতেন, তবে পুনি-দির সংসারে এই মৃত্যুটা কি একটা মহাকাব্যের কথাবস্তু হ'তে পারতো না? তোমাদের হাতে এমন বিষয়বস্তু পড়লে তোমরা নিশ্চয়ই আগ্রহ দেখাতে না। একটা প্রেমের গল্পের প্লট পেলেই তোমাদের কলমে সুড়সুড়ি ধরে।

খোকাকে কোলে নিয়ে বসে' থাকতে থাকতে আমার মনে হ'ল—এ আমারই ছেলে, আমারই জঠরে ওর জন্ম, আজ ওকে হারাতে বসেছি। ভাবতেই শরীরের সবগুলি শিরা-উপশিরা টন্‌টন্ করে' উঠলো। না না না—প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কি—আমি সন্তান চাইনে, অকারণ মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমি এই দণ্ড প্রচার করতে চাই। যৌবনোচ্ছ্বাস হ'তেই মেয়েরা শুনেছি নাকি মাতৃত্বের অভিলাষিণী হয়ে ওঠে—ওটা যদি সত্যি হয়, তবে ওটাকে যৌবনাবস্থার অন্যান্য কু অভ্যাসের মতই শাসন ও চিকিৎসা করা উচিত। তুমি মনে করো না (করছ না অবশ্যি) যে, আমি আমার মতগুলিকে অন্যের ঘাড়ে জোর করে' চাপিয়ে দিতে চাই, আমি তত বড়ো অন্ধ অত্যাচারী নই। হাঁ, আমি নিজের কথাই বলছি, নিজের কথা বলতেই আমি ভালোবাসি। যে-দুঃখ নিজে পাবো সেই দুঃখে ভাগ বসাবার জন্যে আরো কতগুলি অনাথ ও আতুর শিশুদের আমন্ত্রণ করব আমি ততটা বদান্য নই। ধরো আজ যদি আমি একটি গরীব কেরানিকে বিয়ে করি (মোটে ষাট টাকা মাইনে) ও সন্তানধারণ করবার তাগিদে আমার যদি ইস্কুলের চাকরি না থাকে, তবে সেই সন্তান কি আমার পক্ষে পাপ—হাঁ,

পাপ হ'বে না ? আমি উত্তর দিচ্ছি : হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাপ হ'বে, কেননা ষাট টাকায় আমার সন্তানের উপযুক্ত ভরণপোষণ হ'বে না। অতএব সে-ক্ষেত্রে আগন্তুক সন্তানকে প্রতারিত করাই হ'বে সমীচীন। বিয়েই বা কেন করতে যাওয়া ? সন্তানকে বৈধ করবার জন্যেই ত' বিয়ে। সংসারকে সংকীর্ণ করে' দেবার জন্যে যেখানে সন্তানের অনধিকার প্রবেশের সুবিধে নেই, সেখানে আর বাধা কিসের ? আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হ'লে বরং সে-বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। সন্তানকে ভরণ-পোষণ করবার সঙ্গতি নেই বলে' গরিব কেরানিটির সঙ্গে বিয়ের আগে প্রেম করা যাবে না এটা একটা বর্বর প্রথা। বড্ডো বাজে বকছি, না ?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খোকা যাই যাই করে' উঠেছে। বোধ যাবে। ঘরে যে লণ্ঠনটি জ্বলছে সেটা নিতান্তই অক্ষম মনে হ'ল। ঐ টুকুন আলোতে মৃত্যুকে নির্ণয় করা যাবে না। ডাকলাম : পুষি দি! কে তা'র উত্তর দেবে ? পুষি দি ঘুমে গা ঢেলে দিয়েছে। আবার ডাকলাম, হাত ধরে' নেড়ে দিলাম, চিৎকার করে' উঠলাম—পুষি দি আরেকটু ভালো হ'য়ে পা মেলে শুল। এত দিন রাত প্রতীক্ষা করে' ও এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবে না ? এবার এমন চেঁচিয়ে উঠলাম যে বিধাতারো কানে তালা লাগলো হয়তো। (তুমি তখন কী করছিলে ?) নগেনবাবু লাফ দিয়ে উঠলেন, বললাম : খোকা কেমন করছে, বোধ হয় নেই। দীনতা ও সাংসারিক ত্রুটি ঢাকবার জন্যে যে নগেনবাবু নিজের ছেলের আসন্ন মৃত্যুর খবর দিতে আমার কাছে প্রথম সংকোচ দেখিয়েছিলেন, তিনি এখন সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করে' এমন একটি আর্তনাদ করে' উঠলেন যে পুষি দির কথা ছেড়ে দাও, মনে হ'ল মরা খোকাও বোধ হয় নড়ে' উঠেছে। পুষি দি এবার জাগলো।

আমি এখেনেই থামি, কি বল? আর বেশি লিখবো না, পরের ব্যাপারটা তোমাকে ভেবে নিতে দিলাম। সবিস্তারে বলে' তোমার কল্পনাকে খণ্ডিত করতে চাইনে। পারো যদি, তোমার ভবিষ্যৎ কোনো উপন্যাসে একটা শিশু-মৃত্যুর হুবহু বর্ণনা দিয়ো। আমি লিখে ফেললে তুমি plagiarise করতে পারো।

সে-ঘরে তিষ্ঠোয় কার সাধ্য? বাইরে বেরিয়ে এলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবো সে-কথাও ভুলে যেতে হ'লো। এখন ধীরে-ধীরে বেশ লিখতে পারছি বটে, কিন্তু তখন নিজের নিশ্বাসপতন সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিলাম; সত্যি। আয়ুর ভিখারি এই শিশুটির মৃত্যুতে কা'র উপকার হ'ল জানি না, আমি কিন্তু একটা পরম শিক্ষা পেয়ে গেলাম, বন্ধু। আমাদের আয়ু এত স্বল্প বলে'ই জীবনকে আমরা এমন ভীরুর মতো আঁকড়ে ধরতে চাই। ভীরু বলে'ই আমাদের ভালোবাসায় মাধুর্য আছে। (এই কথাটা একান্তরূপে নীরস ও বিস্বাদ হ'লেও আমার বারে বারে আওড়াতে ভালো লাগে) 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'- কবিতা লেখবার কোনো বয়সেই আমি এই ভীষণ লাইনটা লিখতাম না। না মরলে এ জীবন আমাদের কাছে একটা মূর্তিমান অভিশাপ হ'য়ে থাকতো। তখন শোপেন্‌হাওয়ারের মতো আমরা আত্মহত্যার গুণকীর্তন করতাম। হারাবো বলে'ই ভালোবাসায় বল পাই, তেমনি মরব বলে'ই জীবনের শত কৃত্রিমতার মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার জন্যে আমরা মত্ত হ'য়ে উঠি। ক্রিকেট্ খেলোয়াড় এক সময়ে আউট্ হ'বে বলে'ই সে-খেলায় সে রস পায়; একেবারেই আউট্ হবার কথা যদি তা'র না থাকতো তবে সে ব্যাট্ দিয়ে স্ট্যাম্পগুলোকে চুরমার করে' মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতো নিশ্চয়ই।

আমি কাল এলাহাবাদ যাচ্ছি। তুমি এসো। শরীর বেশ ভালো আছে। ইতি।

পুনশ্চ : খগেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাটা বলা হ'ল না—কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না এ আমার একটা দুর্বলতা। ওটা শোনবার জন্যে তুমি কৌতূহলী না হ'লেই ভালো করবে।

এলাহাবাদে নির্মলকে টেলি করা হয়েছিলো, তবু স্টেশনে তাকে না থাকতে দেখে অশ্রুর দস্তুরমতো রাগ হ'লো। ভাবলো দূর ছাই, একটা হোটেলে গিয়ে ওঠা যাক্—পেছনে গাইড্‌রা কার্ড নিয়ে ফিরি করতে সুরু করেছে। একটা হোটেল নিয়ে দরাদরি করছে এমন সময় একটি প্রিয়দর্শন ছেলে কাছে এসে স্মিতমুখে শুধালো: আপনিই শ্রীমতী অশ্রু দেবী?

ছেলেটির বয়স অশ্রুর চেয়ে ছোট, এবং অধিক মাত্রায় শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করবার তাগিদে সে শ্রীমতীটিও উহ্য রাখ্‌লো না। অশ্রু হেসে বললে—হ্যাঁ, আর তুমি?

—আমি শ্রীনির্মল গুপ্তের ভাই, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ঠাকুরপো। আসুন আমার সঙ্গে, গাড়ি তৈরি আছে। এই বলে বিমল (ছেলেটির নাম,—ভাইদের নাম মিলিয়ে রাখার প্রথাটা এতদিনে উঠে যাওয়া উচিত) হোটেলের গাইড্‌টাকে এক কড়া ধমক দিয়ে অশ্রুকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে' এলো।

গাড়িতে উঠে অশ্রু বললে—তোমার দাদা এখানে আছেন?

বিমল ড্রাইভারের পাশে বসে' ছিলো, ঘাড় ফিরিয়ে বললে—না।

-কোথায় গেছেন?

—এলাহাবাদটা তাঁকে সুট্ করছে না। ছুটি নিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় গেছেন ঠিক বলতে পারি না। বৌদিও জানেন বলে' মনে হচ্ছে না। স্বল্প একটু হেসে বিমল ফের বললে—এখানে কদিন আছেন ত'?

অশ্রু বিমনা হ'য়ে পড়েছিলো। বললে—কেন বল দেখি?

বিমল একটু লজ্জিত হ'য়ে বললে—এম্‌নি। অবশ্যি, এখানে থাকবার বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই। খসরুবাগ বা ভরদ্বাজ আশ্রম দেখার চেয়ে দুটো গাছ দেখায় বিস্ময় বেশি। তবে—

অশ্রু। থাম্‌লে কেন?

বিমল। তবে যমুনার ওপর নৌকো নিয়ে বেড়ানোর মত সুখ স্বর্গে গিয়েও কল্পনা কর্‌তে পার্‌বো না। অবিশ্যি একা-একা নয়।

কথা শুনে অশ্রু বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্‌তে বাধ্য হ'ল। বিমলের বয়েস বড জোর সতেরো হ'বে, মুখে টাট্‌কা ফুলের একটা সজীবতা আছে, ঠোঁটের ওপর থেকে চিবুক পর্যন্ত ভারি সুন্দর, একটি তিল থেকে আরো খুলেছে। মুখ নাকি মনের মুকুর—অশ্রু বিমলের মুখে তার মনের লেখা যেন এক নিমিষে পড়ে' নিলে। বললে—বেশ, আমাকে বেড়িয়ে এনো একদিন।

বিমল নেহাৎ ছেলেমানুষ, আনন্দের আতিশয্যে গাড়ির মধ্যেই লাফিয়ে উঠ্‌লো। বল্‌লো—সে অত্যন্ত চমৎকার হ'বে। পর্শু কল্‌কাতা থেকে বীণারাও এসেছে, আপনি যদি যান তবে বীণা'কও নেওয়া যাবে, নিশ্চয়ই। আজই চলুন, কেমন? প্রয়াগ পর্যন্ত গিয়ে আমাদের দরকার নেই, আমরা ত' জল ছুঁয়ে তরে' যেতে চাই না, কি বলুন? আমরা এখনো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মাংস খাই। আমি লক্ষ্য করেছি অশ্রুদি, যে, ক'দিন থেকে আজকাল চাঁদ উঠ্‌ছে। এমন একটা gala night আজ কাট্‌বে যে—

অশ্রু কথাটাকে একটু বাঁকা করে' বললে—কে এই বীণা?

এবারে বিমল আর ঘাড় ফেরালো না। যেন কলেজের বিষয় গল্প কর্‌ছে (বিমল ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে) এমনি শুক্‌নো গলায় সে এইটুকুন্‌ মাত্র বললে—ও আমাদের পাড়ার ডাক্তার বাবুর ভাইঝি ছুটিতে এসেছে এখানে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মোটরটা বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়ালো। অশ্রু গাড়ি থেকে নেমেই সটান্‌ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়্‌লো।

পর্দা সরিয়ে বিমল ততক্ষণে সোফার-এর সাহায্যে মোট-ঘাটগুলি নামাচ্ছে।

পর্দা সরাতেই দেখা গেলো—ইন্দিরা। এই ইন্দিরা? অশ্রু ঠোঁট দু'টো ইঞ্চি দেড়েক ফাঁক করে' রইলো। ইন্দিরা, না নির্মলের ধর্মপত্নী!

এইখেনে আবার ছবি আঁকা দরকার। এইবারে গগন ঠাকুরের ডাক পড়বে—কেন না নির্মলের ধর্মপত্নী অন্তঃসত্ত্বা। একটা ব্যঙ্গচিত্র না হ'লে আর মানাবে না। হ্যাঁ, ব্যঙ্গচিত্রই। প্রতিটি রেখায় শ্লেষ, প্রতিটি টানে কৌতুক। যে-দেহ ছিলো ভাণ্ড, এখন তা হয়েছে ভাঁড়,—অমৃতলতা হয়েছে বৃক্ষকাণ্ড। ইন্দিরার এই শারীরিক ও মানসিক অধঃপতনের জন্যে অশ্রু তৈরি ছিলো না। ইন্দিরা যে এত শিগ্‌গিরই বাজে হ'য়ে যাবে তা জান্‌লে ও যমুনার সবগুলো নৌকোকে ডুবতে অভিশাপ দিয়ে ফের চুপি-চুপি আরেকটা মেয়ে-ইস্কুলে গিয়ে টিচারি নিতো। এ-দাসত্বের ছবি দেখে ওর মন হাঁপিয়ে উঠেছে,- মেয়েদের এই বন্দীদশা ঘোচাবার জন্য কবে আবার নতুন করে' এলিজাবেথ ফ্রাই-র আবির্ভাব হ'বে?

ইন্দিরা এগিয়ে এসে, অশ্রুর একখানি হাত ধ'রে কাছে টেনে আন্‌লো। অতি কাতর স্বরে বললে—ভারি কুৎসিত হ'য়ে গেছি।

ইন্দিরার ডায়রি থেকে :

ইন্দিরা ডায়রিতে তারিখ দেয় না, সামান্য দুয়েকটি বানান ভুল করে। খুব সরু নিব-এ বেশ ধরে' ধরে' লেখে, মনে হয় যা লিখেছে তার চেয়ে চিন্তা করেছে বেশি। কেন না ভাষায় ওর না আছে বেগ, না বা ফেনা। হাতের লেখাটি সরু বলে' মনে হয় ওর মনটি কোমল ও করুণ। চিন্তা ও কর্তে পারে বটে, কিন্তু তার ফলে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে নি। মানে, ব্যক্তিত্বের অর্থ ওর কাছে আত্ম-প্রকাশ নয়। চিন্তায় ওর স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু তা'র প্রকাশে আছে কুণ্ঠা; আলস্য বললে আরো ঠিক হ'বে।

অঙ্কপাত করে' ও ওর নিজের মনের ইতিহাস নিয়েছে এই ডায়রিতে; চুপ করে' বসে' বসে' ভাবলে চিন্তা হ'ত অসংলগ্ন, বিষয় হ'ত অবান্তর—মনের চেহারার রেখাটিও চোখে পড়তো না। নিভৃত মুহূর্তে ও ওর গৃহকোণটিতে বসে' মনের সঙ্গে মুখচন্দ্রিকা করেছে, সে-স্বপ্নকে ভাষায় মূর্তি না দিয়ে ওর স্বস্তি ছিলো না। এমনি করে' কত সময় যে অপব্যয় করেছে তার হিসেব নেই—দু'টো উল বুন্‌লে তা'র চেয়ে বেশি কাজ দিতো—অন্তত এই ছিল ওর বাড়ির লোকের মত। রূপকথায় সোনার কাঠির কথা শুনেছিলো—সে বোধ হয় মানুষের হাতের কলম—যে-কলম মনের মৌনভঙ্গ করে। ডায়রি লেখাটা ইন্দিরার কাছে ন্যাকামি মনে হ'ত না (যদিও আসলে ওটা ন্যাকামি) —মনে হ'ত অন্তর্যামীর সঙ্গে একটা গোপন সাক্ষাৎকার; তা'র মধ্যে মুক্তির স্বাদ আছে। মুহূর্তটি ছোট, কিন্তু মুক্তি আকাশ-বিস্তীর্ণ।

ডায়রিতে কেন তারিখ দেয় না, জিগ্‌গেস করলে ইন্দিরা হয়তো বলতো : আমি তো' জীবনের ঘটনাগুলি কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখছি না যে তার পারম্পর্য না রাখলে ইতিহাস তার বন্ধনী হারাবে, আমি লিখছি আমার আত্মার রূপকথা ; ছাপলে তা জনসাধারণের উপকারে আসবে না। কেননা এ আমার একান্ত নিজের, যেমন আমার চুল বাঁধবার রীতিটা অন্যের অননুকরণীয়। ডায়রি লেখাটা আমার মনের একটা বিশেষ ও পৃথক্ প্রতিষ্ঠা ; ওটা একটা সাবেক ও মামুলি ইয়ার-বুক নয়।

ইন্দিরার কথা এ-পর্যন্ত অনুধাবন করে' আমাদের মধ্যে থেকে' কেউ যদি প্রশ্ন করে : তা তো বুঝলাম ; কিন্তু এতো সব চোখা চোখা মত পোষণ ক'রেও তুমি তা পালন করতে পারলে না, এর কারণ কি ? এর উত্তরে ইন্দিরা কী বলবে আমারা আন্দাজ করতে পারছি না ; তবে সায়ন্তন দিগন্তরেখার মতো ওর চোখ নিশ্চয়ই বাষ্পাকুল হ'য়ে উঠবে, এবং আমরা তাকে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করতে পারবো। শুধু ক্ষমা করতে পারবো না, ইন্দিরা আমাদের মনে একটু দোলা দেবে। কখনো-কখনো মনে হ'বে ভীরু হ'য়ে ইন্দিরা ভালোই করেছে, কেননা মনের গলি-ঘুঁজিতে বেড়াবার যার ছাড়পত্র আছে সে শুধু বিবেক, পাড়ার পাঁচ জন নয়। বাইরে সে-মন উদ্ঘাটিত হ'লেই পাড়ার পাঁচ জনের পাঁচন-বড়ি-প্রয়োগের প্রয়োজন হ'ত। এই প্রকাশ-কুণ্ঠতাটিই ইন্দিরার গুণ হ'য়েও বড়ো দোষ। অন্তত অশ্রু তাই ভাবলে। ওর মতে ওজস্বিনী ভাষার চেয়ে একটা উলঙ্গ ভাব অনেক শক্তিশালী। পালিত হওয়ার চেয়ে প্রচারিত হওয়াতেই তার সার্থকতা।

মোটামুটি ইন্দিরার ডায়রির সমালোচনা এইটুকু। বানান ভুল নিয়ে ঠাট্টা করা ওর মুখরুচির প্রশংসা করা সমান নিরর্থক। আমরা কটু

কথা বলতে পারি না এমন নয়, তবে সমালোচনাকে নৈর্ব্যক্তিক করার পক্ষপাতী আমরা নই—অন্তত ইন্দিরার সম্বন্ধে। কেন না—সে-কথা পরেই হবে'খন।

মা বকেন গৃহকর্মে আমার মন নেই; মাসিকসওদার হিসেব রাখতে গিয়ে সামান্য যোগ করতে ভুল করেছি—আমার উপায় কী হবে? কলেজে মেয়েরা রাজনীতি করছে, তাদের কোলাহলে গলা সেধে মেলাতে পারি না, সবাই বলে: দুয়ো! কিছু হ'বে না আমাকে দিয়ে। বাবা একটা খুব ভালো বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজে এনেছেন, কিন্তু আমি এমন বেরসিক মেয়ে, সে-খবরটা পেয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের মুখও দেখলুম না একটিবার। সত্যিই, আমি এত নিস্পৃহ কেন হ'লুম? জীবনে এমন কোনো ঘা খাইনি যে জীবনকে ঘানি বলে' সস্তা দুঃখবাদ করব। মোটমাট, কেন জানি ভালো লাগে না। কারণটা খুঁজতে হবে।

মনকে স্পষ্ট জিগ্‌গেস করলুম: কী চাই? মন অনবরত চোখ ঠারে, জবাব দেয় না। কিন্তু জবাব আমার পেতেই হ'বে। আমার বয়সী মেয়েরা চায় কী? প্রেমিক স্বামী, সুশৃঙ্খল সংসার, নীরোগ সন্তান? আমার মনে হয় বিস্বাদ, অ-শ্লীল [টীকা; শব্দটা প্রচলিতার্থে নয়]; আহত কেঁচোর মতো শরীরটা সংকুচিত হ'য়ে আসে। কর্ম চাই? কী কাজ করবো? মেয়েদের অবরোধমুক্ত, দৃপ্ত, স্বাতন্ত্র্য-শালিনী করবার জন্যে মশাল হাতে নিয়ে সমুদ্রাম্বরা পৃথিবী

প্রদক্ষিণ করবো? না ভাই, পারবো না! যে পারো সৌন্দর্যের চিত্রদীপ জ্বালিয়ো, আমি প্রশংসা করবো। জীবনে আদর্শপূজা করতে আমার ভয় করে, যজ্ঞ পশু হ'বে বলে' নয়, সমিধ-ই আমি সংগ্রহ করতে পারবো না; ক্লান্ত হ'য়ে পড়বো। প্রেম চাই? পাওয়া যাবে না এমন প্রেম? কী হ'বে তা দিয়ে? মিছিমিছি তবে স্নায়ুগুলোকে খাটিয়ে ক্লিষ্ট করে' লাভ কী? বেশ পাওয়া যাবে এমন প্রেম! তবে প্রেম আর রইলো কোথায়?

যা আমার কাছে আছে তাই নিয়ে আমি বেশ আছি। [টীকা: কয়েক লাইন আগেই লেখা হয়েছে: 'ভালো লাগে না।' এই থেকে আমরা ইন্দিরার অস্থিরচিত্ততা অনুমান করতে পারি। ওর যে ভালো লাগে না সেই হয়তো ওর বেশ থাকা।] কী আমার আছে জিগ্‌গেস করবে? গভীর ক'রে উত্তর দেব: আমার কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতা! সেই আমার জীবনের উদার শান্তি। আমি পৃথিবীর কোনো কাজে আসবো না, সামান্য একটা ওয়াড় সেলাই করলুম না কোনো-দিন—এই প্রশংসাপত্র দিয়ে বিধাতা কেন আমাকে এত অপ্রাকৃতিক করলেন আমার এ-প্রশ্নেরো কোনো জবাবদিহি নেই। সুপ্রচুর অবকাশ পেয়েছি—চৈত্রমধ্যাহ্নের আকাশের মতো অবারিত। কিন্তু সুখ এই যে, হাতে কোনো কাজ নেই। বাবার গরম জামা-কাপড়গুলো রৌদ্রে দেবার কথা ছিলো, প্রতিনিধিরূপে কালিন্দীকে প্রেরণ করলুম। [টীকা: ছন্দ দেখে অনুমান হচ্ছে কালিন্দী ইন্দিরার ছোট বোন।] কালিন্দী বেশ বাধ্য মেয়ে, কোমরে আঁচলটাকে বাসীকৃত

করে' ঘর-দোর নিয়ে ঘেমে উঠেছে; খড়কে-ডুরে শাড়িটিতে ওকে কী যে মানিয়েছে বললে ওর আত্মতৃপ্তির আর সীমা থাকছে না। কালিন্দী আমার নয়নরঞ্জিকা। [টীকা: কালিন্দী সম্বন্ধে ওর বাগ্‌বাহুল্যের অর্থ এই যে, ও ছিলো বলে'ই ইন্দিরা বেঁচে গেছে, নইলে এই নীরব নিঃসঙ্গতা ওকে আর ভোগ করতে হ'ত না। আফিসের জামা-কাপড় রৌদ্রে না দিয়ে রাখলে ওর মা যে ওকে আদর করে' পিঠে খেতে দিতেন অতো বড়ো দুরাশা না করাই ভালো।]

আমি এই কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতার উপাসিকা—এই আমার গৌরব। সংসারের সেবায় আমার স্থান নেই, পরোপকার আমার ব্রত নয়—এই আমার অসাধারণত্ব। গাল দিতে চাও দিয়ো, কিন্তু যদি বলি এই নিঃসঙ্গতাটিই আমার আধ্যাত্মিকতা, বলবে: তোমার মুখে কথাটা মানায় না, ইন্দিরা! না মানাক, ক্ষতি নেই, কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা নিয়ে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী ঘিরে আমি মনে-মনে যে একটি নীড় নির্মাণ করেছি তা'র কথা বলে'ও তোমাদের লাভ নেই। [টীকা: কেন না সে-নীড়ে আর কারু নিমন্ত্রণ হ'বে না।] প্রকৃতির সঙ্গে এমন একটা হৃদয়যোগকে তোমরা নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করবে, বলবে: অলস বিলাসিতা মাত্র। আমি তা গ্রাহ্য করি না। সূর্যোদয়ের আগে চোখ চেয়ে যে-জগৎকে আমি আবিষ্কার করে' মুগ্ধ হই, ঘুমেও সেই জগতের বহুবর্ণতা আমার হৃদয়ে লেগে থাকে। যাই তোমরা বল, আমার চিত্তের আরতি এই প্রকৃতিকে নিয়ে। আমার অনুভূতি অত্যন্ত গভীর বলে'ই আমি কবি হ'তে পারলুম না।

আমি যে কত সুন্দর তা তোমরা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। কালিদাসের কাব্যে ত্রিদশবধূর রূপবর্ণনায় যারা মুগ্ধ হয়েছে তাদের আমি প্রথমেই বাতিল করে' দিচ্ছি। আমার অঙ্গে তরলিকা সুরশৈবলিনীর লাবণ্য—এ কথা কে না জানে? সে-বিশেষণটাকে আমি গ্রাহ্যই করিনে। কবিরা আমার সঙ্গে অরণ্যচন্দ্রিকার তুলনা দেবেন—ভঙ্গুর উপমা। জানো, আমি এই বিশ্বপ্রকৃতি; মানবীর মূর্তিতে বিধাতার অন্তরছায়া। পায়ের নিচে মাটি আমার কঠিন, বায়ু ঘন, নিঃশ্বাস গ্রহণ একটা কঠোর শাস্তি মাত্র। শারীর বিজ্ঞানের অধীন আছি বলে' আমার কথনো-কথনো নিজের ওপর অবজ্ঞা আসে, আমাকে মৃত্যুর অনুযাত্রিণী হ'তে হ'বে ভেবে আমার হাসি পায়, সৌরজগতে আবার একদিন পথ হারিয়ে ফেলব বলে' একটা আনন্দময় আতঙ্ক লাভ করি। সে কবে? [টীকা: উল্লিখিত কথাগুলি থেকে ইন্দিরার চরিত্রের আরেকটু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে,—ইন্দিরা নিজের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজ্ঞান, বলা যেতে পারে স্বার্থপর। তবু ভেনাস ডি মাইলোর সঙ্গে ওর জ্ঞাতিত্ব নেই।]

কর্মবাহুল্যে মানুষ কত কুশ্রী হ'য়ে পড়েছে,—পৃথিবী-ব্যাপী এবার ধর্মঘট হোক। আজ সমস্ত বিকেল ধরে' কী সুকোমল ধারাঙ্কুর ঝরছে। খোলা বারান্দায় বসে' চুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা গান গাইলুম, আকাশ কান পেতে শুনল, মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। গানটি যেন আমাকে অমর্ত-লোকের পারে নিয়ে এসেছে। এই জন্যেই ত' রবীন্দ্রনাথকে আমি কবিশ্রেষ্ঠ বলে' সম্বর্দ্ধিত করি। [টীকা: সাহিত্যকে

সুমধুর করতে হ'লে জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে আনতে হ'বে—এই কৌশল রবীন্দ্রনাথের জানা আছে বলে'ই তিনি শিল্পীশ্রেষ্ঠ। ইন্দিরা বাঙ্গার সাহিত্য পড়েছে বলে' মনে হয় না, তা হ'লে গোগল এর হতাশা বা ডষ্টয়ভস্কির অবিশ্বাসকে ক্ষমা করতে পারতো না নিশ্চয়ই।]

প্রেমের চেয়ে যে-আর্ট বড়ো আমি সেই আর্টের উপাসিকা। বাহ্যিক প্রকাশ থেকে নিষ্কর্ষিত করে' আর্টের যে একটি অবাস্তব রূপ আছে আমি তাকে, কায়মনে ভালো-বেসেছি। বাহ্যাডম্বরের আতিশয্যে মানুষ এই সহজ আনন্দ-বোধটি হারিয়ে ফেলেছে– তোমাদের চিত্তদারিদ্র্য আর সওয়া যায় না। আমি এই বিরল, দুর্লভ গুণটির অনুশীলন করব। সবাইর মতো সীমা-লাঞ্ছিত সংসারের পঙ্কিল আবর্তে তার সমাধি দেব না। এই আমার জীবনের সংজ্ঞা ও সার্থকতা।

আমি বাজে, বিলাসি, ভাবুক। [টীকা: কথাগুলি সমার্থসূচক।] আমাকে করুণা করবে, তোমাদের অসীম দয়া—কিন্তু আমার এই ভাববিদ্যুৎ দিয়ে সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত করে' রাখবো, কেউ না কেউ প্রভাবিত হ'বেই। তোমরা বলশালী হও, আমি হ'ব সুন্দর। [টীকা: ইন্দিরার মতটা আধুনিক নয় মনে হচ্ছে। বলের মধ্যে যে-সৌন্দর্য আছে সেটা প্রখর ও বর্বর, ওর মতে শিল্প-সৌন্দর্য হচ্ছে দুর্বল, নিরীহ, ভঙ্গপ্রবণ—এবং সেইটেই হচ্ছে জীবনের রূপময়তা।]

কালিন্দীর পেটের মধ্যে ফোড়া হয়েছে,—দাঁতের ত্রুটির জন্যে। সাহেব ডাক্তার এসেছিলো, বললে, অজ্ঞান করে' কেটে

ফেল্‌তে হবে। বাবা দারুণ ভড়কে' গেছেন; সহজে সারানো যায় কি না, সেই ভেবে হোমিয়োপ্যাথির শরণাপন্ন হয়েছেন—কালিন্দীর যন্ত্রণার দিনগুলি বেড়ে গেছে।

মাঝরাতে ঘুম ছেড়ে ধড়ফড় করে' জেগে উঠলুম—পাশের ঘরে কালিন্দী চিৎকার করছে। ভয়ে বেদনায় শরীর কেঁপে উঠতে লাগলো। মনে হ'ল মিথ্যা এই প্রকৃতির শুভময় সৌন্দর্যপ্রেরণা—এর অন্তরের কুশ্রীতা আমি ধরে' ফেলেছি। প্রলয়পয়োধির তরঙ্গ-আঘাতে যে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, ফুলের পাপড়িতে শিশির-পড়ার শব্দ শুনে সে আর মুগ্ধ হয় না। মৃত্যুকে তবু ক্ষমা করা যায়, কেন না সেটা একটা পরমরমণীয় মোহময় বিস্মৃতি মাত্র—ভারি রোমান্টিক,—কিন্তু এই খণ্ডিত লাঞ্ছিত বিপর্যস্ত জীবনের মতো জঘন্যতা আর কোথায় আছে? এই সৃষ্টিটা বিধাতার বীভৎস রসের পরাকাষ্ঠা। [টীকা: ইন্দিরাকে অনুধাবন করা কঠিন মনে হচ্ছে, ওর ভাবের সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে কি?]

কিন্তু এই জীবনে মর্ত্যাতীত সৌন্দর্যের সাধনা করবো সমস্ত অন্তর দিয়ে এই উপলব্ধিটি আমি লাভ করেছিলুম, কালিন্দীর চিৎকারে আমার সে-ধ্যান ভেঙে যেতে বসেছে। ভাবলুম এই স্থূল ইন্দ্রিয়সর্বস্ব দেহটাই হচ্ছে সৌন্দর্যসাধনার বাধা,—আমি যদি সহসা একদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হই, অথচ আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা না হয়। যদি একটা অনিবার্য্য দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ, আকার-ভ্রষ্টা হয়ে পড়ি। এই মাংসল মৃন্ময় শরীর নিয়ে আমরা কী করে' সুন্দর হ'বার স্বপ্ন দেখতে পারি। এমন একটা গ্লানি নিরন্তর আমাদের সইতে হবে

বলে' আমার লজ্জার আর সীমা থাকে না। শারীরিক প্রক্রিয়াগুলো কী নিদারুণ রূপে স্থূল, এর সামান্য ব্যতিক্রমের শাস্তি জঘন্যরূপে সুপ্রত্যক্ষ। [টীকা: সন্তানধারণযোগ্যা রমণী না হ'য়ে এই অনুভূতি নিয়ে একটা দীর্ঘায়ু ফুল হ'লেই বোধহয় ইন্দিরাকে মানাতো ভালো। তবু দেহ সম্বন্ধে ওর এই লোকাতীত ধারণাটা আধুনিক কালে শুধু যে অপক্ক তাই নয়, দস্তুরমতো অভব্য। কেন না এই দেহগঠন যদি উপযুক্ত সাধনার বলে ভাস্কর্যের সীমায় উপনীত হয়, তবে তার চেয়ে অধিকতর সৌন্দর্য কল্পনা করা দুরূহ, এমন কি দেহের এই বৈধ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোও অভিজাত। স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সমপদবাচ্য; রোগ যেমন আছে তেমন তার চিকিৎসাও আছে। ইন্দিরা এ-যুগে পেছিয়ে পড়েছে, ওকে সক্রেটিসের ভগ্নীরূপে পেলে আমরা খুসি হ'তাম।]

কালিন্দীর শিয়রে বসে' ওর কপালে হাত রাখলুম। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে' [টীকা: ইন্দিরা দেখছি রিয়ালিষ্টিক হ'বার চেষ্টা করছে।] বললে: দিদি, আর পারি না। পরে একটা বেদনাহীন মুহূর্ত্তে ফের বললে: বিজ্ঞান এখনো যথেষ্ট উন্নত হয় নি। আমরা আরো দু' শতাব্দী পরে এসে কেন জন্মালুম না? দু' শতাব্দী পরে ক্রমবিবর্তনে এই পৃথিবী আরো সহজ হ'য়ে উঠবে, না? তোমার কী মনে হয়? [টীকা: এ ধরণের কথা শুনে আমরা স্বচ্ছন্দে আন্দাজ করতে পারছি কালিন্দী সাবালিকা হ'য়ে উঠেছে—আইনের অর্থে ত' বটেই, বুদ্ধির অর্থে। অর্থাৎ, মনে হচ্ছে, সে হার্বার্ট স্পেন্সার পড়েছে, যদিও স্পেন্সারের মত উলটো—ক্রম-

বিবর্তনের ফল যে নিছক্ জটিলতা এ-ই তিনি বিশ্বাস করেন।]
হঠাৎ ব্যথার আরেকটা চাড় উঠলো, কালিন্দীর মুখ নীল বিবর্ণ, হাত-পা শিথিল হিম হ'য়ে এল। চিৎকারটা যেখানে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠলো, শুনতে পেলুম ও করুণস্বরে আমার কাছে এক গ্লাশ বিষ চাইছে। মরলে পরে নরক আছে কি না জানি না, কিন্তু ক্যান্সার নেই। [টীকা: পেটে ফোড়া আর ক্যান্সার হওয়া এক নয়।]

আমার চোখের সামনে বিলীয়মান অন্ধকার,—কালিন্দী একটু ঘুমিয়ে পড়েছে হয় তো, চুপ করে' আছে। বাইরে বেরিয়ে এলুম, সৃষ্টির সেই অস্পষ্টতার মধ্যে আমার সামান্য অস্তিত্বটুকু যে কী ভালো লাগলো কেমন করে' বোঝাই। মনে হ'ল মৃত্যু মিথ্যা—এই যে নিশ্বাস নিতে পারছি সুস্থ সুন্দর দেহে—এর চেয়ে বিলাস আর কী আছে! বেশি দিন না-ই বা বাঁচলুম, কিন্তু যত দিন আছি তত দিন যেন অত্যন্তমাত্রায় বেঁচে যেতে পারি এই প্রার্থনা।

কালিন্দী আবার চিৎকার করে' উঠেছে। ওর আর্তনাদ শোনবার জন্যে আর দাঁড়ালুম না, ধীরে ধীরে বাগানে চলে' এলুম। [টীকা: এই ভোরে ওর বাগানে চলে' আসাটি আমাদের ভালোই লাগলো; ওকে আমরা স্বার্থপর বা স্নেহবিমুখ বলে' নিন্দা করলে সেটা ন্যায়ানুগত হ'বে না। ওর সৌন্দর্যবোধটি আমাদের মনোজ্ঞ হয়েছে।]

টের পেলুম রমাপতি আমার আত্মীয় হয়! কিন্তু এ-বিষয়ে সজ্ঞান হওয়ার আর অর্থ নেই। কেন না রমাপতি

যেদিন এসেছিলো কপালে তথাকথিত আত্মীয়তার নিদর্শন এঁকে আসে নি, এসেছিলো একান্তরূপে পুরুষ হ'য়ে—যদি উপমা দিতে হয় বলি, একটা নৈর্ব্যক্তিক জ্যোতিষ্মান্ আবির্ভাবের মতো। এখন, ফিরে যাও, বললেই মন শোনে কৈ? [টীকা: রমাপতি ইন্দিরার কি রকম আত্মীয় হয়, ডায়রিতে তা লুকিয়ে রাখাটাকে নিশ্চয়ই ভীরুতা বলবো। রমাপতি মামা না কাকা, দাদা না আর-কিছু জানা উচিত ছিলো। 'তথাকথিত' কথাটি প্রাণধানযোগ্য। অর্থাৎ কৃত্রিম সম্পর্কটার স্বভাবসিদ্ধ এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে তার সৃষ্ট ব্যবধানগুলিকে রক্ষা করে' চলে, তাই রমাপতি আত্মীয় হ'য়েও ইন্দিরার এমন স্নেহ বা হৃদ্যতার অধিকারী হয়েছে যা সম্পর্কের অতিরিক্ত, তার সীমার বহির্ভূত। শিশুকাল থেকে যে-সাহচয নরনারীর হ'য়ে থাকে সেটায় রহস্য-বিলোপ ঘটে বলে'ই আত্মীয়তাটা টিকে থাকে, তাই পৃথিবীতে সহোদর ভায়ে-বোনে প্রেম বড়ো একটা দেখা যায় না, যদিও *Sanine* সে-সংস্কারো ভেঙেছে। রমাপতি যদি ছেলেবেলায় ইন্দিরার সঙ্গে খুব মেলা-মেশা করৃত তা হ'লে হয়ত রমাপতিকে দাদা বা মামা বা কাকা বা আর-কিছু ডেকে ডেকে ইন্দিরার মন ও রসনা অভ্যস্ত হ'য়ে পড়তো; আত্মীয়তার প্রাচীর ভাঙতো না বোধ হয়। কিন্তু রমাপতিকে এখন কাকা বা মামা বা দাদা বা আর-কিছু বলে' রসনা ডাকৃবে কেন, মনই বা কি করে' সায় দেবে? রমাপতি নামটা উচ্চারণ করতে পর্যন্ত ওর রোমাঞ্চ হয় মনে হচ্ছে।]

রমাপতির প্রতি আমার এই অনুভূতিটির কি সংজ্ঞা দেব ভেবে উঠতে পারি না। বাঙ্‌লা ভাষায় শব্দসম্পদ এতো কম যে ঠিক atmosphere-যুক্ত একটা প্রতিশব্দ পাব না। প্রেম কথাটার না আছে অর্থ না বা ইঙ্গিত; তার চেয়ে স্নেহ কথাটায় সংকেতময়তা বেশি আছে। কিন্তু ঐটুকু কথায় কুলবে না কিছুতেই। বন্ধুতা, মিথুনাসক্তি? কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ় বলে'ই যে বরখাস্ত করছি তা নয়, কথাগুলির অর্থ সত্যিই অসম্পূর্ণ; আমার এই অনুভূতিটি সত্যিই অনিরূপনীয়! [টীকা: অনুভূতিটির না পেলেও atmosphere কথাটার বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ পাওয়া দুষ্কর হ'ত না।]

কেন রমাপতিকে ভালবাসি [টীকা: এইখানে ভালবাসি কথাটা ক্রিয়া, অনুভূতি বা বিশেষ্য নয়, তাই গ্রাহ্য।] এই প্রশ্ন ক'রে সদুত্তর পাচ্ছি না। রমাপতির রূপ নেই, বিত্ত নেই,—মুখশ্রী নেহাৎ সাধারণ, স্বাস্থ্যগৌরবেও কুলীন নয়—সায়ান্স কলেজ থেকে রিসার্চ করবার জন্যে সামান্য একটা বৃত্তি পায় মাত্র। [টীকা: বোঝা যাচ্ছে সেই সূত্রেই রমাপতি কল্‌কাতায় এসেছে পড়াশুনা করতে। বিজ্ঞান-বিষয়ে গভীর গবেষণা করতে গিয়ে যে একটি চারুবর্ধনা আত্মীয়ার প্রতি অলস দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না এমন আত্মসংযমের প্রমাণ দিতে স্বয়ং সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরো লজ্জিত হ'তেন।] কিন্তু ওর একটি ভীষণ গুণ আছে,—তা হচ্ছে ওর অনন্যপরায়ণ পাঠাসক্তি। ওর ছোট ঘরটিতে বসে' সমস্ত দিন (কলেজের সময়টুকু ছাড়া) যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে' কি-এক অভূতপূর্ব আবিষ্কারের আশায়

কলকজার ওপব ঝুঁকে থাকে। এই অখণ্ড মনোযোগ বা অন্যান্য জিনিসের [টীকা : ইন্দিরা স্বয়ং ?] প্রতি ওর এই ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখে রাগ হয়, কিন্তু রাগ্‌তে পারি না। [টীকা : কি করে'ই বা পারবে ? রমাপতিকে যে ওর ভাল লাগবে এতে আর সন্দেহ কি ? ও অলস কর্ম বিমুখ—বমাপতির একনিষ্ঠ কর্মপরায়ণতা। ইন্দিরা মৃদুস্বভাব আবাত্মমুখী, আর রমাপতির দেহে যেমন দৃঢ়তা, বচনে তেমনি সুস্পষ্ট তেজ। প্রীতির মূলেই বৈষম্য,—যত গভীর, প্রীতিও তদনুপাতে প্রগাঢ়। রমাপতি যদি তার ল্যাবরটারিতে দিন-রাত মাথা গুঁজে' পড়ে' না থাকতো' মাঠে বসে' যদি বাঁশি বাজাতো বা ইজি-চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে' বিড়ি ফুঁক্‌তো তা হ'লে ইন্দিরার পক্ষে তার সংজ্ঞানির্ণয় করতে বেগ পেতে হ'তো না—অর্থাৎ শুদ্ধভাষায় যাকে বলে ন্যাকামি।]

রমাপতি আমার আত্মীয়, ওর সঙ্গে সামান্য কথা-অনুরাগ সম্ভোগ করাতেও আমাব বাধা আছে এ-কথা আজ বললেই বা শুনি কি করে' ? টের পেলুম, ইদানি আমাদের দু'জনের ওপর সংসারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির ছায়া পড়েছে। [টীকা : ইদানি কথাটি লক্ষ্য করবার। মনে হচ্ছে, প্রথমত এদের পরস্পরের সান্নিধ্য নিবিড়তর হ'য়ে উঠেছিলো এই আত্মীয়তারই ছাড়পত্রে। নর নারীর একটা সামান্য শারীরিক নৈকট্য ঘটারও যেখানে সুবিধে নেই সেখানে,—হোক্ না কৃত্রিম, হোক্ না মূল্যহীন—এই আত্মীয়তার ওজুহাতকে নিন্দা করাটা ঠিক হ'বে না। সেই কৃত্রিম আত্মীয়টা ইদানি সত্য ও সুগভীর

হ'য়ে উঠতে চাইছে বলে' সংসার বা তথা সমাজের সহ্য হচ্ছে না।] মন বিমুখ হ'য়ে রইলো ; যেটা অন্যায় বলে' বুঝছি— সেটাকে শাসন করবার জন্যে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করব মনের মধ্যে সেই শক্তি খুঁজে পেলুম না কেন ? বুঝলুম, রমাপতির কাছ থেকে আমাকে বিছিন্ন করে' রাখে এমন কোনো অন্তরায়কে আমি কখনো কল্যাণকর বলে' স্বীকার করবো না, কিন্তু এ নিয়ে যে সহানুভূতিহীন সংসারেব সঙ্গে একটা ক্ষমাহীন সংগ্রাম করবো সেটাও আমার কাছে অবিনয় মনে হ'ল। অন্য মেয়ে হ'লে কি কবত জানি না, আমি আমার ঘরে ফিরে এসে নির্জনে কাঁদতে বসলুম। [টীকা : গোঁয়ার ওথেলো (স্ত্রীর বুকে) ছুরি বসিয়ে অদৃশ্য হ'লে ঝি এসে মুমূর্ষু ডেসডেমোনাকে জিগ্‌গেস করলে, কে এই সর্বনাশ করেছে ? শ্রীমতী ডেসডেমোনা মরলো বলে'ই গলে গিয়ে তার মিথ্যা কথাকে বললাম—'স্বর্গীয় মিথ্যাবাদ।' এই মিথ্যাবাদিনী ভীরু ডেসডেমোনাই গোঁয়ার ওথেলোকে বিয়ে করবার জন্যে বাপের সঙ্গে বাক্যের লড়াই করতে কসুর করে নি। এই খানটাতে বাঙালি মেয়ের সঙ্গে তার কুটুম্বিতা নেই। ইন্দিরা ঘরে গিয়ে যে কাণ্ডটা করে' বসলো সেটা প্রাক্-গান্ধি-যুগের বাঙালি মেয়ের প্রকৃষ্ট চরিত্র-নমুনা।]

রমাপতিকে আমি বিয়ে করবো এমন একটা স্থূল নীচ অশ্লীল ইচ্ছা পোষণ করতে আমার শরীর-মন কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো। [টীকা : ইচ্ছাটা নীচ মনে হ'বার কারণ এই নয় যে রমাপতির সঙ্গে ওর ক্ষীণ রক্তসম্পর্ক আছে ; কারণ, ও বিয়ে-ব্যাপারটাকেই ঐ সব বিশেষণে আখ্যাত করে' থাকে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চটবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা বা ধারণার স্বাধীনতার আমরা পক্ষপাতী।] অথচ রমাপতিকে আমার চিরকালের জন্য ছেড়ে থাকতে হ'বে সমাজের এই অনুশাসন মেনে নিলেই যে একটা কীর্তি করা হ'বে এ-কথাও মানতে পারিনে। রমাপতির সঙ্গে [টীকা: ইন্দিরা রমাপতির পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করতে চায় না, ঐ নামটি বারে বারে লিখতে ওর ভাল লাগে বোধ হয়।] এ-বিষয় নিয়ে একটা পরিষ্কার কথা বলা চলে না? মা গো, কি লজ্জা। নিজেকে স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করে' দিতে আমি মরে' গেলেও পারবো না, কাঙালপনাকে আমি ঘৃণা করি।

কিন্তু আমি ত' যাচ্ঞা করতে চাই না, আমি চাই ওর সঙ্গে এমন একটা আলোচনা করতে যেটা বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করা যাবে এবং যেটার সাহায্যে বর্তমান সমস্যার সমাধান হ'বে। যেন এত সহজেই এ-সমস্যার মীমাংসা হয়, অসীম সময় এ সন্ধিকে টিকতে দেবে কেন? তবু রমাপতির ঘরের দিকে অগ্রসর হ'লুম। দরজা ভেজানো ছিলো, ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়ে'ও ওর ধ্যান ভাঙতে পারলুম না। দোরের দিকে পিঠ করে' ব'সে আছে—সামনে টেবিলের উপর মাথাটা আনমিত। টেবিলের এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে—এই রমাপতির চুল ধরল বলে'—রমাপতির ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর নোয়ানো ঘাড়টা স্পর্শ করতে ভারি ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করলুম। দৈহিক সংস্পর্শের আবিলতা দিয়ে আত্মাকে কুণ্ঠিত করতে চাই নে। খুব কাছে এসে দাঁড়ালুম; তবু রমাপতির মুখ তুলে চাইবার নাম নেই।

[টীকা : রমাপতি যে বিশ্বামিত্রের চেয়ে বড়ো সাধক এ-সত্যটা সহজেই প্রতিপাদিত হ'ল।]

এক ঝলক হাওয়ায় দুর্বল দীপশিখাটা নিবে গেলো এবং দেশলাই খুজতে গিয়ে রমাপতি আমার ডান হাতটা ধরে' ফেললে। অন্ধকারে রমাপতির মুখ দেখা গেলো না বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ওর সমস্ত অস্তিত্বটুকু যেন সঙ্গীতময় হ'যে উঠেছে। [টীকা : ইন্দিরার রচনার অপরাপর ত্রুটির মধ্যে একটা বড়ো ত্রুটি এই যে, ও মোটেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে না। এইখানে রমাপতি ওকে দেখে কি-কি কথা বললে জানলে আমরা খুশি হ'তাম।] ধীবে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিলুম, হাতের স্পর্শ অবশেষে হয় তো অধরেব স্পৃহা হ'য়ে উঠবে, তা ছাড়া এই অন্ধকারটি উপন্যাসের মতো মধুর বটে, কিন্তু মোমবাতিটা ফেব না জ্বাললে অন্ধকারেই এই এঁদো কুৎসিত সংসাবটা মুখ ভেঙচাবে। দেয়ালের প্রত্যেকখানি ইট সহস্রচক্ষু ইন্দ্রেব মতো পাপীয়ান্।

আলো জ্বালা হ'ল, সান্নিধ্যটিও নিভৃত হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারলুম না। যেন রাত করে' এতো সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালে এ-রাত আর পোহাত না। হঠাৎ বারান্দায় একটা শব্দ হ'তেই চেয়্যার ছেড়ে উঠে হেসে বললুম : চলি এবার, বাইরে গুপ্তচরবা পদচারণ করছে। রমাপতি কিছু বললে না, একটু হেসে মুখ নীচু করে' কাজে মন দিলে।

কেলেঙ্কারির আর সীমা রইলো না। আমাকে নিয়ে রমাপতির দুর্নাম এতো বেড়ে উঠেছে যে, রমাপতি বাবার মুখের ওপরেই সটান্ বলে' বস্‌লো : ইন্দিরাকে আমি বিয়ে কর্‌বো, এবং রমাপতির প্রার্থনাটা যে অযৌক্তিক নয় তার পক্ষে আইনস্বীকৃত নানা প্রথার নজির দেখাতে লাগ্‌লো। লাভ হ'ল এই, বাবাও রমাপতির মুখের ওপর স্বচ্ছন্দে বলে' বস্‌লেন : আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। রমাপতি তার ট্রাঙ্ক গুছোতে বস্‌লো।

বমাপতি সোজা আমার ঘরে এসে হাজির; বল্‌লে, আমাকে তার অনুসরণ কবতে হবে। বললে : এ-সব নিয়মের দাসত্ব যদি আমাদেরো কর্‌তে হয়, তবে আমাদেব নিগ্রো হ'য়ে জন্মানোই উচিত ছিলো। বিয়েতে অনুষ্ঠানটাই বডো নয় ইন্দিরা, বডো হচ্ছে তার psychology। আমি আর তুমি cousin কি নই সেটা আমাদের অন্তবেব দিক থেকে একেবারেই সমস্যা নয়। তুমি এসো আমার সঙ্গে চলে'। তুমি যে আমাকে ভালোবাসো এতে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু নিষ্প্রাণ জডপদার্থের মতো বসে' বসে' অন্যায় অত্যাচার সইতে হ'বে এ আমি সইতে পারি না। এসো তুমি। যদি তোমাকে কেউ রক্ষিতা বলে, সে ভাষার অপপ্রয়োগ করবে মাত্র। [টীকা : রমাপতির কথায় ওদের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাসটুকু পাওয়া গেলো। এবারো আমরা চটে' উঠ্‌তে পার্‌তাম, কিন্তু রোগ সাবানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয় তারই জন্য সতর্ক থাকা ভালো বটে, কিন্তু রোগ যদি একবার হয়ই, তবে রোগীকে সেই উপদেশ দেওয়ার চেয়ে চিকিৎসা করাই সদ্বিবেচনার কাজ হ'বে।]

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো। রমাপতি হঠাৎ এমন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? নিরাকুল কণ্ঠে বল্‌লুম: বিয়েটাকেই তুমি প্রীতির একটা চরম পরিণতি বলে' বিশ্বাস কর কেন? ওর সমগ্র রূপটি যখন চোখের সাম্‌নে তুলে ধরি তখন ঘৃণায় আমার আত্মা অশুচি হ'য়ে ওঠে। তোমাকে আমি সেই গ্লানির মাঝে দেখ্‌তে চাইনে, রমাপতি। [টীকা: রমাপতির নামটা উচ্চারণ করে' ইন্দিরা সাহসের পরিচয় দিয়েছে।] দু'টো শরীরকে একত্র বেঁধে যে নূতন একটা ব্যাধি সৃষ্টি হয়, তাকে তুমি যতই সম্মান দাও না কেন, আমি তার অমর্যাদা করি। তোমাকে অভয় দিলুম রমাপতি, এ দেহ আমার নিজের—অতৃপ্ত আত্মা তোমার। [টীকা: লিখ্‌তে বসে' কথাগুলিকে ইন্দিরা নাটকীয় করে' তুলেছে—কেননা সাধারণত অভিধান সাম্‌নে রেখে সে কথা কয় না, তাই সন্দেহ হচ্ছে রমাপতিকে দাদা না বলার জন্যে যে খানিক আগে ওকে তারিফ্‌ করেছিলাম সেটা ভুল ও হ'তে পারে। ওটা বোধ হয় নেপথ্যের সাহস—প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চের নয়।]

এততেও রমাপতি সম্পূর্ণ সুখী হ'ল না, বললে: তোমার দেহের ওপর যে আমার খুব লোভ আছে তা মনে কোরো না, ইন্দিরা। আমি কখনোই এতো বড়ো অমানুষ হ'ব না যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাবি খাটাতে যাবো। তুমি সংসারে সন্ন্যাসিনী থেকো—আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রেখো, আমার সংসারে। তবু তুমি আমার সঙ্গে এসো ইন্দিরা। বেশ, এই এক্‌স্‌পেরিমেন্ট্‌টাই করা যাবে—তা ছাড়া এই একটা বর্বর রীতিকে সংশোধন করা চাই।

বললুম : আমাকে ভাববার সময় দাও, রাত্রে এসো।

রমাপতি ধীরে বললে : তোমাকে আমার চাই, আমার কর্মের অনুপ্রেরণা রূপে—তোমাকে কাছে না পেলে আমার তপস্যা নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌বে, ইন্দিরা। [টীকা : মেয়েমানুষ যে কখনো পুরুষের সাধনার সহায়ক হ'তে পারে এই প্রথম শুন্‌লাম। এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌টা নতুন বটে।]

সময় চাইলুম বটে, কিন্তু ভেবে নিতে আমার এক মিনিটেরো বেশি লাগ্‌লো না। রমাপতির সঙ্গে আমি যাবো না; না। তার কারণ খুব সহজ; প্রথমত বিবাহের স্থূলতা আমার সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করবে; তা ছাড়া দিবারাত্র রমাপতির সান্নিধ্যে থেকে আমি যে তপস্বিনী থাক্‌তে পারবো নমনীয় স্নায়ুগুলোর ওপর আমার তত বিশ্বাস নেই। ব্যাপারটাকে আমি সর্বান্তঃকরণে উপেক্ষা করলুম। কিন্তু এর চেয়েও যে-কারণটা সত্য সেটা আমি প্রকাশ করছি। সেটা হচ্ছে এই—[টীকা : এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ ইন্দিরা থেমে গেছে। কর্মান্তরে যেতে হয়েছিলো হয়তো।]

কথ্য বাঙ্‌লা ভাষা যে কী জোরালো বাবার মুখের গাল খেয়ে হৃদয়ঙ্গম করলুম। কী যে আমাকে না বললেন ভেবে পাইনে; কান দুটো অত গরম না করে' যদি কান পেতে শুন্‌তুম ত' আমার শব্দসংগ্রহের তালিকাটা বেড়ে যেতো। মজা এই, একটি কথারো প্রতিবাদ করলুম না; প্রতিবাদ যে করা যায় না তা নয়—করলুম না কারণ কোলাহলকে আমি বরদাস্ত

কর্‌তে পারি নে, তা মনকে যে বিক্ষিপ্ত করে তা নয়, কলুষিত করে। অধোবদনে চুপ করে' সবগুলি গালই হজম কর্‌লুম,—জানালা দিয়ে যতগুলি শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-আত্মীয়া একটা রোমহর্ষণ লড়াই দেখ্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলেন, তাঁদেরকে বঞ্চিত কর্‌তে হ'ল।

আমি পারিবারিক শান্তি নষ্ট কর্‌তে চাই নে। আমার ভেতরে এমন উদ্বৃত্ত শক্তি নেই যে সমস্ত অশান্তি-অত্যাচার অতিক্রম করে' তৃপ্তির স্বাদ পেতে পারি। তা ছাড়া, পরিবার-পরিজনকে ক্ষুণ্ণ কর্‌লে তার যে একটা নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া হ'বেই রমাপতির সাহায্য না নিয়েও বিজ্ঞানের এই সামান্য তথ্যটুকু বুঝ্‌বার বুদ্ধি আমার আছে। নিজের সুখের জন্যে আর সবাইকে বিমুখ করে' তুল্‌ব এতো বড়ো দুঃসাহস আমার নেই। আমি সত্যিই আত্মবঞ্চনা কর্‌ছি না, আমার ভীরু-তাকে সমর্থন কর্‌তে যাওয়ায় আমার দরকার কি? আমি যে ভীরু, পরনির্ভরশীল সে-কথা স্বীকার কর্‌তে আমার লজ্জা নেই। আমি রমাপতিকে ভালোবাসি, রমাপতির জন্যে শকুন্তলার মতো তপস্যা আমাকে খুব মানাবে—তার জন্যে আমি শুভকামনার দীপ জেলে' প্রতীক্ষা করে' থাক্‌বো, এ-জন্মে না হয়, অমৃততীর্থে। [টীকা: পরজন্মে বিশ্বাস করাটা ভাব-প্রবণ বাঙালি-মেয়ের বিশেষত্ব। তবু ইন্দিরাকে একটু স্বতন্ত্র বল্‌তে হ'বে, কেননা পরজন্মে সে আবার এই পৃথিবীতেই আস্‌তে চায় নি।] সংসারের আর সবাই যেটাকে একান্ত অপ্রার্থিত বলে' ছুঁড়ে ফেল্‌তে চায়, ধূলায় লুণ্ঠিত হ'য়ে সেই বস্তুটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধর্‌লেই খুব বড়ো একটা কিছু

লাভ করতে পারবো বলে' ত' আমার মনে হয় না। তার চেয়ে এই নির্জনে গভীর বিচ্ছেদবেদনায় এই আমার বিপুলতর মহত্তর উপলব্ধি, রমাপতি। সহজ হ'বার সাধনাই বড়ো সাধনা, সামঞ্জস্যই আমার বড়ো কাম্য। [টীকা: অলিখিত অংশটুকুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যা হোক্।]

জান্‌লার ধারে চেয়ার টেনে বসে' ছিলুম, জান্‌লার পরপারে বারান্দায় রমাপতির আবির্ভাব হ'ল ; একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বোধ হয়, রমাপতির স্বর শুনে শিউরে উঠ্‌লুম। রমাপতি বললে: চলে' এসো ইন্দিরা, রাস্তায় নাম্‌লেই ট্যাক্সি পাবো। বেশি দেরি কোরো না। আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে অলক্ষিত বিরাট পৃথিবী যেন বায়স্কোপের ছবির ফিতার মতো ঘুরে যেতে লাগ্‌লো, আকাশ দু'লে উঠেছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে' বললুম: না। রমাপতি কি যেন ফের বললে, শুন্‌তে পেলুম না, কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। এবার জান্‌লাটাকে আরো ঘেঁষে রমাপতি কাতরকণ্ঠে কি যেন আবার বল্‌ছে, কঠিন হ'য়ে জান্‌লা ধীরে বন্ধ করে' দিলুম। [টীকা: রমাপতির কাতর কণ্ঠে বল্‌বার জন্যেই নিশ্চয়। সে যদি খুব পুরুষবচন প্রয়োগ করতে পারতো, তবে এই কৃত্রিম অবরোধ আর বেশিক্ষণ রক্ষা করা ইন্দিরার সাধ্য ছিলো না, কেননা তার চোখে 'আকাশ দুলে' উঠেছিলো, পৃথিবীও উঠেছিলো টলে'। রমাপতি তা'র জীবনের পরমতম মুহূর্তটি এমন অবহেলায় হারিয়ে ফেল্‌লো সামান্য accent ভুল করে'! রমাপতি তার নাম বদ্‌লে নিক্—রমাপদ!]

মাগো, কী মুক্তিই আমি ভোগ করছি! রমাপতি চলে' গেছে অপমানিত হ'য়ে,—যেন বেঁচে গেছি! এই পারিবারিক শান্তিতেই আমার পরমার্থ। বাক্যযন্ত্রণা যে কী যন্ত্রণা যে না সয়েছে তার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। বাবা মা'র ধারালো জিভ্ দুটো একটু জুড়িয়েছে,—কাকিমাদের অভদ্র ইঙ্গিত করা এবার বুঝি ক্ষান্ত হ'ল। খুব ঠেসে পড়্ছি—ইংরেজি সাহিত্য নয়, ইকনমিক্স্, ইকনমিক্স্ যদিও আমার সাবজেক্ট নয়। পড়ছি মনকে বাধ্য করতে, কঠোর নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত করতে। সকলের কাছ থেকে সরে' গিয়ে কোণটিতে বসে' আমার ঘরের মধ্যে আকাশকে অনেক ছোট করে' এনেছি। গিয়ে অবধি রমাপতি এক খানিও চিঠি লেখেনি। [টীকা: ডায়রিটি ছোট, মনে হচ্ছে ইন্দিরা এখনো তার বিচ্ছেদের অশ্রু-সমুদ্র পেরিয়ে আসেনি।]

বেশ ছিলুম, চুপচাপ, প্রায় আত্মসর্বস্ব হ'য়ে। ইকনমিক্স্টা অঙ্কের মতোই শুকনো, তাই এখন পলিটিক্স-এ [টীকা: পলিটিক্স-পাঠে] মন দিয়েছি। রমাপতি এখন প্রায় একটা সুস্বপ্নের সুখকর স্মৃতির মতো অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে। ওর ঠিকানা জানিনে বলে' মনে উদ্বেগের বদলে শান্তিই বিরাজ করছে! বেশ ছিলুম, ভেবেছিলুম, একটা আয়ত্তাতীত দুর্লভ আদর্শের মতো রমাপতি চিরকাল আমার নাগালের বাইরে অধিষ্ঠান করবে [টীকা: এক কথা পুনঃপুনঃ বলাটা ভাষাসৌষ্ঠবের পরিচয় নয়! 'আয়ত্তাতীত' 'দুর্লভ' 'নাগালের

বাইরে' এই বিশেষণাধিক্যের প্রয়োজন ছিলো না।] আর আমি একদিন কালিন্দীর মতই অপার ব্যর্থতায় ডুবে যাব। [টীকা : বোঝা গেলো কালিন্দী আর নেই। কিসে মারা গেলো ও ? গ্রবিউল্ খেয়ে, না, অস্ত্র করতে গিয়ে ? 'অপার ব্যর্থতা' কিন্তু কালিন্দীর বেলায় ভিন্নার্থ-সূচক। অকাল মৃত্যুই কালিন্দীর ব্যর্থতা। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দিরার মতটা এখানে একটু আধুনিক হয়েছে।]

সংসারের আবিল আবর্ত থেকে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছিলুম, হঠাৎ আবার কোলাহল উঠলো। বাবা এততেও আমার জন্যে নিশ্চিন্ত হ'ন নি ; কোথা থেকে একটি পাত্র জুটিয়ে এনেছেন, সে আমাকে পছন্দ করতে শিগ্‌গিরই একদিন সশরীরে আবির্ভূত হ'বে ; যদি আমি তার সংসার-সুখবিধায়িনী বলে' মনোনীত হই তবে আসন্ন শ্রাবণেই আমাকে দাসী হ'তে হ'বে। নির্ভুল বিধান ! কিন্তু জিহ্বাকে এবার আর শাসন করতে পারলুম না ; বিদ্যুদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে' উঠলুম : না। এ-সব ক্ষেত্রে যুক্তিবহুল দীর্ঘ বক্তৃতা করায় আমি অভ্যস্ত নই—ঐ একটি শব্দই স্থিরলক্ষ্য মৃত্যুবাণের মতো বাবা-মা'র কল্পনার প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ করে' দিলো। [টীকা : 'না' বলার সঙ্গে ইন্দিরার গ্রীবা-ভঙ্গিও অর্থটাকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে। কেন না প্রত্যেকটি বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে কম-বেশি যে-সব অঙ্গ-সঞ্চালন হয়, সেই ভঙ্গিগুলিই অর্থের সম্পূর্ণতা দান করে।] মুহূর্তমধ্যে আমার মাথার ওপর ঝড় ভেঙে পড়লো—সেই কোলাহলে কান পাতে কা'র সাধ্য। অকারণে বাবা আবার বেচার

রমাপতিকে লক্ষ্য করে' গর্জাতে লেগে গেছেন, মা'র বিষোদ্গার বিরাম মান্‌ছে না, কাকিমাদের অভদ্র ইঙ্গিত সুরু হয়েছে। কাকাদের একটা বন্দুক ছিলো, রতু কাকা [টীকা : নাম বোধহয় রতন কিংবা রতিপ্রসন্ন!] সেইটে নিয়ে রমাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করতে [টীকা : বন্দুকে মুণ্ডচ্ছেদ হয় না] এখুনিই বেরিয়ে পড়লো বুঝি। প্রতি মুহূর্তে জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠতে লাগলো। অপ্রকাশ্যে যে অপবাদ চলেছে তার জ্বালা আমাকে দগ্ধ করে' দিচ্ছে। [টীকা : রমাপতির সঙ্গে 'তথাকথিত' আত্মীয়তাটার জন্যেই এমন একটা পৈশাচিক গোমলাল হচ্ছে।]

হাঁপিয়ে উঠলুম, কিন্তু কিছু যে একটা করব তা'র পথ পেলুম না। যদি বাইরে বেরিয়ে যাই, কতদূর গিয়েই হয় তো হঠকারিতার জন্যে অনুতাপ করবো। অনুতাপ আমি করতে পার্‌বো না, [টীকা : যেন ইন্দিরা ততখানি ভীরু নয়।] মরে' গেলেও নয়, যা আমি করবো তার ফল-ভোগ করবার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌বো। তাই আবার সংসারে শান্তি আনবার জন্যে রাজি হ'য়ে গেলুম। আমার আত্মবলি ইফিজেনিয়ার চেয়ে কম কিসে?

সকালবেলা ভাবী বর এসেছিলেন আমাকে দেখতে; ভালো করে' দেখাবার জন্যে কাকিমাদের নির্দেশ মতো রঙিন শাড়ি পরলুম, আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখে ঠেসে স্নো ঘষতেও ছাড়লুম না। আমার দেহটা যে এত প্রখররূপে অভিব্যক্ত আজ টের পেয়ে আমার লজ্জার আর সীমা রইলো না। অনাবৃত হাতের তালু দুটোকে পর্যন্ত কুৎসিত মনে হ'তে

লাগলো। মনে হ'ল একটা হিংস্র মাংসলোলুপ পশুর সামনে অগ্রসর হচ্ছি।

ভদ্রলোকটি প্রথমেই সাফাই গাইলেন ছোটকাকাকে লক্ষ্য ক'রে: আমাদের দেশে মেয়ে-দেখার এই প্রথাটা সাঙ্ঘাতিক রকম বর্বর; কিন্তু এ ছাড়া উপায়ো নেই কিছু, কেননা স্বাধীনভাবে মেলা-মেশাটা এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। অগত্যা এই পথেরই শরণ নিতে হচ্ছে। তা ছাড়া মিশতে পারলেই যে মিলতে পারা যাবে তার মানে নেই, কেননা হৃদ্যতা ও বিয়ে সমান-স্তরের জিনিস নয়। কাকারা ঘাড় নেড়ে খুব সায় দিতে লাগলেন।

ভদ্রলোক সামান্য দুয়েকটি যা প্রশ্ন করেলেন সোফায় বসে' ঘাড় হেঁট ক'রে ঠিক-ঠিক জবাব দিলুম, একটা গান শুনিয়ে দিলুম পর্যন্ত। বলা বাহুল্য আমার চেহারাটা তাঁর মনে ধরেছে।

এখন কী করবো বল্‌তে পারো, রমাপতি? আমি এখন আগাগোড়া একটা মাটির ঢেলা, একটা কামময় মাংসপিণ্ড। আমার মন কলঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে, দেহ ভরে' আমাকে কলুষ বহন করতে হ'বে। সৌন্দর্যের অমরাবতী থেকে আমি নির্বাসিত হ'লুম; দূরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার এ অপমৃত্যু আর দেখো না।

শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রে পা দিয়েছি, রমাপতি। তুমি কোথায়?

কী লোভী এই পুরুষ! প্রণয়োপসনা বরে' চিত্তজয় করবার প্রতীক্ষাটুকু পর্যন্ত তার সয় না, কর্কশ বাহু বিস্তার করে' দেয়। অমানুষিক ঘৃণায় সরে' গিয়ে নিজের নারীত্ব রক্ষা করি।

স্বামীর সন্দিগ্ধ হ'বার কারণ ঘটলো। আমার প্রাগ্-বিবাহযুগের কি-একটা শ্রুতিমধুর কলঙ্ক-কথা তাঁরো কর্ণগোচর হয়েছিলো, তিনি মনে-মনে সেটাকে অতিরঞ্জিত করতে বসলেন। আমার এই ঔদাসীন্য এই অন্যমনস্কতা সবই যে রমাপতির বিচ্ছেদব্যথার পরিণাম এমন একটা নিষ্ঠুর কথা আমার সামনে বলতে স্বামী সংকোচ করলেন না। [টীকা: ইন্দিরা বেশ রীতি-মাফিক্ হ'য়ে উঠেছে, স্বামীর নাম লেখনীর মুখে আনছে না পর্যন্ত।] স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ ঘৃণায় কুটিল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। সংসারে আবার হলাহল উঠলো।

খবরটা ও-সংসারেও ছড়িয়ে পড়লো, স্বামীর বন্ধুমহলেও। বাবা ফের তর্জন-গর্জন সুরু করলেন, মা কান্নাকাটি, কাকাদের মর্চে-পড়া বন্দুক আবার তেল মেখে ঝক্‌ঝক্ করে' উঠলো। প্রবাসী রমাপতির লাঞ্ছনার কথা ভেবে আমার দুঃখের আর শেষ রইলো না।

বিক্রীত মনে রমাপতিকে ডেকে এনে তাকে অপমান করবো আমি রমাপতিকে অত ছোট মন নিয়ে ভালোবাসি নি। আমার পৃথিবীতে আর তার পদরেখা পড়বে না, বিস্মরণের কূলে তার চিতারচনা করেছি। আমার এই ঔদাসীন্যের মূলে রমাপতির বিচ্ছেদ নয়, এই নিরর্থক

দেহসর্বস্ব বিবাহ। অথচ এই যোয়ালই আমাকে বইতে হ'বে, মুক্তি আমি পাব না, পেতেও চাই নে। একটা উদ্যত কুশ্রীতা থেকে আত্মরক্ষা করছি মাত্র। কিন্তু ঝড়ের ফণা লেলিহান হ'য়ে উঠেছে।

আমি যে আমাব স্বামীকে খুব ভালোবাসি তার একটা লৌকিক প্রমাণ না দেখাতে পারলে রমাপতির লাঞ্ছনা ও অপমান সমাপ্ত হবে না। অতএব উৎসুক স্বামীর কাছে অপ্রতিরোধে আত্মদান করলুম। সে-গভীর পরাজয় সে-অনপনেয় দাসত্বেব লজ্জা আমাকে মুখ বুজে' সইতে হচ্ছে। আমার দেহ রাহুপৃষ্ট চন্দ্রের মতো অপবিত্র হ'য়ে উঠলো; সে-রাতে কত যে কাঁদলুম বল্‌তে পারি নে।

স্বামী প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছেন, আমি ভাল করে' কর্কেট্‌ আরম্ভ কবেছি। এ লজ্জা আমার ঘুচবে কবে? রমাপতি, এই মর্যাদাহীন আত্মবিক্রয়েব গ্লানি আমি সইতে পারছি না।

কয়েক মাস যেতেই টের পেলুম আমার শরীরটা অসমঞ্জস হ'য়ে উঠ্‌ছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে দেরি হ'ল না। ছি ছি, পরাজয়ের শেষ কলঙ্ক-কালিমায় আমার সর্বাঙ্গ লিপ্ত হ'য়ে গেলো। এখন মরতেই শুধু বাকি আছে। ছি ছি ছি—ঘৃণাটা তবু সম্যক্‌ প্রকাশ কবতে পারছি না। এই অবাঞ্ছিত সন্তানধারণে গর্ব কোথায়, কিসের আনন্দ? যে-মিলনের পারস্পরিক সমন্বয় ছিল না, সেটা তো দৌরাত্ম্যেরই নামান্তর বলতে হ'বে। তবু স্বামী খুশি হয়েছেন, পঞ্চামৃতের দিন ঠিক করে' শাশুড়ি পাঁচ ঝাঁক উলু

দিয়ে উঠলেন, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলুম। দৌহিত্রের জন্মসম্ভাবনার সংবাদ পেয়ে এক লেফাফায় মা-বাবা আনন্দ-অভিনন্দন পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে কাকি-মারাও খেলো রসিকতা করে' পাঠিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া যে কী গর্হিত কী বীভৎস ভাবতে পারিনে। সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করলুম, অথচ স্বামীর কাছ থেকে সতীত্ব রক্ষা করতে পারলুম না।

আমার সেই সোনার দেহ! নরদুর্লভ সৌন্দর্যের উপাসনা করবো এই ছিলো আমার অভিলাষ, নিজের আত্মাকে পবিত্র, দেহকে পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিকে জ্যোতিষ্মান করবো এই পণ করে' রমাপতিকে ভালোবেসেছিলুম; কিন্তু আমার যে কী অধঃস্খলন ঘটেছে তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? আমার আত্মা লুণ্ঠিত, দেহ কলুষিত, দৃষ্টি কৌতূহলী! আমি এখন একটা যন্ত্র মাত্র। [টীকা: ইন্দিরাকে মোটামুটি আমরা ক্ষমা করলাম। সে রমাপতিকে বিয়ে করে' অসামাজিক অন্যায়াচরণ করে নি, দস্তুরমতো গোত্রান্তরিত হ'য়ে বিয়ে করেছে, এবং আদর্শ স্ত্রীর মতো এক বৎসর না পেরতেই সন্তানের জননী হ'তে চলেছে। সমাজ ও আইন মনের অপ্রকাশ্য তত্ত্বাদি নিয়েই মাথা ঘামায় না, বাইরের ক্রিয়া নিয়েই তাদের কারবার। তাই সমাজ ও আইনের বিচারে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বেকসুর খালাস পেলেন।]

ডায়রি-পড়া সাঙ্গ করে' অশ্রু হাই তুল্লো। ইন্দিরা ঘরের কাজে মন দিয়েছে। অশ্রু একবার চোখ ভরে' ইন্দিরাকে দেখে নিলো। চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে সত্যি করে' দেখা হয় না; চোখের দৃষ্টি অনন্যলক্ষ্য হ'য়ে ওঠে বলে' দেখাটা হয় সংকীর্ণ। কিন্তু যাকে দেখা যায় সে যদি চোখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক, উদাসীন থাকে, তবেই তাকে সম্পূর্ণ ও অসীম করে' দেখা হয়। মানুষের আত্মার পরিচয় চোখের তারায় বা মুখ-মুকুরে—এ-মতটা বিকল্পেও সত্যি নয়। মানুষের আত্মার পরিচয় একমাত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—গ্রীবা-সঞ্চালনে, কখনো-কখনো বা ডান হাতটি বাড়িয়ে দেওয়ায়। তাই ইন্দিরা যে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটা ময়লা নেকড়া দিয়ে আলমারির কাঁচ সাফ করছে—শুধু ঐ পেছন-ফিরে-দাঁড়িয়ে থাকাটুকুর মধ্যেই তার অসীম বেদনার ছায়া পড়লো। নেহাৎ যে আনাড়ি সে-ও ইন্দিরার এই আলস্যমন্থর অবস্থান-ভঙ্গিটি দেখে ঠিক ঠাহর করে' নিতে পারবে যে সে এত শ্রান্ত যে, স্থূল বৃন্তবন্ধন ছেড়ে একটি ক্ষীণ বিলীয়মান সুগন্ধ হ'য়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারলেই বুঝি সে বাঁচে, সে এত ব্যর্থ যে চাঁদ অস্ত গেলে নিশীথ-রাত্রির নদীর যা অবস্থা, তারো ঠিক তাই। অশ্রু তাড়াতাড়ি খাতাটা মুড়ে রেখে ইন্দিরার খোঁপার ওপর ধীরে হাত রাখলো।

ব্যথা অশ্রু বোধ করতে পারে বটে, কিন্তু ঘেঁটে ঘেঁটে তাকে ফেনাতে তার লজ্জা হয়। তাই সোজা মুখের ওপর সে বলে' বস্লো: তোমার ষ্টাইল্‌টি চমৎকার, ইন্দু। ষ্টাইল্‌ই নাকি ব্যক্তি—তারো চেয়ে বড়ো সত্য—হাতের লেখাটাই ব্যক্তিত্বের বড়ো সার্টিফিকেট। বার্নার্ড শ'র লেখা পড়ে'ই মনে হবে যে তাঁর হাতের লেখা বিচ্ছিরি; তোমার হাতের লেখা দেখে নিশ্চয়ই মনে হ'বে যে তোমার অনুভূতিগুলি মানুষের রক্তের চেয়েও গাঢ়, সমাহিত দুঃখের চেয়েও গভীর

তোমার কথারই আমি পুনরুক্তি করছি: তুমি অত বেশি গভীর হয়েছ বলে'ই কবি হ'তে পারলে না। তবু তুমি বেঁচে গেছ। তুমি লেখ।

কথাটায় অশ্রু এতো জোর দিয়ে বস্‌লো যে ইন্দিরা উঠলো চম্‌কে।

—হ্যাঁ, তুমি লেখ। সেই তোমার বিশীর্ণ জীবনের বসন্ত হ'য়ে উঠুক; শকুন্তলার তপস্যা যেমন প্রেমের, তোমার তপস্যা হোক্ তেমনি গভীর আত্মবিবৃতির। নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করা চাই—উলঙ্গ উজ্জ্বল উদার! কারু প্রকাশ কর্মে, কারু বা কর্মহীন আত্মোপলব্ধিতে। কেউ হাতে নেয় লাঙল, কেউ বা অস্ত্র, কেউ বা কলম। তুমি কলম নাও ইন্দিরা।

ইন্দিরা হাসলো। বললো—পাগল আর কাকে বলে? বিধাতা আমাদের হাতে আঙুল দিয়েছেন কলম বা তুলি ধরতে নয়, আলমারির কাঁচ সাফ করতে। আজ যদি কলম ধরে' আঙুলের অপব্যবহার করি, তা হ'লে লক্ষ্মীর শাপে ঘরের কলসের জল আমার শুকিয়ে যাবে। কতো আমার কাজ এখনো পড়ে' আছে, জানো? যে আসছে তার জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হ'বে, ঝিনুক ধরে' দুধ খাওয়বার অভ্যাস করতে হ'বে, তার অসুখ করলে ডাক্তারের জন্যে জ্বরের তালিকা তৈরি করে' রাখতে হ'বে। তা ছাড়া আমার আর কিছুই লেখবার নেই, অশ্রু। এককালে লিখেছিলুম, কারণ রমাপতির কাছে জবাবদিহি না দিয়ে আমি পার পেতুম না। রমাপতি কাছে ছিলো না বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে' ছিলো। এখন আমি বন্দিনী, শুধু সংসারে নয় অশ্রু, আমার দেহের কারাগারে।

অশ্রু জিগগেস না করে' পারলো না: রমাপতি কোথায় এখন?

ইন্দিরার মুখের ভাবের একটুও পরিবর্তন হ'ল না। তেমনি বললো—জানি না। তার খোঁজ করতে আমার স্পৃহাও নেই।

আমার এত উদ্বৃত্ত শক্তি নেই অশ্রু যে, রমাপতিকে মনে-মনে চিরস্মরণীয় রেখে ছু' বেলার দৈহিক কর্তব্যগুলোকে সুসম্পন্ন করতে পারবো। সঙ্ঘর্ষ বাধিয়ে তা সহ্য করবার মত আমার মেরুদণ্ড বলশালী নয়! তাই রমাপতিকে আমি হারিয়ে যেতে দেয়েছি। ছেলেবেলার মার কোলে শুয়ে গাছের পাতার ফাঁকে যে-আকাশ দেখা যায় সে-আকাশকেও পরে মনে হয় ধুলো দিয়ে তৈরি। আমি রমাপতিকে ভুলতে পেরেছি বলে'ই তাকে ভালোবেসেছিলুম বলে' আর অনুতাপ করি না।

এ-উত্তরে অশ্রু খুশি হবে কেন? তাই ফের জিগ্‌গেস করলো: কিন্তু যা তুমি দেহে-মনে একান্তরূপে বিশ্বাস করেছিলে তার থেকে এতো সহজে তুমি ভ্রষ্ট হ'লে কেন? আমি হ'লে—রমাপতির সঙ্গে না হোক্‌, নিজে একা বেরিয়ে পড়তুম।

ইন্দিরার মুখে আবার সেই ম্লান হাসি। বললো—আর আমি একটিও কথা না কয়ে' গলায় আঁচল জড়িয়ে নীচু হ'যে' প্রণামের ভঙ্গিতে ঘাতকের খড়্গ আহ্বান করলুম, অশ্রু। আমি না বলতে পারি কথা, না পারি করতে প্রতিকার। আজ মৃত্যু যদি আসে, আমি এমন দুর্বল যে একবারো বলবো না হয় ত': না, আমি মরতে চাই না। আমি ধীরে দু' বাহু প্রসারিত করে' দেব! কিন্তু বলো: কেরোসিন ঢেলে দেশলাইর কাঠি ধরাও, ভয়ে আমার বাথ রুমে ঢুকে দু' ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হ'বে। মরবো ভাবলে আমার ভারি তৃপ্তি লাগে, কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় আমাকে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে হ'বে ভাবলে আমার না পায় খিদে, না থাকে ঘুম।

ইন্দিরার কতকগুলি রুক্ষ চুল হাতে নিয়ে অশ্রু বললো—কিন্তু চেহারার এ কী ছিরি করে' রেখেছো? মরবে কি করে'? এ-রূপ দেখে যমেরো রুচি হবে না যে।

ইন্দিরার স্বর শুকনো, কঠিন হ'য়ে উঠলো : যে-যমের রুচিতে আমার দেহ এ-রূপ ধরেছে তার থেকে ত্রাণ পেলেও যে আমি বাঁচি। কিন্তু অত কথায় কাজ নেই অশ্রু, খানিক আগে বিমল এসে খবর দিয়ে গেলো রাত্রের গাড়িতে কর্তা আসছেন।

অশ্রু উৎফুল্ল হবার ভাণ করলো : তাই নাকি? তা হ'লে তৈরি হ'তে হয়।

—তৈরি! কেন?

—বাঃ, একটা বাক্‌যুদ্ধ হ'বে না?

—বাক্‌যুদ্ধ কেন?

—তোমার এই দুরবস্থা কেন করলো? তার কি অধিকার ছিলো?

ইন্দিরা এবার হেসে ফেল্‌লে। বল্‌লো : দুরবস্থা তুমি কাকে বলছ? এই আমার ইহজীবনের লক্ষ্য, নারীজীবনের পরমার্থ যে! আমার স্বামী আমাকে আদর্শ গৃহিনীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রতি আমার এত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাঁর প্রতি একটিও নির্দয় উক্তি আমি সইবো না।

অশ্রু হেসে বল্‌লো : শুনে খুশি হ'লাম। কিন্তু প্রভাতের কোনো খবর আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। ও এলে দিব্যি লাক্ষ্মৌর দিকে ভেসে পড়তাম।

—আমার স্বামীর সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ না করে'ই?

—তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার নিজের লাভের জন্যে লড়াই করার আর কোনো'ই ত' দরকার নেই। তোমার মতো আমি এমন সর্বস্ব দিয়ে লাভ করতে চাই নি বলে'ই ত তাকে আমি ছেড়েছি। তুমি তোমার স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে থাক, আমি এমন মারাত্মক সুখ চাইনে, ইন্দিরা।

অশ্রু সরে' যাচ্ছিলো, ইন্দিরা তার আঁচলটা ধরে' ফেল্‌লে। বল্‌লো —তুমি এখানে আছ জান্‌লে আমার স্বামী নিশ্চয়ই এক বিঘৎ হাঁ করে' বিস্ময়ে চিৎকার করে' উঠ্‌বেন। জান ত', তোমার প্রতি তিনি তত ভক্তিমান নন্‌ যে, গ্রীকদের মতো কোনো সংবাদ জিজ্ঞাসা না করে'ই পাদ্য-অর্ঘ নিয়ে অতিথিকে সম্বর্ধনা করবেন! সত্যিই, তৈরি থাক, অশ্রু।

অশ্রু খিলখিল করে' হেসে উঠলো। বললো—এ তুমি নিশ্চয়ই স্বামীর প্রতি নির্দয় ভাষা প্রয়োগ করছ। তুমি আজো তত বড় সতী হ'য়ে উঠতে পারো নি। দাঁড়াও, প্রভাতকে একটা চিঠি লিখে আস্‌ছি ফের। আরো কথা আছে।

ধীরে ধীরে বিকেল হ'য়ে এলো। আটটা বাজতেই নির্মলের ট্রেন এলাহাবাদ পৌঁছুবে। বাড়িতে আসতে কতটুকুই বা পথ! ধরা যাক পাঁচ মিনিট—সঙ্গে মাল-পত্র থাকবে না বলে' হেঁটে আসবারই সম্ভাবনা। আরো ঘণ্টা তিনেক বাকি আছে দেখছি। অশ্রু এতো সময় কর্‌বে কী? হঠাৎ মনে পড়লো বীণা ও বিমলের সঙ্গে তার আজ যমুনায় বেড়াতে যাবার কথা আছে। ফিরতে যদি রাত বেশি হ'য়ে যায়? তার চেয়ে প্রভাতকে একটা লম্বা চিঠি লেখা যাক। কেন যে এতদিন ও চুপ করে' থেকে চিন্তিত করছে—

দরজায় টোকা পড়লো। বিমল বললো—তৈরি হয়েছেন, অশ্রু-দি? বীণা এসেছে।

দরজা খুলে অশ্রু বেরিয়ে এলো। শুকনো মুখে বললো—বড্ড বিচ্ছিরি মাথা ধরেছে, তোমরা দু'টিতেই বেড়িয়ে এসো। আমাকে আরেক দিন নিয়ে যেয়ো না-হয়।

অশ্রু-দির সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনায় দারুণ খুশি হ'য়ে বিমল আর বাগ্‌বিস্তার না করে চলে' গেলো। দাদা আসছেন, তাই ঘর-

দোর ফিট্‌ফাট্‌ করে' রাখতে বৌদি' ত ব্যস্তই থাকবেন। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে বৌদির নৌকায় বেড়াবার সখ নেই। বৌদি যে অশ্রু-দির সমবয়সী, এ-কথা কেউ শপথ করে' বললেও বিমল বিশ্বাস করতো না; কেন না বিয়ে করলেই লোকে বুড়ো হয় কি না ঠিক নেই, তবে লোকে বুড়ো হ'লেই বুঝি বিয়ে করে। তবু, বৌদিও সঙ্গে যাবেন বলে' বীণার অভিভাবকদের মত নেওয়া হয়েছে বলে', তাঁকেও একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। বীণা জানুক, নেহাৎ ভগবান সদয় বলে'ই বৌদিও মুখ ফেরাবেন।

—যমুনায় বেড়াতে যাবে বৌদি? ফোর্ট থেকে ব্রিজ্‌।

—দূর্‌ পাগলা।—বৌদি ঝাম্‌টা দিয়ে উঠ্‌লেন।

বিমল বীণার মুখের পানে চেয়ে এমন একটু হাসলো যে সেই আনন্দের রঙ বীণারো সারা দেহে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়লো।

অশ্রু জানালা দিয়ে দেখতে পেলো বীণা আর বিমল টাঙায় গিয়ে উঠ্‌লো—কোচোয়ানের পেছনে—পাশাপাশি। দু'জনেই নীরব, স্পর্শ-বিরহিত। বসবার জায়গায় বীণা নিজের শাড়িটাকে পর্যন্ত বিস্তৃত হ'তে দেয় নি, নিজের চতুর্দিকে সংকুচিত করে' রেখেছে—পাছে তার সামান্য একটু ছোঁয়া লেগে এই নির্বচন গভীরতার তপোভঙ্গ হয়। বিমল উদাসীন, যেন নিষ্ক্রিয় অসহযোগ আন্দোলনের নেতা! বীণা যে তার কাছে আছে, ঘিরে আছে নির্নিরীক্ষ্য বায়ুমণ্ডলীর মতো—এ-টুকু সে না-দেখে ও না-ছুঁয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেছে। কথা বলাটা অবান্তর, ছোঁয়াটা ছন্দপতন। বিমলের এই সেই বয়েস যখন মাধুরীকে ভালোবেসে গল্পে মাধুরীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনচ্ছলে মাধু ব'লে ডাকতে সাধ হয়। এই সেই বয়েস যখন বীণা যমুনার জলের ওপর নৌকোয় উঠে হঠাৎ ঠিক ঠাহর করতে পারবে না—কোন্‌টা বেশি সুন্দর, ইলিশ-মাছের

আঁশের মতো চিক্‌চিকে জ্যোৎস্না-ধোয়া জল, এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা না বিমলের মুখ। ব্যস্ততা নেই, প্রকাশ-প্রাচুর্য নেই, প্রশ্ন নেই, উত্তর নেই, লক্ষ্যাভিমুখী সন্ধান নেই—শুধু নিজের অনুভূতিতে নিজেই নির্বাসিত। এই সেই বয়েস! টাঙা যতোক্ষণ না অদৃশ্য হ'ল অশ্রু জানলা ছেড়ে উঠ্‌লো না। খানিকক্ষণ এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে' অশ্রু অবশেষে বাথ-রুমে গিয়ে ঢুকলো গাত্রমার্জনা করতে। বিকেলে স্নান করাটা তার একটা দৈনন্দিন বিলাসিতা। ইন্দিরার মতো শরীর নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে বসেনি। যে যৌবন বাইরের খোলস মাত্র তা খসে' গেলে ওর দুঃখ নেই, কিন্তু যৌবনকে অতিক্রম করে'ও তার স্বাস্থ্য যেন এমনি দৃপ্ত থাকে। ও শুধু হৃদয়ানুভূতি দিয়ে নয়, দেহের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে আকাশ ও জীবনের আনন্দ পান করতে চায়। ওর এই দেহ মনকে আঘাত থেকে রক্ষা করবে, ম্লান হ'তে দেবে না—প্রাণকে বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে নিত্যকাল উন্মুখ, ধাবমান রাখবে—ওর এই স্বাস্থ্যই দেহকে কলুষিত হ'তে দেবে না। অশ্রু স্নানের ঘরেব দবজা বন্ধ করে' কাপড় ছাড়তে লাগলো। বাথ-রুমের উঁচু জানলা দিয়ে পডন্ত রৌদ্রের সোনার একটু টুকরো গামলার ওপরে পড়ে' ঝিক্‌মিক্‌ করছে। অশ্রু Donneএর ভক্ত—তাঁর অনেক লাইন তার মুখে-মুখে। এখন সে এই তিনটি লাইন আবৃত্তি করছে:

Full nakedness! All joys are due to thee:
As souls unbodies, bodies unclothed must be
To taste whole joys.

রাত বেশি হয় নি। কিন্তু নিঝুম ঘুমন্ত পাড়াটার দিকে তাকালে মনে হয় ভোর হ'তে বুঝি আর দেরি নেই। অশ্রু সাদাসিধে একখানি শাড়ি পার্‌লো; বিকেলের বাঁধা চুলগুলি খুলে ফেলে পিঠের থেকে দু'ভাগ করে' বুকের ওপর মেলে রাখ্‌লো। রূপোর একটা ঝুম্‌কো ফুল খোঁপায় গুঁজ্‌লে তাকে মানায় বটে, কিন্তু তাতে নেহাৎই চপলমতি কলেজের মেয়ে বলে' মনে হয়। তাই সে ইন্দিরার বাগান থেকে একটি রজনীগন্ধার কলি ছিঁড়ে এনে খোলা চুলের মধ্যে আলগোছে আট্‌কে নিয়েছে।

ইন্দিরা তোলা-উনুনে লুচি ভাজছে—স্বামী-সেবায় তার বেশ হাত খোলে। স্বামীর আহার যোগাতে সে কার্পণ্য কর্‌বে এতটা অনুদার সে নয়। তাই রাতের জন্যে সেজে থাক্‌তেও সে ভোলেনি। সতীত্বের একজিবিশানে ইন্দিরাকে গোল্ড্‌ মেডেল দেওয়া উচিত। স্বামীর সুবিধের জন্যে সে নিজেকে সতী বানিয়ে বসেছে।

সোনার অবসর। অশ্রু তাড়াতাড়ি নয়—খুব আস্তে, সংস্কৃত করে' বল্‌লে—মন্থর পদক্ষেপে নির্মলের ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লো। নির্মলের ঘরটা একটু বাইরের দিকে—একটা বারান্দা না পেরলে সে-ঘরের নাগাল পাওয়া যায় না। সেই বারান্দাতেই ইন্দিরা একটা কাঠের টুলে আয়েস করে' বসে' স্বামী-আপ্যায়নের যোগাড় কর্‌ছিলো। অশ্রুকে সে দেখে ফেল্‌লো। জান্‌তো বটে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর আজ রাতেই দেখা-করার জোর তাগিদ্‌ পড়েছে; খবরটা ইন্দিরার কাছে তার সন্তানধারণের চেতনার মতো মারাত্মক নয়। অশ্রু যেমন মেয়ে —এবং তার সঙ্গে ওর যতটা ঘনিষ্ঠতা, তাতে তার গায়ে-পড়ে' আলাপ করাটার ব্যাখ্যায় সে নির্লজ্জ বলে' অভিহিত হ'ত না। তবু অশ্রুকে আজ যেন ওর কেমনতরো লাগলো। অশ্রুর মধ্যে আজ সব চেয়ে অত্যুগ্ররূপে প্রখর হচ্ছে এই—ও মোটেই আজ সাজ করেনি, নিতান্তই

খেলো একটি শাড়ি, মোটা একটা শাদা ব্লাউজ—এবং চুলের আড়ালে শুভ্র একটি রজনীগন্ধার কোরক—রমাপতির প্রতি ওর কিশোরকালের প্রথম প্রেমের সলজ্জ অনুভূতির মতো। রজনীগন্ধা দেখে হঠাৎ রমাপতিকে মনে পড়লো বলে' ইন্দিরার কাছে অশ্রুর এই নিরলঙ্কার চেহারা সন্দেহের কুয়াসায় কেমন-যেন ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠলো। ইচ্ছা হ'ল অশ্রুর আবির্ভাবের আগেই সে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করে।

বিয়ের আগে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর যে একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছ্‌ল সেটা ইন্দিরা আগে অস্পষ্ট করে' জান্‌লেও অশ্রু এমন মুখচোরা বা লাজুক নয় যে, শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালি মেয়ের মতো মূঢ় আত্ম সমর্থনের চেষ্টায় তা ফিকে বা ফাঁকা করে' তুলবে। বরং সে এমন স্পষ্ট ও প্রখর যে, রঙ ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে বিচিত্র করে' বর্ণনা করে' সে নিজের চরিত্রকে শ্লাঘ্য বলে'ই সপ্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছে। অন্যের কাছে যেটা হ'ত জঘন্য সেটা অশ্রুর কাছে নিতান্তই নগণ্য, বরং উল্টো করে' স্কুলপাঠ্য রচনার ভাষায় সেটা তার আত্মোপলব্ধির সোপানস্বরূপ! নির্মল যে তাকে দুই হাতে ঘৃণায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো সে-কথা গম্ভীর হয়ে বল্‌তে সে মনে বেশ জোর পায়, এবং যে-তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো তারই-দুয়ারে অবতীর্ণ হ'য়ে সে নতুন করে' বন্ধুতা প্রার্থনা করে! ব্যাপারটার মধ্যে স্বাভাবিকতা কিছু নেই—প্রস্তাব শুনে ইন্দিরা হেসেছিলো মাত্র, কিন্তু বাস্তবে অশ্রুর এই উদ্যোগ দেখে তাকে আশীর্বাদ করতে ওর হাত উঠ্‌লো না। বরং যে-লোক একদিন একটি মেয়ের এত সব অসদাচার ও অবরতার বিরুদ্ধে নিজের পুরুষত্বকে দুর্দাম রেখেছিলো সেই তার স্বামী, এ-কথা জেনে ইন্দিরার গৌরবের আর সীমা রইলো না। স্বামীর কাছে সে সশরীরে নিজেকে বলি

দিয়েছে মাত্র—এই চেতনাটাকেই সে হঠাৎ আজ রূপান্তরিত করে' নিল: স্বামীর চরিতার্থতার জন্য সে সাধ্বী ও পতিব্রতার মতো নিজেকে স্বেচ্ছায় ও সপ্রেমে উৎসর্গ করেছে। দেহের মতো সব বাঁধা বিধান আছে তার থেকে একচুলও বিচ্যুতি ঘটেনি;—মন একটা বাজে বিলাসিতা, তাকে বেশি দিন পুষিয়ে রাখার খরচ পোষায় না। অতএব—

মৃত রমাপতি, তুমি মৃত। তোমার ছায়া আমরা দেখেছিলাম। ইন্দিরার মন-মুকুরে—সে-আয়না চৌচির হ'ল। তোমার মূর্তিও তাই বিখণ্ডিত—এই অবমাননা তুমি সয়োনা। তোমাকে আমরা সময়ের নদীতে বিসর্জন দিলাম। তুমি এখন কোথায় আছ, সামান্য কোনো ইস্কুল-মাষ্টারি করবার অবকাশে ইন্দিরার মতোই অপ্রয়োজনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে কি না—সেই সব অবান্তর বিষয়ের খোঁজ করে' তোমার লৌকিক অস্তিত্ব প্রমাণ করা একেবারেই বৃথা, রমাপতি। আমাদের রমাপতি আজ মরলো—সেই রমাপতি সূর্যের আলোতে বেশিকাল স্বপ্রকাশ থাকে না, সেই রমাপতি অসাবধানে নারীর জীবনে একবার মাত্র পদার্পণ করে।

ইন্দিরার আজ বিধবা-বেশ। দেখবে এস। সীমন্তে সিন্দুর—শৃঙ্গারভূষণ; পায়ে আল্‌তা, দু'হাত-ভরে' তার আভরণ। পরনে মারহাটি গরদের শাড়ি, ব্লাউজ-পিস্‌টা দিব্যি খাপ খেয়েছে—বাহু দু'টি লীলা-বল্লয়িত; দুই চোখে ভাবী মাতৃত্বের মধুরতা! তুমি তার এ বিধবা-বেশ দেখো না। তোমার কাছে সে গণতোষিণী।

ইন্দিরার এতক্ষণে ঠাহর হ'ল অশ্রুর এই আকস্মিক আবির্ভাবের পেছনে একটা গূঢ় অর্থ আছে। সহসা কলেজের বন্ধুর প্রতি তার এই অনুরাগের কোনই মানে হয় না, এর সঙ্গে আরেকটি উত্তেজনা ছিল। সেটা যে কার প্রতি, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা একটু কামড়ে ইন্দিরা ঠিক

ধরতে পেরেছে। অবশ্যি অশ্রুও সেটা সোজাসুজি খুলো বলেছিলো—কোথাও তার বাধে নি। সে নাকি দেশভ্রমণে বেরিয়েছে, মাঝ-পথে থেমে সে তার অন্যতম শিকারের জন্য কয়েকদিন ওৎ পেতে থাকবে—তারপর দু'জনে একসঙ্গে লাহোরের দিকে ভেসে পড়বার আগে সে ইতিমধ্যে একা নির্মলের সঙ্গে মরা প্রেমটাকে একটু ঝালিয়ে নেবে মাত্র। দেহসুখ-কাঙাল স্বামীর প্রতি ইন্দিরার স্নেহ জ্যাম্-এর মতন ঘন ছিল না বলে' অশ্রুর এই প্রোগ্রামটা তার কাছে গোড়াতে মনঃপূত হয় নি, এমন বলা যায় না। মেয়ে যেমন বেহায়া—ইন্দিরা এখন রীতিমত বর্বর ভাষায় ভাবতে পারছে—তার পক্ষে এই দুর্নীতিটা অশোভন নয়। কিন্তু সে যখন স্বভাবের ব্যতিক্রমে একেবারে তপস্বিনীর বেশ পরে' নিঃশব্দে অতিমন্থর পা ফেলে ফেলে স্বামীর ঘরের দরজার পর্দাটা সরালো, তখন নিমেষে ইন্দিরার চোখে সমস্ত ঘর-বাড়ি যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো। এটা কেন যে তার সইলো না বলা কঠিন। শুধু যে সে অশ্রুর আচরণ মার্জনা করলো না তাই নয়, স্বামীর প্রতি তার প্রতিদিন এই অবহেলাকেও সে ক্ষমা করতে পারলো না। সামান্য লুচি ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে হঠাৎ কোথা থেকে তার এক মমতা উথ্‌লে উঠলো যে শুধু স্বামী নয়, অনিচ্ছাধৃত ভাবী সন্তানকে পর্যন্ত তার রমণীয় লাগছে। কি জানি কি ভেবে ইন্দিরা চট্ করে' দাঁড়িয়ে পড়লো, নিজের দিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিলো—সত্যিই সে সুন্দরী, এবং সে-সৌন্দর্য সে মা হবে বলে'।

এটা সত্যিই ভারি আশ্চর্য। কিন্তু মেয়েমানুষের পক্ষে আশ্চর্য আর কী আছে! তারা রঙ-বদ্‌লানো সন্ধ্যারাগ। তাদের মনের ঘড়ির কাঁটা চল্‌তে বন্ধ হ'লে দম দেবার জন্য তাদের আর ব্যস্ততা থাকে না। একটা ধরা-বাঁধা সীমার মধ্যে নিজেকে কোনরকমে খাপ

খাওয়াতে পারলেই তারা বাঁচে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এমনি থাম্‌তে না পারে ততদিন তাদের যত-সব ফ্যাশান: কেউ বলে ভালোবাসি, কেউ বলে বিয়ে না করে' পি-এইচ. ডি. হ'ব। মেয়েরা যাকে বলে ধর্ম, বিজ্ঞান তাকেই বলে ন্যাকামি।

বস্তুত ইন্দিরার এই মনোভাবের ব্যাখ্যাও একটা নিশ্চয় আছে। পুরুষ নারীকে যেমন করে' চায় তাকেও ঠিক তেমনি ভাবেই ধরা দিতে হয়। যেখানে মেয়েরা নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব দেখাতে গিয়েছে সেখানেই তার এমন একটা রোগ হয়েছে যেটাকে শুদ্ধ করে' বল্‌লে বল্‌তে হয় হিষ্টিরিয়া। তাই কোনো কোনো পুরুষের কাছে নারী দেবী—কল্পনা-কায়া; যেমন নারীতৃপ্ত সন্তানপরিবৃত দান্তের কাছে বিয়াত্রিচে ছিল! কারু কাছে সে পিশাচী—নারীর তখন পিশাচী না হ'য়ে উপায় ছিল না, পুরুষ তাকে তেমনি করে' চেয়েছে। কেউ চায় মেয়ের মাঝে একটা হাবা-গোবা ছেলেমানুষি ভাব, মেয়ে তাই অবিকল নকল করে' সংসারের চোখে সাফল্যের সার্টিফিকেট নেয়; কারু কাছে নারী শুধু একজোড়া জঘন, কারু কাছে বা মূর্তিমতী অস্পৃশ্যতা। একটা প্যাটার্ন না পেলে মেয়েদের মুক্তি নেই—যে-রকমেই হোক্ একটা প্যাটার্ন-মাফিক্ জীবন না পেলে ওরা হয় অকারণে পিকেটিং করবে, নয় ধুয়ো ধরবে বিয়ে করবো না। তরল জল রাখবার জন্যে পাত্র চাই। জলের কি রঙ আছে? পাত্রের রঙ তার রঙ।

ইন্দিরা একবার ভাবলো পর্দা সরিয়ে ও-ও ঢুকে পড়বে কি না। স্বামী বাড়ি পৌঁচেছেন প্রায় আধঘণ্টা হ'ল, কিন্তু এরি মধ্যে অভ্র কেমন তৈরি হ'য়ে নিয়েছে। আর ও না গেলো ছুটে কুশল প্রশ্ন করতে, না করলো একটা প্রণাম। নরকেও ওর যায়গা হ'বে না।

অশ্রু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো নির্মল চাকরের হাতের ওপর ডান পা-টা তুলে দিয়ে জুতোর ফিতে খোলাচ্ছে। ঘরে আলো যথেষ্ট ছিল না। এমনি স্তিমিত ফিকে আলোর সঙ্গে একটি ম্লানমুখী মেয়ের বোধ করি একটা নিকট সাদৃশ্য আছে—নির্মল ত' প্রথমটা থমকে গেলো। তবু মুখখানিকে যেন ভারি চেনা-চেনা লাগছে, ভুরুর হাল্‌কা টানটি যেন চক্ষুতে আঁকা, লঘু গতিতে সামান্য দ্রুত চলার অনায়াস ভঙ্গিটি যেন নিজের নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে অনুভব করা যেতো। চাকরের হাত থেকে পা-টা সরিয়ে নিয়ে নির্মল লাফিয়ে উঠলো : তুমি, অশ্রু ? আমি স্বপ্ন দেখছি না ত' ? তুমি এখানে ? এলে কবে ?

অশ্রু ধীরে বল্‌লো—তোমার কাছে আজ এলাম। বোধ হয় স্বপ্ন হ'য়েই।

নির্মলের এখন এ-সব অবাস্তব কথায় কান দেবার সময় নেই। সে চাপা খুশিতে গাল দুটোকে লাল করে' বললে—হঠাৎ তুমি এখানে ? আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

আঁচলের তলা থেকে শুভ্র হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে অশ্রু বললে—আমাকে অনুভব করে' দেখ, আমি শরীরী, বেশ স্থূল, নিরাকারা কল্পনা নই।

নির্মল হেঁচকা-টানে শূ-দুটো টেনে ফেলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লো : এই মাত্র আস্‌ছি, জামা কাপড়গুলো এখনো ছাড়া হয় নি। একটু দাঁড়াও।

—বসি। বলে' অশ্রু একটা চেয়ারে বস্‌লো। বললে—আরো একটু দেরি করে' আস্‌তে পারতাম বটে, কিন্তু দেরি করার মতো ধৈর্য আমার শেখা হ'ল না। তুমি আজ আসবে বলে' বিকেলে স্নান করলাম, চুলগুলি পিঠের ওপর প্রসারিত করে' রাখলাম। বাগান

থেকে এই পরিচ্ছন্ন ফুলটি তুলে এনেছি। অশ্রু চুলগুলির গ্রন্থি থেকে রজনীগন্ধার ছোট্ট কুঁড়িটি আল্‌গা করে' আন্‌লে : যেন বঞ্চিত তাপসী ফুলটি ! নির্বাককুন্ঠিত। আমার মতো প্রগল্‌ভতা ওর স্থলভ নয়। কিন্তু যাই বল, ওরই মতো মনটা এমন লঘু ও পরিষ্কার হ'য়ে গেছে যে কী বল্‌ব ? তুমি কেমন আছ ?

—ভালোই আছি। আমাদের আবার থাকাথাকি ! দাঁড়াও, বাথ-রুম্‌ থেকে চট্‌ করে' মুখ হাত-পা ধুয়ে আসি। তুমি যে এসেছ ইন্দিরা জানে তো ?

—মানে, আমি আজ এসেছি নাকি ? ইন্দিরা জেনে বুড়ো হয়েছে।

—বেশ, ভালো কথা। তুমি এসেছ, আমার কী যে ভালো লাগছে। আমি একটুও আশা করি নি কিন্তু। আচ্ছা। এই বলে' নির্মল পর্দা ঠেলে পাশের স্নানের ঘরে চলে' গেলো।

অশ্রু একা। সমস্ত ঘরে ধূসর সন্ধ্যাছায়া। মিলনশেষের প্রথম ক্লান্তির মতো ঘন। এটি নির্মলের বস্‌বার ঘর। ভারি ফিট্‌ফাট, বাহুল্যবর্জ্জিত। ছত্রিশ ইঞ্চির ছোট একটা সেক্রেটারিয়েট টেব্‌ল, পিঠের আধখানা পর্যন্ত তোলা ছোট একটি ঘোরা-চেয়ার, টেব্‌লের ওপরে দু' তিনখানা মোটা মোটা অঙ্কের বই, অঙ্কের কাগজ-পত্র। দেয়ালের তাকে ব্রঞ্জের একটা বড়ো মূর্তি—মুণ্ডহীন। অন্ধকারে ঝাপ্‌সা। মূর্তিটা প্রশস্ত, দুর্দ্ধর্ষ। আবছায়ায় এইটুকু তার আভাস। এতো বড়ো ঘরে নির্মল নিজের জন্যে এইটুকু স্থান মাত্র অধিকার করে' আছে—চারিপাশের শূন্যতাটা যেন কর্ম দিয়ে ঠাসা ; সেই শূন্যতাটা আলস্যা-বকাশের প্রকাশ নয়। ঘর দেখে অধিবাসী সম্বন্ধে ধারণা হয়, যেমন সংসর্গ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চরিত্র বিচার করে। এ ঘর দেখে কে না বলবে যে নির্মলের মনে ভাবাকুলতার কণামাত্র কুয়াসা নেই,

তার মন ফাল্গুনের রৌদ্রের মতো খট্‌খটে, ছুরির ফলার মতো প্রখর। তেজস্বী ঋজু উজ্জ্বল! সারা ঘরের আবহাওয়ায় একটা নিবিড় তেজোময়তা আছে। সেটি অশ্রু যেন স্পর্শ করতে পারে। একটা দুর্নমনীয় কাঠিন্যের তেজ, কিন্তু সে-নিষ্ঠুরতার মাঝে কোথায় যেন একটি অন্তর্লীন মাধুর্য!

বড়ো একটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে মাথার চুলগুলি মুছতে মুছতে নির্মল ঘরে ফিরে এলো। আঁচলের খুঁটে সমস্ত বুক ঢাকা পড়ে নি, স্ফীত স্ফার বক্ষ—প্রেয়সীর যোগ্য উপাধান। পা দুটি নগ্ন, সিক্ত অঙ্গ থেকে সদ্যস্নানের একটা শান্ত গন্ধ আস্‌ছে। স্নান করবার পর পুরুষকে যে এমন জ্যোতিঃস্নিগ্ধ ও সুন্দর লাগে এটা অশ্রুর জানা ছিল না। সে চেয়ারটাতে স্থির হ'য়ে বসে' রইলো।

খানিকটা লাইম্-জুস্ চুলের মধ্যে রগ্‌ড়ে নিয়ে নির্মল হেসে বল্‌লো —প্রসাধনটা তোমার সামনেই সেরে ফেলি। কি বল? আমার এই বর্বর বেশ দেখে তুমি আহত হ'য়ো না। বলে' লুঙ্গির মতো খাটো করে' পরা কাপড়টার প্রতি সে ইঙ্গিত কর্‌লো।

অশ্রু একেবারে প্রশ্ন করে' বস্‌লো: আমি আস্‌বো এমন আশা তুমি একটুও করনি কেন?

প্রশ্নটা শুনে নির্মল থাম্‌লো; জিজ্ঞাসায় একটু যেন অনুযোগের অনুনয় আছে। হেসে বললে—আমি পৃথিবীতে আশাই কিছু কম করি, অশ্রু। তা' পূর্ণ হবে না বলে' নয়, আশা কর্‌বার মধ্যে চিত্তের ক্ষণিক অব্যবস্থা ঘটে। অযথা অতখানি শক্তি ব্যয় করতে ইচ্ছে হয় না।

অশ্রু চোখ নামিয়ে বললে—কিন্তু চোখের জানলা দিয়ে মন যদি বারে-বারে উঁকি মার্‌তে থাকে তখন চোখ বুজ্‌লেই অবাধ্য মনকে শাসন করা হয় না। তোমার মনে আমার আসন নেই ব'লেই তোমার আশা নেই।

ততক্ষণে নির্মল জামাটা গায়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত চেয়ারটিতে বসে' সে স্বচ্ছ হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে' তুল্‌লো: যাকে বর্জন করেছি তাকে আহ্বান করবার ভাষা থাকে না। যদি বলো, আশাও ছিল না। কিন্তু আমার কাছে ফের ফিরে আস্‌বার তোমার কি কোনো প্রয়োজন ঘটেছে?

সন্ধ্যায় স্নায়ুগুলো অত্যন্ত স্নিগ্ধ হয়েছে ব'লেই অশ্রুর কথায় তীক্ষ্ণতা নেই। সে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর পা দুটো একটু ঘষে' বললে—তোমার যেমন আকাঙ্ক্ষা নেই আমারো তেমনি প্রয়োজন ঘটে না। ইচ্ছাই আমার বাহন—সরস্বতীর যেমন হংস।

—লক্ষ্মীর যেমন প্যাঁচা। নির্মল এমন একটা সহজ রসিকতা সংবরণ কর্‌তে পার্‌লে না: তোমার ইচ্ছাটা পেচক জাতীয়-ই।

অশ্রু চোখ তুলে বললে—তুমি আমাকে আজো অপমান কর্‌বে নাকি?

নির্মল অস্থির হ'যে উঠ্‌লো: ছি ছি, না, না, সে-কথা নয়। আমার কথাগুলোই অমনি মেড়ো, বুনো। তুমি আজ আমার অতিথি—তোমাকে অপমান করব কী? ছি! ওটা একটা ছেলেমানুষি কর্‌লাম মাত্র। এত বুদ্ধি রেখে এ-কথাটি বোঝ না?

বোঝো, কিন্তু তবু কথার সুরে কোথায় যেন বিদ্রূপের খোঁচা আছে। অশ্রু বললে—বর্জন আমিও তোমাকে করেছি, সে-গৌরবের ভার তুমি একা নিলে চল্‌বে কেন? কিন্তু বর্জন করেছি বলে'ই তোমাকে বিস্মৃতিতে বিসর্জন দিতে হ'বে আমার বন্ধুতা এতটা অনুদার নয়। বুঝ্‌লে?

নির্মল নড়ে' বস্‌লো; টিনের ছোট বাক্স খুলে একটা ইজিপ্‌শিয়ান্ সিগারেট ধরালো। বল্‌লো তাহ'লে আশ্বস্ত হ'লাম। কিন্তু আজো যদি জমাট নিরেট অশ্রু নির্ঝরবন্যার মত উদ্বেল হ'য়ে উঠতো, তা, হ'লে আমার আর পার ছিল না; আশার চেয়ে সে-ভয়ই আমার বেশি ছিল।

যাক্, আমিও এখন মুক্তকণ্ঠে একটু কবিত্ব করি। জানো, অশ্রু, জীবনে দু'টি জিনিস কখনো ফিরে আসে না: এক, মৃত শৈশব, আর প্রথমা প্রিয়া।

কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে' অশ্রু শুধোল: আমি কি তোমার প্রথমা প্রিয়া?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে নির্মল বললে—তুমি অমন সোজা করে' প্রশ্ন কর কেন? এ তোমার মারাত্মক দোষ। আমি এখন এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেব? একটা সিগারেট খাবে ত' খাও।

—না, এখন খাবো না। অশ্রুর স্বর ভারি ঘোলাটে!

নির্মল বললে—চুল শিঙ্‌ল্‌ড্‌ করনি? বড়ো চুল রাখাটা ত' সেকেলে, কালিদাসি আমলের।

অশ্রুর উত্তরো নির্মম: পুরুষের মনোহরণ করতে দীর্ঘ চুল আমাদের দেশে এখনো প্রশস্ত। ইউরোপে যদি কোনো দিন যাই এবং কোনো প্যারিসিয়ান্ যদি আমার গায়ের এই শ্যামল রঙ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে প্রার্থনা করে, আমি তাকে খুশি করতে তখন না-হয় চুল ও পোশাক খর্ব করে' ফেল্‌বো। আমার সময় আছে।

—হ্যাঁ, আছে। কিন্তু একবার চুল ঘাড়ের তলায় এনে ছেঁটে ফেললে দেশে ফিরে তাকে ফের গজিয়ে আবার কোনো বেচারা বাঙালি যুবককে মুগ্ধ করতেই যা সময় লাগবে। তা, বেশ! প্রভাতকে ছেড়ে প্যারিসে যাবার মতলব আছে নাকি?

—আছে বৈ কি। প্রভাতো সঙ্গে যেতে পারে।

—প্রভাত যাবে? প্যাসেজ জোটাবে কোত্থেকে? ষাট-টাকার কেরানির এত মুরোদ! অবশ্যি, প্রভাত যদি যথেষ্ট পণ নিয়ে কোনো বাঙালি মেয়ের কুলরক্ষা করে! তখন তার বউ তাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবে কেন?

অশ্রু খিট্‌খিট্‌ করে' উঠলো: সে-ভাবনা তোমার না করলেও চল্‌বে। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও। তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবেসেছিলে ?

নির্মলের মুখে সেই ক্ষণস্থায়ী হাসি—যে-হাসি মুখকে প্রসন্ন করে না, অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে একটা কঠিন দৃঢ়তা রেখে যায়: এ-প্রশ্নের একটা উচ্চারিত উত্তর আছে নাকি? তুমি কিছুই অনুভব করতে পারো নি ?

অশ্রু স্পষ্ট করে' বল্‌লো—আমি অনুভবে বিশ্বাস করি না, আমি উচ্চারণ চাই।

—এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার মিললো না। তুমি কর্মে প্রবল, প্রতিজ্ঞায় প্রখর হ'তে পার, প্রকাশে তোমার একটা অপরিমিত উদ্বেগ থাক্‌তে পারে, কিন্তু যখন ভাবি অনুভব তোমার ফিকে, তরল—তখন তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি না, অশ্রু। এই আমার স্পষ্ট উত্তর।

অশ্রু একটুখানির জন্য কোনো কথা কইলো না। নির্মল ফের বললে—আচ্ছা, সত্যি করে' তুমি কাউকে ভালোবেসেছ? তুমি প্রভাতকে কি এত ভালোবাস যে তার প্রেম না পেলে তুমি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে একেবারে একাকিনী হ'য়ে যাবে? তোমার অন্তরে বৈধব্যের সেই বৈরাগ্যবোধ আছে? তোমার হ'য়ে আমিই-উত্তর দিচ্ছি: নেই। যে-প্রেমে একপ্রাণতা আছে, যার অনুভবে মানুষ বিরহের অন্ধকার থেকে বিশাল আকাশের সৃষ্টি করে—সেই প্রেম তোমার আছে? কতগুলি ফাঁকা কথার মূলধনে এ জীবন নিয়ে জুয়ো খেল্‌তে বসো না।

অশ্রু হেসে বললে—বেশ কবিতা করছিলে, কিন্তু শেষ দিকে ওয়ার্ডসোয়ার্থের মত ঐ নীতিবচনটুকু না আওড়ালেই আমি হাততালি

দিয়ে উঠ্‌তাম। কিন্তু আমার কথা আমিই বল্‌বো। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি আমাকে তোমার জীবনের অসতর্ক কোনো মুহূর্তে একটুও ভালোবাসনি ?

নির্মল বললে—ঐ চার অক্ষরের শব্দটা আমার কাছে আগাগোড়া গ্রীক্। ওটার সংজ্ঞা নেই।

—কেন, উচ্চারিত উত্তর নাই বা দিলে, গাঢ় করে' অনুভবও করোনি কোনোদিন ?

—বোধ হয়, না। আমি ভালোবাসা বুঝি না, ওটা যৌবনের একটা রঙিন বিকার মাত্র। তাই সে-বিকারকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করবার জন্যেই আমি বিবাহের পক্ষপাতী। দৈহিক কামনাকে সুন্দর ও সংযত করতে পারলেই তা প্রেম এবং সে প্রেমে সংসার ব্যবস্থিত হয় বলে'ই তা সমাজের নামান্তর। সমাজকে আঘাত করতে গেলেই যে-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, নেহাৎ সহজ অঙ্কের নিয়মানুসারে সেই আঘাত নিজের ওপর ফিরে আসে—প্রেমের শান্তি তাতে ব্যাহত হয়। তাই সমাজকে লঙ্ঘন করতে গেলে প্রেমেরো স্খলন ঘটে, তখন সেটা মনে হয় উৎপাত—প্রণিপাত নয়। তখন তার নিপাত হ'লেই বাঁচা যায়। নিউটন গতি সম্বন্ধে যে-থিওরি করেছিলেন, গোড়ায় তাঁর hypothesis ছিল হয় ত' নরনারীর অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতির দৃষ্টান্তটা। কিন্তু বড়ো বড়ো জিনিস নিয়ে তর্ক করতে গেলে খিদে আমার আরো বেড়ে যাবে। ইন্দিরাকে ডাকি।

অশ্রু বাধা দিলো: ডাকবে'খন। কিন্তু অসামাজিক প্রেমে যে প্রেমের আয়ুক্ষয় হয় এমন একটা মত স্থির করলে ত' আমাকে দেখে, আমার সংস্পর্শে এসে, না ?

—হয় ত' হ'বে। বিবাহেব অতিরিক্ত কোনো প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। প্রেমকে বিবাহের সীমার মধ্যে বিস্তারিত না করলে সেটাকে আমার কাছে ব্যভিচাবের মতোই দৃষ্টিকটু লাগে।

অশ্রু ডান হাতটা তুলে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আমার প্রেমটা ত' তোমাব এই সিদ্ধান্তের পক্ষে একটা পরীক্ষা ছিল? আমাব সঙ্গে দু'দিন না মিশ্‌লে ত' আর তুমি এমন ভুঁই-ফোঁড় পাদ্রি হ'তে পার্‌তে না?

—না।

অশ্রু এতক্ষণে একটা কথা পেলো: আমারো তাই সে-পরীক্ষা; আমিও তাই জীবনে লাখো লাখো বার পরীক্ষা করছি, হয় ত' প্রত্যেক-বারই হার্‌বো, কিন্তু তাতে আমার শক্তিক্ষয় হ'বে না, বরং সংকল্পের সঙ্গে সকল শংকা দূর হ'য়ে যাবে। আমি কাকে প্রেম দিয়ে কৃতার্থ হ'ব সে-বিচার পাড়াব পাঁচ জনকে কবতে দিলে আমাব অস্তিত্বের মর্যাদা থাকে কোথায়? সে-বিচাব আমিই কর্‌বো—বহুতর পরীক্ষার মধ্যে, বহুতর অকৃতকার্যতার মধ্যে। বুঝেছ?

—বুঝলুম। কিন্তু তোমার অন্ধ বিচারেই যে পরিপূর্ণতম সুফল হ'বে তার কোনো গ্যারান্টি আছে?

অশ্রু বললে—তবু সে বিচার আমার বিচার। মিল্‌টন্‌কে তুমি অন্ধ বল্‌বে কিন্তু অন্ধ চোখেই তিনি হারানো প্যারাডাইজ খুঁজে পেয়েছিলেন।

—তোমার উৎপ্রেক্ষাকে আমি উপেক্ষা করি। প্রেম একটা কায়াহীন মাদকতা মাত্র—

কথা কেড়ে নিয়ে অশ্রু বললে—তাই প্রেমকে লোকে বলে ভগবান। আমি অবিশ্যি বলি শরীরী স্মর।

—কিন্তু প্রেম যেখানে পরীক্ষা-সাপেক্ষ সেখানেই সে লোভী, সেখানেই তার অন্তহীন কদর্যতা। আমি অত কথা বুঝি না অশ্রু, একটা উল্কার জীবন কামনীয় নয়।

— কিন্তু উল্লাসের। তার সর্বনাশটা দেখবার মতো।

—কিন্তু সেই সর্বনাশ জীবনে স্বীকার করে' নেবার মতো তোমার ধৈর্যশীল বৈরাগ্য আছে?

—সেটা আর বৈরাগ্য নয় বন্ধু, অবসান।

এমনি সময় ইন্দিরা প্রবেশ করলো খাবার নিয়ে। ডিস্‌টা টেব্‌লের ওপর রেখে সে নির্মলের পা ঘেঁষে মেঝের ওপর বসে' পড়লো। এই যাচিত সান্নিধ্যের নতুন একটা অর্থ নির্মলের কাছে হঠাৎ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। অশ্রুর একবার বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো: আচ্ছা তুমিই তোমার স্ত্রী-র পূর্ব ইতিহাস সব জানো? কিন্তু মনের চিন্তাটা জিভের ডগায় এসে মুখর হ'বার আগেই নির্মল বল্‌লে—এই দেখ ইন্দুকে। বিয়ের আগে এক অসামাজিক প্রেমের নেশায় মাতোয়ারা হয়েছিলো। সেটা নেহাৎই মিথ্যা, অবাস্তব। এমন অবাস্তব রঙিন স্বপ্ন হয়ত' প্রত্যেক যুবক-যুবতীরই দেখ্‌তে হয়। না ইন্দু? বলে' নির্মল হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লো।

অশ্রুর দু'কান রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে—শিগ্‌গির এর প্রতিবাদ কর, ইন্দিরা। রমাপতির প্রতি তোমার প্রেম মিথ্যা, অবাস্তব? এ অবমাননা তুমি সইবে?

উঠে সুইচ্‌টা টেনে আলো জেলে নির্মল বল্‌লে—এ-ঘরে ইন্দিরার স্বামী উপস্থিত আছেন এ-কথা তুমি ভুলে যেয়ো না, অশ্রু। ইন্দিরা তাঁর পাতিব্রত্যের অবমাননা করবেন না।

ইন্দিরাকে চুপ করে' থাকতে দেখে অশ্রু মুহূর্তে ঘেমে উঠ্‌লো। বল্‌লে—তুমি ইন্দিরাকে তার অটল প্রেমের সিংহাসন থেকে ভ্রষ্ট ক'রে

তাকে একটা মহান্ রাজ্য থেকে বিচ্যুত করেছ। তুমি তার কী ক্ষতি করেছ তার পরিমাণ স্বার্থান্ধ পুরুষ হ'য়ে তুমি বুঝ্‌বে না।

নির্মল ফের চেয়ারে বসে' স্নিগ্ধস্বরে বললে—তুমি যদি ইন্দিরার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু না হ'তে, আর আমার সঙ্গেও যদি তোমার কোনো ব্যাপার না ঘট্‌তো, তা হ'লে আমি সোজা বলে' বস্‌তাম: তোমার সঙ্গে আমি আমার স্ত্রীর ক্ষতি বিচার করতে চাইনে, অশ্রু। কিন্তু এর উত্তর ইন্দিরাই দেবেন। তোমার আমি কী ক্ষতি করেছি, ইন্দু?

ইন্দিরা স্বামীর পায়ের আরো কাছে ঘেঁষে এসে বল্‌লে—আমার আবার কী ক্ষতি কর্‌বে?

—কী ক্ষতি কর্‌বে! অশ্রু দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো: ইন্দিরা নেহাৎই ভীরু ও দুর্বল বলে' বাক্যে বা ব্যবহারে অস্ফুটতম প্রতিবাদও কর্‌তে পার্‌লো না। স্বচ্ছন্দে সমাজের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিলো। তুমি তার যে-অপমৃত্যু ঘটিয়েছ, তার যে-মহান ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট করেছ—সমাজ যদি তার বিচারের ভার নিত—

—তা হ'লে আমার ফাঁসি হ'ত। এই বল্‌তে চাও, অশ্রু? কিন্তু আমার তিরোধানে তুমি সত্যিই কি সুখী হ'তে, ইন্দু?

ইন্দু নিরীহ ইঁদুরের মতো চোখ লুকোল।

অশ্রু বল্‌লে—এর তুলনায় ঢের বেশি সুখী হ'ত। তার সৌন্দর্য তার শিল্পানুরাগ তার কবিস্বপ্ন তোমার বিবাহের কয়েদখানায় দীর্ঘদিনের উপবাসে শুকিয়ে গেছে। তোমার এই তুচ্ছ প্রেম থেকে বঞ্চিত হ'য়ে সে স্বর্গ খোয়াতো না, বরং অমরত্ব লাভ করতো। পড়নি তার ডায়েরি?

নির্মল আশ্চর্য হ'ল: ডায়েরি? আমি মানুষের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় চাইনে। নেপথ্যের ইন্দিরার প্রতি আমার চোরাদৃষ্টি নেই, অশ্রু। কিন্তু (ইন্দিরার প্রতি) এ-সব কী বল্‌ছে?

ইন্দিরা হেসে বললে—ও একটা পাগ্‌লি। যা মুখে আসে তাই বলে।

অশ্রু থাম্‌বে না: ও এই নিরানন্দ বিবাহজীবন চায় নি, সন্তান চায় নি, তোমাকে চায় নি।

—পাগ্‌লি! নির্মল আবার হো হো করে' হেসে উঠ্‌লো: চায় নি? ইন্দিরার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা চায়। নারীর প্রেমে যদি কোনদিন কোনো মাহাত্ম্য থাকে তবে সে মা হবে বলে', পুরুষের মনোহারিণী হবে বলে' নয়।

ইন্দিরা সোজা হ'যে দাঁড়ালো। তার সর্বাঙ্গে কোথা থেকে সৌন্দর্যের ঢল্ নেমেছে। সে তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে—তোমার এই সব কী হচ্ছে, অশ্রু? ভদ্র সমাজে সৌজন্যের সীমা মেনে চল্‌বে না, নাকি?

অশ্রু পরিষ্কার গলায় বললে—আর বেশি ভদ্র হ'য়ে কাজ নেই, ইন্দিরা। ঢের হয়েছে। অন্তরে যাকে সত্য ও সর্বস্ব বলে' স্বীকার করেছ সামান্য শরীরের ভয়ে তাকে অমর্যাদা করো না। শরীর ত' তোমার কাছে দু' মুঠো ছাই—এইবার জীবনে পরম সুযোগ এসেছে—যা তুমি চাও না, তা তুমি নেবে না, না, কক্‌খনো নয়।

নির্মল হঠাৎ ইন্দিরাকে নিজের কাছে ধীরে টেনে আন্‌লো, তার ঈষন্নমিত পিঠটি নির্মলের কাঁধের কাছে এসে নির্ভর পেলো। ইন্দিরার আলুলিত চুলের ওপর ধীরে একখানি হাত রেখে নির্মল বললে—কী, তুমি চাও না, ইন্দু? আমাকে?—তারপর ম্লান একটু হেসে অশ্রুর দিকে সঘৃণ দৃষ্টি ফেলে বললে—কী যে কে চায় না, বুঝে ওঠা বড় মুশকিল। চাই না বলে' হাত সরিয়ে নিতে নিতে যে-টুকু পেয়ে বসি সেও আমাদের সকল চাওয়ার অতীত হ'য়ে দেখা দেয়। হয় ত' ইন্দু আমাকে কোনোদিন চায় নি, কিন্তু আজ? ও-কথা মুখেও এনো না, অশ্রু।

স্বামীর এ-উত্তরটা বড্ড মোলায়েম হ'ল, ইন্দিবার তা মনঃপূত হ'ল না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল লৌকিক বিনয়ের সীমা লঙ্ঘন ক'রেই তিনি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অশ্রুকে ক্ষতবিক্ষত করে' দেন। তাই সে ক্ষতিপূরণ করলে: তোমার মতো সবাইর আর মৃগী-রোগ হয় নি, অশ্রু। উচ্ছৃঙ্খলতাই জীবন নয়, সে একটা নিদারুণ কুশ্রিতা। এক কথায় সেই অসতীত্ব।

অশ্রু বললে—প্রেমহীন দেহদানের চেয়ে সে মহৎ। আমাদের এমনি অন্ধ দৃষ্টি যে চাঞ্চল্যকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে'ই আমরা তৃপ্তি পাই। প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারবো, কিন্তু পরীক্ষা করতে গেলেই যত গোল বাধে। ভুল করলে ইন্দিরা, আজকের এই ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যাকালটাই তোমার জীবনের শেষ সত্য নয়। এই অলস কর্মবিমুখ স্বামীসম্ভোগকাতর জীবনই তোমার স্বর্গ ছিল না, এর চেয়েও বিস্তৃত স্বর্গের তপস্যা করবে বলে' বিধাতা তোমাকে দেহ ভরে' রূপ দিয়েছিলেন, বুক ভরে' অতৃপ্তি।

—আর পেট ভরে' ক্ষুধা। নির্মল হেসে উঠ্‌লো: এ অবান্তর বিষয় নিয়ে তর্ক আর আমাকে পোষাবে না, অশ্রু। আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। তুমিও একটু সাহায্য কর না? আশা করি এখনো এত প্রাচীন হওনি যে পুরুষের সাম্‌নে খাবার জন্যে দাঁত বের করতে কুণ্ঠিত হবে।

—প্রাচীন?

—নিশ্চয়। নইলে বিয়ে করে' সুস্থ সংযত পরিমিত জীবন-যাপনের আদর্শটাই ত' অতি আধুনিক। তোমার ও-মতটা ত' এ-শতাব্দীর প্রথম দশকের। কুড়ি বছর আগেকার।

—আমি ঐ পেঁপেটা খাবো বটে, কিন্তু সেটা তোমার মতে সায় দিচ্ছি বলে' নয় কিন্তু। তুমিও একটু নাও, ইন্দিরা।

খাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঘরের আবহাওয়াটা তরল হ'য়ে উঠ্‌লো।

বলা নেই কওয়া নেই নির্মল হঠাৎ এক টুক্‌রো নাস্‌পাতি ইন্দিরার মুখের কাছে তুলে ধরলো। জিনিসটা ইন্দিরার কাছে নতুন, একেবারে অপ্রত্যাশিত! এতগুলি দিন-রাত্রির স্মৃতিপটে স্বামীর এমন একটি ভঙ্গির রেখাপাত হয় নি। আরেকটু হ'লে ঐ আঙুল দু'টি অধর দিয়ে ছুঁয়ে ইন্দিরা প্রথমস্পর্শিতা কুমারীর মতো রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌তো হয় ত'। স্বামী যেন তাঁর ঐ দু'টি আঙুলে করে' স্বর্গের সমস্ত সুধা তুলে ধরেছেন।

নাস্‌পাতির টুক্‌রোটি ইন্দিরা শব্দ করে' চিবোতে লাগ্‌লো। নির্মল বললে—তোমার পরীক্ষার জটিলতা প্রণিধান কর্‌তে পারি তেমন অণু-বীক্ষণ আমার নেই। সে আমার ত্রুটি হয় ত', মানলুম। কিন্তু কোনো পরীক্ষারই পরিণাম নেই, কোনো প্রেমই সংসারে প্রামাণ্য নয়। মাঝের থেকে কপালে ঘটে অশেষ দুর্গতি, নিত্য পদস্খলনের দুঃসহ কলঙ্ক।

অশ্রু মুখ গোমরা করে' বললে, মানুষের অভিধানে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটে' থাকে, নির্মলবাবু। পরিণামের চেয়ে পরীক্ষা বড়ো, যেমন প্রাপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি, সন্ধানের চেয়ে অনুধাবন।

ইন্দিরাকে নির্মল আরো কাছে টেনে আন্‌লো। তার স্বর গদ্‌গদ হ'য়ে উঠেছে: সন্ধান বুঝি না, অশ্রু, বুঝি সন্ধি; শ্রান্ত পরীক্ষার চেয়ে প্রতীক্ষাহীন শান্তিই আমাদের বেশি কামনীয়। এই পরিপূর্ণ প্রগাঢ় বিশ্রামের মধ্যে কী যে প্রয়াসহীন বিরতির মাদকতা রয়েছে তা তুমি বুঝ্‌বে না। আমি বুঝেছি ব'লেই কথাটা খুলে বলতে গিয়ে আরো ঘোরালো ক'রে' তুল্‌লুম। নিয়ত সন্ধানের নিষ্ফল অধৈর্যে স্নায়ুমণ্ডলীকে অকারণে উত্তেজিত কর্‌তে হয় না, অতৃপ্তির বিষবাষ্পে চিত্ত কলুষিত হয় না, নির্জল মেঘের মতো মন লঘু হ'য়ে উড়্‌তে থাকে। দম্পতীর সংকীর্ণ শয্যার দু' প্রান্ত থেকে দু'টি বিপুল জগতের জন্ম হ'তে থাকে—এক ধরিত্রী, অন্য স্বর্গ। মধ্যে মাত্র আকাশের ব্যবধান। ধরিত্রী

হচ্ছে পুরুষ—স্বর্গ নারী ; আর আকাশ হচ্ছে দু'য়ের মধ্যেকার বিস্তীর্ণ প্রেম !

ঠোঁট দু'টো কুঁচকে অশ্রু বল্‌লো—হাতি !

ব'লেই আচম্বিতে ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলো।

ঘরের সমস্ত শূন্যতা নিমিষের মধ্যে ইন্দিরাকে গ্রাস করলে। সে-নিস্তব্ধতা যেন কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি। এর পর স্বামীর সঙ্গে যে সে কী ব্যবহার করবে, কী করলে যে এমন চমৎকার সন্ধ্যাটার সঙ্গে একটা সুরসঙ্গতি থাকে সে প্রথমে বুঝে উঠ্‌তে পারলো না। এতো খানি অবকাশ পেয়ে সে যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। স্বামীর মুখের দিকে সে অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে একবার তাকালো—কিন্তু সে-মুখ নিরেট স্থূল উদাসীন। খানিক আগে যে-মুখে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ছিল, সহসা তা যেন দুপুরের রোদের মতো রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ তিনি যে কেন ইন্দিরার সান্নিধ্য বিস্মৃত হ'য়ে টেবলের উপরকার একটা মোটা বই নিয়ে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বোঝা কঠিন। পেটের মধ্যে নাস্‌পাতির টুকরোটা এখনো হজম হয় নি।

মাথা তুলে নির্মল বল্‌লো—পেছনের জান্‌লাটা বন্ধ করে' দাও দিকিন্‌, ঠাণ্ডা আস্‌ছে।

ভয়ে ভয়ে ইন্দিরা বললে—হাস্‌নুহানার ঝাড় থেকে কেমন গন্ধ আস্‌ছিলো।

একটু বিরক্ত হ'য়ে নির্মল বললে—গন্ধ শুকতে হ'লে বন্ধুকে বাইরে নিয়ে বেড়াও গে।

এর পর হয় ত' ইন্দিরা আর দাঁড়াতো না ; কিন্তু নির্মল আবার ডাকলে : দেখছ না ব্র্যাকেট্‌ থেকে আমার টাই-শুদ্ধ কলারটা পড়ে' গিয়েছে ; চোখে দেখতে পাও না ? তুলে রাখ।

ইন্দিরা তুলে রাখলো।

নির্মল ফের বল্‌লে—রাত্রে আমার স্যুপটা তৈরি করে' রেখো। আর শোন, রামসেবককে বলে' কিছু চুরুট আনিয়ে দাও ত'। সিগারেট আর খাবো না। দোকানটা যেন চিনে যায়। আর—হ্যাঁ, তোমার এই বন্ধুটি কবে এসেছে, কেন এসেছে, কবে যাবে?

ইন্দিরা তিক্তস্বরে বললে—বন্ধু ত' সে তোমারো। জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।

—পারতুম হয় ত'। কিন্তু তোমাকে কিছু বলে নি? একটা সাধারণ ব্যাখ্যাও তার নেই?

—না।

ইন্দিরা চলে' যাচ্ছিলো।

—আচ্ছা, তুমি ত' ডায়েরি লেখ। আমাকে কিছু বল নি কেন?

ইন্দিরা বললে—সাহিত্যে সব জিনিস যেমন লিখতে হয় না, তেমনি স্বামীকেও সব বলতে নেই!

—কিন্তু ইঙ্গিতেই হচ্ছে আর্টের নিশানা। আমি সে ইঙ্গিত আজ পেলুম, ইন্দু।

আবার ইন্দু! ইন্দিরা কুণ্ঠিত হ'য়ে শুধোল: কিসের?

—তুমি আমাকে চাওনা, ভালোবাস না।

চোখ, মুখভাব, দেহের সমস্ত অটল ভঙ্গি দিয়ে ইন্দিরা বললে—মিথ্যা কথা।

অভিমানের সুরে নির্মল বললে—আর এখন ডায়েরি লেখার প্রয়োজন নেই কি না, তাই ঠিক আজকের দিনটিতেই যে আমাদের বিবাহিত জীবনের ছ'টি বৎসর পূর্ণ হ'ল তা তুমি স্বচ্ছন্দে ভুলে আছ। অথচ,

আজকের দিনটি যাতে না হারাই তারি জন্যে আমি লাক্ষ্মৌ থেকে সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।

তাই নাকি? ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে দেখলো—সত্যিই ত'। আজকের তারিখ। ইন্দিরা এতোক্ষণ এই কথাটিই ভুলে ছিল কি করে'? সে হয় ত' তক্ষুনি স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে চুম্বনভিক্ষা করতো, কিন্তু নির্ম্মলের মুখে আবার নিরেট স্থূল হ'য়ে উঠেছে। ইন্দিরা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ইন্দিরা তবু আশা হারায় নি। আজ যে তাদের বিবাহের বার্ষিকী, এ-সংবাদটি স্বামী মনে রেখে ইন্দিরাকে আকাশে তুলে দিয়েছেন। অথচ এই স্বামীর প্রতিই বিমুখ ও বিদ্রোহী হ'বার জন্যে অশ্রুর দিক থেকে তার ওপর এমন জোর তাগিদ্ এসেছিলো। ইন্দিরা যে তার তর্জনীটা উদ্যত করে নি সে তার স্ত্রী-জীবনের পরম সৌভাগ্য। সে এতোদিনে বাঁচলো বোধ হয়।

ইন্দু! নামকে সংক্ষিপ্ত ও হ্রস্ব-উকারান্ত করার মধুর আর্টটা বাঙালি রচনা করেছে ভালোবাসতে গিয়ে। যেন ঐ হ্রস্বতাব আড়ালটুকুতে একটা অসীম ইশারা—যেন সবটুকু বলা হ'ল না বলে'ই যা বল্‌বার তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝিয়ে দিলে; ঠিক কবিতার অর্থের মত। শব্দে নেই, ছন্দে নেই, ভাববিন্যাসে নেই, ভাষা-প্রসাধনে নেই—কোথায় যে আছে ধরা কঠিন, কিন্তু আছে যে, সেটা জলের মত সোজা। যাব নাম সত্যি-সত্যিই ইন্দিরা—কাকারা যাকে ইন্‌দ্রি বলতেন—তাকে ইন্দু বলে' ডাকার মাধুর্য যে অক্ষরসন্নিবেশে নয়, উচ্চাবণভঙ্গিতে নয়, তা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু ঐ ছোট ডাকটিতে ভীরু বুক যে রসবোমাঞ্চে শীতল হ'য়ে আসে তাবো মতো সত্য আব নেই কিছু।

বিয়ের পর এক বছর পূর্ণ হ'ল বটে—কিন্তু স্বামী তাকে সম্বোধনে কৃপণতা করতে গিয়ে কোনাদিন এমন অজস্র হ'য়ে ওঠেন নি। এ যদি জনসাধারণের নেপথ্যে কামকেলিব নিভৃত রঙ্গমঞ্চে উচ্চাবিত হ'ত তা হ'লে ইন্দিরা তাকে আমোল দিতো না, কিন্তু এ আর উচ্চারণ নয়, ঘোষণা। নির্জন নিরালায় নয়—তৃতীয় ব্যক্তিব সমুখে—এই তৃতীয় ব্যক্তিটিই প্রেমিক-প্রেমিকার নিকষ-পাথর। এ তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায়ই এর বিচার, এর মূল্যধারণ—এ তৃতীয় ব্যক্তিই সমাজ, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব। এ আর কেউ নয়—স্বয়ং অশ্রু, যার কাছে বিবাহ অর্থ শুধু

বি-পূর্বক বহ্-ধাতু ঘঞ্; সমাজ অর্থ জীবনীশক্তির শশ্মান-ভস্ম। ভালোই হ'ল—অশ্রুরই মুখের উপর সে বলে' আস্তে পেরেছে—স্বামীই তার জীবন-সঞ্জীবনী; সে যে আজো বিধবা নয় এই তার ত্রিলোক-পতিত্বের চেয়ে বড় সৌভাগ্য। আজ ঐ সামান্য একটি সম্বোধনের বাতায়ন দিয়ে বহুবিস্তৃত আকাশের মুক্তি তাকে ঘিরেছে। সে স্বামীর জন্যেই দেহধারণ করেছিলো, এ জ্ঞান তার নশ্বর দেহটাকে উষার হাতের স্বর্ণ-বীণা করে' তুললো। স্বামীর পূজায় এ-দেহকে সে ধূপের মতো দগ্ধ করবে—এর চেয়ে সার্থকতাময় আত্মসমর্পণের গরিমা মেয়ে হ'য়ে সে ভাবতে পারে না। স্বামীই তার দেহ, তার দেশ, তার দেবতা।

তুমি বিদ্রূপ করছ, রমাপতি। কিন্তু যে-প্রেমে বন্ধন নেই, সন্তান-জননের প্রয়োজন নেই, নব জীবনের মাঝে নিজেকে সম্প্রসারণ নেই, সে-প্রেম মদ খাবার কাচের বাসন মাত্র। মদ ফুরোলে বাসন যায় ভেঙে। ক্ষুধার্ত সময়ের একটি মাত্র সুদীর্ঘ চুমুকে তোমার সে-মদ ফুরিয়ে গেছে। মদে আছে মত্ততা, সুধায় আছে স্বাদ। মদে আছে রোগ, সুধায় আছে রুচি। তোমার সে-আদর্শ হাটে বিকোত না বলে'ই মরে পড়ে' অব্যবহৃত অবস্থায় ক্ষয় হ'য়ে যেত রমাপতি, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে তুমি হ'তে কুৎসিত আমি হ'তুম সুদুর্লভ। সে আর তপস্যা না হ'য়ে হ'ত খালি তাপ—আলোক থাকতো না বলে' তৃপ্তিও থাকতো না। সুর কেটে গেলে বেশ থাকতো না, শ্বাস ফেলতুম বটে, কিন্তু আশ্বাস কই!

তার চেয়ে ইন্দিরা এখন স্বামীর জন্যে সযত্নে বিছানা পাতুক। অশ্রু পোড়ারমুখিটা বেজায় বেড়েছে—নিতান্ত বেহায়া বলে'ই না তার স্বামীর কাছে এমন একটা খেলো নাটুকেপনা করতে সাহস পেলো। ওর কপালে আছে গভীর দুঃখ। ব্যবসা করতে বসে' যে ছিনিমিনি খেলে

তাকে হ'তেই হবে দেউলে। ধারে মাল বিকোয় না। মূলধন উড়িয়ে যে জুয়া খেলতে বসে তার মূল্যও সে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু একদিন ও ঘা খাবে, একদিন ও শান্ত হবে, একদিন ওর সোনার স্বপ্ন প্রথম প্রেমের মোহের মতই বাষ্প হ'যে মিলিযে যাবে দেখো। সেই দিনটি পর্যন্ত ইন্দিরা যেন বাঁচে।

দু'মিনিটে ইন্দিবা স্বামীব বিছানা ও নিজের মন গুছিয়ে নিলো। গুছিয়ে নিতে মেয়েমানুষের দেরি হয না। প্রথম জীবনে ভালোবাসার সে যে-স্বাদ পেযেছিলো সে শুধু স্বামী-প্রেম চাখ্বাব একটা আপাত-পরীক্ষা মাত্র। আজ মনে হ'ল রমাপতি গৌণ, নির্মল গৌণ—বড তার স্বামী, যে তাকে বিধি-অনুসাবে সন্তানেব জননী হ'তে দেবে, যার অন্নপ্রাশনে পাড়াব পাঁচজনকে ডাকলে তাঁরা পাত ফেলতে কুন্ঠিত হ'বেন না। দর্পণে ইন্দিরা আবার নিজের ছায়া দেখ্লো—প্রথম যৌবনে রমাপতির সংসর্গে এসেও সে এতো বড়ো সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেনি। সে ভাবী মা, পবাধীন ভারতবর্ষেব আসন্ন স্বাধীনতা, ঋষিকণ্ঠের আদিম সূক্তি! তার পীবর বুক, স্থূল উদর, ভাবাকুল চোখ, ভাবমন্থব দেহ—সব-কিছুই তার চোখে নবীনতর আবির্ভাব।

চাকরকে ডেকে অশ্রুর খাবাব তার ঘবে পৌঁছে দিতে ব'লে' ইন্দিরা বই নিয়ে পড়্তে বসলো। বইয়ে মন দেয কার সাধ্য। কিন্তু আজ আর বাইরে পাইচারি করবার মানে থাকে না। সে আজকের রাতের পেয়ালায় চুমুক দিযে সমস্তগুলি মুহূর্তের তলানি পর্যন্ত পান করবে। বমাপতির যে-দিন বাইরে থেকে এসে ইন্দিরার বন্ধ জান্লায় টোকা দেবার কথা, সে দিনো সে এমন স্তব্ধ হ'য়ে প্রতীক্ষা কবেনি। আজ না আছে সংশয়, না বা সমস্যা। আজকের প্রতীক্ষার ফলটা অবশ্যম্ভাবী জানা সত্বেও কেন জানি রহস্যময়। প্রথম রাত্রির বধূর মতো একটি

রোমাঞ্চময় আশংকানুভূতি, একটি সুখস্বপ্ননিবিড় তন্দ্রাচ্ছন্নতা। অথচ কতো সহজ। নিশ্বাস ফেল্‌বার মতো অনায়াস।

স্বামী হাত মুখ ধুচ্ছেন—এইবার শুতে আসবেন। স্বামীর এই শুতে আসাটা ইন্দিরার মনে হ'ত একটা নির্মম দস্যুতা, পরস্বাপহরণের ছদ্মবেশ। কিন্তু আজ মনে হল মালিনীর কুঞ্জে মালাকার আসছে—বরবেশে চোর। শয্যা যূপকাষ্ঠ নয়, সুখতীর্থ। ইন্দিরার দেহ বলি নয়, নৈবেদ্য।

ইন্দিরা বুঝেছে—কেন তার এই স্বাভাবিকতা, এই দৃঢ় সংযত সুস্থতা। তার স্বামীর তুলনায় সে কতো ছোট, কত নীচে পড়ে'। সেই বরং এতদিন নিজের ইচ্ছাকে দমন করে' রেখে নিজেকে মিথ্যে করে' উপক্রুতা ভেবেছে, স্বামীর কর্তব্যে সে তার নিজের কামনা-মাধুর্যকে সঞ্চারিত করে নি বলে' অপরাধী সে নিজেই। তার ইচ্ছা এতো দিন সীতার মতো নির্বাসিতা ছিলো—রমাপতির আদেশে। অনুরোধ নয়, আদেশে। তার জন্যে তার স্বামী দায়ী নয়। ওষুধ রোচক না হ'লেই রেচক নয় প্রমাণিত হয় না। সে মূর্খ, হীন, একচক্ষু—সম্পূর্ণ অন্ধ হওয়ার চাইতেও তা immoral। তার স্বামী বীর, তপস্বী—দুর্যোধন তার উপযুক্ত বিশেষণ।

সত্যি কথা বলতে কি, নির্মল যে অশ্রু-তে গলে' পড়ে নি, আজো তাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিলো—স্বামী-পূজার প্রথম পাঠ পেলো সে এই উদাহরণে। স্বামী তাকে নিয়ে দীর্ঘ ত্রিপদীতে কাব্য না করুন, স্ত্রীর প্রতি অমর্যাদার ঘৃণায়ই যে তিনি পরনারীর প্রেমকে সদর্পে লাঞ্ছিত করেছেন এ গর্ব ইন্দ্রানিরো ছিলো না। শুধু প্রত্যাখ্যান বা লাঞ্ছনাই নয়, উল্টে স্ত্রীর প্রতি সহজ কর্তব্যবোধ তার সম্পর্ককে এমন বড়ো বলে' স্বীকার করা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতোই মহিমাব্যঞ্জক—অথচ তার মতো ভাবপ্রবণ নয়। স্থির বুদ্ধি দিয়ে

প্রণোদিত, সহজ আত্মীয়তার দায়িত্বে দৃঢ়ীভূত সে-বিশ্বাস। অশ্রুর মুখ কালো হ'য়ে গেছে—নির্মল তার তারা। হোক্ দূর তবু অবিচল, হোক্ ক্ষীণপ্রভ তবু চিরস্থায়ী। নির্মল ভোগী কালিদাসের প্রবাসী নায়ক—যে বিরহ বোধ করে অন্তঃপুরচারিণী প্রিয়তমা স্ত্রী-র জন্য, যে তার পরিণীতা, প্র-ণীতা নয়।

নির্মল ঘরে ঢুক্‌লো। অবাক্—সমস্ত ঘরটি পরিপাটি ফিট্‌ফাট্। তার দৃষ্টি সচরাচর এতো সূক্ষ্ম নয়—তবু ঘরটিকে ঘিরে যে একটি শুচি-স্মিতি রয়েছে তা তাকে আকৃষ্ট করলো। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে অযথা বাক্য-ব্যয় করা তার অভ্যাস নয়। দীর্ঘদিনের শ্রান্তির পর সে এখন ঘুমুবে। ইন্দিরা রাত্রে খায়নি—আশা করেছিলো স্বামী একবার জিজ্ঞাসা করবেন: খেয়েছ? ও বল্‌বে না। তার পর উনি কি বলেন তাই শুনবার জন্যে ও কান পেতে থাক্‌বে।

কিন্তু কান পেতে ইন্দিরা শুন্‌তে পেলো স্বামী ইতিমধ্যেই ঠোঁট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করে' গাঢ়স্বরে নাক ডাকাচ্ছেন। স্বামী যে শুতে এসে নাক ডাকান এ মর্মান্তিক সত্য কথাটাই সে এতক্ষণ ভুলে ছিলো। সংক্ষিপ্ত করে' ইন্দু বলে' ডাকার রস এই শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের ঘায়ে মিলিয়ে যায়-যায়। কিন্তু,—এ কী ছেলেমানুষি। ইন্দিরা নিজের মনেই হাস্‌লো।

কিন্তু আজকের রাতটি যদি সে এমনি করে' হারিয়ে যেতে দেয়, তা হ'লে তার দাবী থাকে কী? এমন রাত কি যখন তখন আসে! এতো গুলি দিনরাত্রি নিষ্ফল প্রেমের পসরা বয়ে' তবে এমন একটি সুখসমৃদ্ধ শান্তিময় রাত্রির সন্ধান মেলে। মরুভূমিতে কতো চোখের জল ফেলে তবে এমন মরূদ্যান চোখে পড়ে। লাভটাই ত' বড়ো নয়, বড়ো হচ্ছে উপলব্ধি। তাই ইন্দিরা আজ স্বেচ্ছায় স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'বে।

ইন্দিরা বইটা মুড়ে রেখে ধীরে স্বামীর বিছানার ধারে এসে বস্‌লো। আকাশে বুঝি সামান্য মেঘ করেছে—হাস্‌নুহানার ঝাড়টা গন্ধে গদ্‌গদ। সমস্ত পৃথিবীময় একটি বচনহীন স্তব্ধ নিরাকুলতা। ইন্দিরা ধীরে নির্মলের চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগ্‌লো।

নির্মলের পাত্‌লা ঘুম—জেগে উঠ্‌লো। অস্বাভাবিক হয় ত', বা শ্রী-হীন। বললে—ঘুমুতে যাওনি যে।

ইন্দিরা বললে,—এমনি। ঘুম আসে না। তুমি ঘুমোও, আমি এমনি বসে' থাকি।

নির্মলের স্বর রূঢ়: না। পাশে ব'সে থাক্‌লে আমার ঘুম হয় না। সমস্তটা দিন ট্রেনের ধকলে যারপরনাই নাকাল হ'তে হয়েছে।

ইন্দিরা তবু ওঠে না, পা দুটি ভূমড়ে বিছানার ওপর উঠে বসে।

নির্মল বিরক্ত হ'য়ে বললে: এ কি? তোমার খাটে গিয়ে শোও গে। বেশি রাত জাগ্‌লে শরীর খারাপ হ'বে যে।

ইন্দিরা আরো একটু সরে' এসে বললে—হ'বে না।

—হ'বে না মানে? না, যাও। ঘুম না আসে, টেব্‌লে বসে' ডায়রি লেখ গে যাও। আমার থেকে তোমার যতো কিছু ক্ষতি হয়েছে সে-সব দুঃখ তোমার রমাপতির কাছে নিবেদন কর গে। বলে' নির্মল পাশ ফিরলো।

ইন্দিরা আবার ভুল করলে। উচিত ছিলো অভিনয় করা, কেন না তাকে গভীর করে' অনুভব করে', তার সত্যাবিষ্কার করবে ইন্দিরার পক্ষে একটা ইতিহাস নির্মলের সংসারে জমে' ওঠেনি। তাই তার উচিত ছিলো উচ্ছ্বাসের বশবর্তিনী হ'য়ে স্বামীকে জাদু করা; প্রণামে চুম্বনে মিনতিতে শপথে মিথ্যাবাদিতায় প্রতিবাদে একেবারে একটা মেলোড্রামার মহলা দেওয়া। সে তা না করে' বরং স্বামীর গা ঘেঁষে আরো একটু সরে' এলো মাত্র। কিন্তু নির্মল সহসা স্ত্রীর স্পর্শ থেকে সংকুচিত হ'য়ে বললে—যাও, যাও, এখানে নয়—

নির্মল উঠে বস্‌লো। রাগে ইন্দিরার নিচের ঠোঁটটি বৃষ্টি-লাগা ফুলের পাপড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। তবু বললে—তুমি অশ্রুর কথা সব বিশ্বাস কর নাকি?

নির্মল রুখে উঠ্‌লো: আমি কারু কথায় কিছু বিশ্বাস করে' কাজ করি না। যেমন অশ্রু তেমনি তার বন্ধু। দু'টিই এক-গোয়ালের যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না।

ইন্দিরা তবু ওঠে না। মৃদুস্বরে বললে- যখন কিছু শুন্‌লে-ই তখন সবটাই শোনো। পথের বিচার না করে' প্রাপ্তির বিচার করলে তোমাকে বুদ্ধিমান বল্‌বো।

—তোমার কাছ থেকে বুদ্ধিমত্তার সার্টিফিকেট্ নেবার জন্যে আমি রাত জাগতে চাই না। দয়া করে' তোমার স্পর্শ থেকে আমাকে মুক্তি দাও, রক্ষা কর।

ইন্দিরা এক সেকেণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। তবু বল্‌তে হ'ল: আমার স্পর্শ কি এতই অশুচি?

—নিশ্চয়। তুমি বিবাহিত হ'য়েও অন্যকাঙ্ক্ষিনী। সামাজিক সামঞ্জস্যে তুমি একটা উৎপাত।

—মিথ্যা কথা। ইন্দিরা খাট ছেড়ে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো।

—তবে নিয়ে এস তোমার ডায়রি। যে-নারী দেহ ও মন ভাগাভাগি করে' ব্যবসা করে, তাকেও দ্বিচারিণী বলে'ই আমি ঘৃণা করি। যাকে মন দিলে তাকেই যখন দেহ দাও নি, তখন যাকে দেহ দিলে তাকেও মন দিলে না কেন?

ইন্দিরা বললে—তুমি আমার মন চেয়েছিলে?

—মন আমি চাই নি, কেননা ওটা আমার পাওনা, দেহের মতোই আমার ক্রীত সম্পত্তি।

—মিথ্যা কথা।

—হোক মিথ্যা কথা। দয়া করে' এখন আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়। আমাকে ঘুমুতে দাও, কালকে আবার আমার বেরুতে হ'বে।

—কিন্তু ডায়রিটা পড়-ই না। পূর্ব ইতিহাস খালি আমারই নয়, তোমারো ছিলো। তুমি যেমন তাকে অতিক্রম করেছ, আমিও তেমনি তাকে পথ চল্‌তে খইয়ে এসেছি। অতীতের প্রতি যেটুকু আমার অস্পষ্ট মোহ আছে সেটা শুধু আমার কাব্যানুভূতির প্রবলতা মাত্র। তোমার মন পাইনি বলে'ই অতীতকে নূতনতর করে' সৃষ্টি করে' আমার মনের ক্ষুধা মেটাতে হয়েছে—

—রক্ষা কর, মনস্তত্ত্বের অমানুষিক বিদ্যে আমার নেই। কিন্তু তুমি আমাকে সত্যিই স্বীকার কর?

—স্বীকার না করে' আমার উপায় কি? সেই স্বীকারের চিহ্ন আমার সর্বাঙ্গে।

—স্বীকারই কর, ভালো তো আর বাসো না?

—তুমি বাসো?

নির্মল স্পষ্টস্বরে বললে—না। আমাদের যাত্রাটা সমানতালে সুরু হয় নি। আমি বিয়ে করেছি বিয়েকেই বড়ো করে' প্রতিষ্ঠিত করতে, তুমি বিয়ে করেছ সংসার-সংগ্রামে হেরে গিয়ে। আমার কাছে বিয়ে সংস্কার, তোমার কাছে সংহার। এ-যাত্রায় আবার ত্র্যহস্পর্শ আছে—সন্তান। এখেনে খালি স্বীকার-শপথেরই কথা ওঠে—ভালোবাসা বলে' একটা ভূতও এখানে ছায়া ফেলে না।

ইন্দিরার স্বর গাঢ়ঃ তবে?

—তবে। মীমাংসা, একটা সোজা সিদ্ধান্ত চাই। আমরা পরস্পরের প্রয়োজনসাধক—দেহপ্রসাধন। সেই পরিচয়েই আমাদের সত্যকারের আত্মীয়তা। কই, তোমার ডায়রি দেখি? বলে' নির্মল উঠে আল্মারি খুলে একটা মোটা খাতা বার করে' সুধোলঃ এটা?

কয়েক পৃষ্ঠা উল্‌টে যেতেই বুঝতে তার আর দেরি হ'ল না। দু'হাত দিয়ে খাতাটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

ইন্দিরাকে যেন কে চাবুক মারলে। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলোঃ এ-কী?

—নির্লজ্জতারো একটা সীমা থাকতে হয়। বলে' খাতার ছেঁড়া টুকরোগুলো নির্মল জান্‌লা দিয়ে খুঁড়ে দিতে লাগ্‌লো।

ইন্দিরা আর টুঁ-টি করলো না। ধীরে নিজের খাটে গিয়ে বস্‌লো। তবু একবার বলতে ইচ্ছা হ'ল হয় ত'ঃ খাতা ছিঁড়ে ফেল্‌লেই মনটাকে মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু বলে' কিছু লাভ নেই। স্বামীর সঙ্গে মীমাংসা একটা করতেই হবে। সেইটেই তার সাধনা। লাগুক-দীর্ঘ দিন, সে প্রতীক্ষা করে' থাকবে।

নির্মল বল্‌লো—অশ্রুকে বলো সে যেন শিগ্‌গিরই এখান থেকে সরে' পড়ে। তার সংসর্গ অন্তঃপুরের শুচিতার পক্ষে অনুকূল নয়।

ইন্দিরা বললো—বলবো।

—আর রমাপতিকে বলো সে মরেছে।

ইন্দিরা অল্প একটু হেসে বললো—বহুকাল। সে এমন মরেছে যে তার একটি কণাও সমস্ত পৃথিবীর ধুলো ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নির্মল সরে' এসে বল্‌লো—মনে রেখো তুমি আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের জননী, আমার অবিক্রীতা, বশম্বদা।

ইন্দিরা দীর্ঘাকুল চক্ষু মেলে বললে—সেই সত্যই আমি লাভ করেছিলুম আজ। সেই সত্যই আমার সীমন্তের সিন্দূরের মতো আমার জীবনে উজ্জ্বল হোক্‌। বলে' ইন্দিরা গলার ওপর আঁচল টেনে নির্মলকে প্রণাম করলে।

পালা হ'ল সাঙ্গ। প্রদীপও নিভলো। আবার নির্মলের নাক-ডাকা সুরু হয়েছে। ইন্দিরাও শুলো। খানিকক্ষণ ঘুম এলো না বটে। অল্প অল্প করে' মেঘ ডাক্‌ছে। দূরে কোন গাছের পাতায় পাৎলা একটু হওয়ার কান্না। জানলার বাইরে জমাট অন্ধকার। গলা পর্যন্ত চাদরটা টেনে নিয়ে ইন্দিরা কাৎ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার মন হাল্কা হ'য়ে গেছে—আজকের এই রাতটা পুইয়ে গেলেই সে বাঁচে। ভাবিবিটা নেই অশ্রুকে কাল সে চলে' যেতে বল্‌বে—হ্যাঁ বল্‌বেই ত'—তারপর সে, তার স্বামী—আর তার সোনার ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, সে বাঁচবে বৈ কি।

এক ঘুম পরে অশ্রু জেগে দেখ্‌লো বৃষ্টি হচ্ছে। দেশ্‌লাইটা জ্বেলে শিয়রের টাইম্-পিস্‌এ দেখ্‌লো পাঁচটা বাজে—বৃষ্টি হচ্ছে বলে' আলো ফুটছে না। আর ঘুমোবে না। জানলাগুলো মেলে দিয়ে সে চেয়ারে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে দিলো। তার মাথায় কি-যেন একটা ভাবনা ঢুকেছে। কিন্তু কোনো ভাবনাই অশ্রু তলিয়ে দেখতে শেখেনি। তবু মনে কে যেন তাকে একটা নাড়া দিয়েছে। সে কি প্রভাতকে সত্যিই এতো ভালোবাসে যে তাকে না পেলে ভাঙ খোর শিবের মতো সমস্ত ভুবন চষে' ফিরবে? সত্যি কথা বল্‌তে কি, এ পাওয়া-শব্দটা নিয়েই অশ্রুর যতো তর্ক, যতো গরমিল। নিয়ম কানুন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে যে-পাওয়া সে ত' একটা শিকারীর পাওয়া—যেমন চিড়িয়াখানায় বাঘ, কয়েদখানায় কয়েদি। পাওয়ার বেলায় যদি দাবের কথা ওঠে, তবে বিদায়, বন্ধু, বিদায়। পাওয়ার মধ্যে চাই মুক্তি, ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা। সে-অর্থে নির্মলকেও অশ্রু হারায়নি। দেহ দিয়ে পাওয়াটাই যদি বড়ো, তবে গরম জল এঁটো মুখ কুল্‌কুচো করে' খেয়ে ফেলাও স্বাস্থ্য। এই পাওয়াটকে কায়েমি করতে গিয়েই বিয়ে হয়েছে ব্যাধি, আইন নিয়ে আয়ান্ ঘোষই ফুঁসতে থাকেন, রাই আর কানাই গেছে নিধুবনে। দেহ দিয়ে পাওয়ার কথাই যদি ধরো, তবে দেহের স্বাস্থ্যটাও বিচার কোরো। রাত কতটা জাগলে বদহজম হবে, ক' সিঁড়ি ভাঙলে হার্টে ধর্‌বে কাঁপুনি, হিমে কতক্ষণ খোলা গায়ে থাকলে হ'বে প্লুরিসি, আয়ের দিক থেকে ক'টি সন্তান হবে কামনীয়। প্রভাত বে-হাত হ'লেই ভেউ ভেউ করে' কেঁদে-ককিয়ে কোনো স্বর্গ লাভ হবে নাকি? বৈধব্যটাই নারীজীবনের কৌস্তুভমণি। বিধবা হয়েছে বলে' শারীরিক প্রক্রিয়া তার কিছুই বাদ পড়ে না, অর্থাৎ যেগুলো তার স্বয়ং-সাধ্য। সন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক কামনাটাই তার পক্ষে

কলুষ। এমন দিনো ছিল যখন মেয়ের বিয়ে না দাও, সমাজ উঠ্‌বে নাক সিঁট্‌কে, বিধবা বানাও, সমাজের মুখ বন্ধ। অশ্রুর আশ্রয় খালি প্রভাতের বাড়ির রোয়াকটুকুতেই নয় সেটুকু কেন্দ্র করে' সমস্ত বসুন্ধরা। সে-আশ্রয় থেকে সে যদি বঞ্চিত হয়, তবে, তাই বলে' নিজেকেও সে বঞ্চিত করবে না। তার মন তখনো পিপাসী, দেহ উন্মুখ। সে স্বপ্তি চায় বটে, কিন্তু স্বপ্ন চায় না।

গভীরতাই হৃদয়ের সব কথা নয়, তার চাই বিস্তৃতি, তার চাই ব্যাপকতা। সমুদ্র গভীর বলে'ই সুন্দর নয়, প্রসারিত বলে'। আকাশ মহনীয় তার নিরুত্তর রহস্যময়তায় নয়, তার অনন্ত অবকাশে। মরুভূমি ত' প্রকৃতির নিরানন্দ বৈরাগ্যের ছবি, কিন্তু একটি শস্যঋদ্ধ ভূমিখণ্ড তার চেয়ে বেশি সুন্দর। সৌন্দর্যের অর্থ যদি কিছু থাকে তবে তার প্রয়োজনেই। কবির কাছে তা গ্রাহ্য না হোক্, কিন্তু ভালোবেসে সংসার করা আর কবিত্ব করা এক কথা নয়।

প্রেমের মন্ত্র বিরহে নয় বিহারে, বৈরাগ্য নয় রাগের দু'রকম অর্থে— রং আর প্রীতি। তবে খালি প্রেমে খালি পেট ভরে না বলে'ই একটু হিসেব চাই—সেইটেকেই যদি বড়ো করে' বলি, নীতিশাস্ত্রে তার অতিস্তুতি চল্‌বে। সেইটেই সংযম। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে নয়, দেহতত্ত্বের দিক থেকেই তার কীর্তন হওয়া উচিত। কেননা সংযমেই থাকে সম্ভোগের স্বাদ, জীবনের ছন্দোবদ্ধতা। দেহ যাদের কাছে অশ্লীল, প্রেম ও পরমায়ুও তাদের কাছে মূল্যহীন। কিন্তু অশ্রুর কাছে দেহ হচ্ছে তীর্থ, গিরিস্খলিতা তটিনীর মতো তার চঞ্চল রূপপ্রবাহ— তাই তার চাই অপরিমেয় প্রেম, চাই তার অনবসায়ী আয়ু। এবং এর জন্যেই সংযম শুধু সৌখিন বিলাস নয়, ব্যায়াম—তাতে ক্ষুধায় আসে স্বাদ, দেহে আসে আভা।

দু'মিনিটে অশ্রু মন ঠিক করে' নিলো। নির্মলের সঙ্গে দেখা করে' তার লাভ হ'ল এই, লাহোরের দিকে আর এগোনো গেলো না। তাকে আবার ফিরতে হবে। কল্‌কাতায়ই, ফিরতি-মেল্‌এ। প্রভাতের কিছু একটা হয়েছে। আজকে যদি তার কোনো চিঠি বা টেলি না আসে, তবে বুঝতে হবে বেরোবার আগে তার পাঁজি দেখা উচিত ছিলো। আর এখেনে বসে'-বসে' জিরোবারই বা কী মানে আছে আর? ইন্দিরাকে ত' সে এক ধাক্কা মেরে সীতা-সাবিত্রীর বেঞ্চিতে তুলে দিয়েছে। এ তার একটা কম কীর্তি নয়। সে না হ'লে ইন্দিরা একা মই বেয়ে স্বর্গে উঠতে পারতো না, যাতে পড়ে' না যায় সেই জন্যে তলায় থেকে তার ভার রক্ষা করতো কে?

'স্বামী তার কোনো ক্ষতিই করে নি।' অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে নিদ্রা ভেঙেছে, সন্তানকে অদূরবর্তী রেখে কাব্যানুরাগের মুখে দিয়েছে ছাই, দেহবীণাকে করেছে ভাঙা কুলো। নিজের ক্ষত ভুল্‌লো বলে'ই হয়ত সে ক্ষতি ভুলেছে। ইন্দিরা বাঁচলো। জীবনের বাকি ক'টা দিন ছেলের জন্যে কাঁথা সেলাই করে' ও ধোবার হিসেব ঠিক মতো রেখে যেতে পারলেই সে উৎরে গেলো। তার মরার পর নির্মল যদি একটা ইন্দিরা-নারী-মঙ্গল-সমিতি খাড়া করে' চাঁদার খাতা নিয়ে বার হয়, তখন ইন্দিরার জীবনী নিয়ে স্তুতিবচনের আর অন্ত থাকবে না, নির্মলের কীর্তিটাও হ'বে তাজমহলের সঙ্গে তুলনীয়।

চা নিয়ে চাকর এলো না, এলো ইন্দিরা নিজে।

কথা পাড়া মুশকিল। তবু বল্‌তে হ'ল অশ্রর: তোমার চাকরকে একবার পোস্টাফিসে পাঠাবো, একটা তার করবে। প্রভাতের খবর না পেয়ে ভারি চিন্তা হচ্ছে। যতদিন লোকটা হাতে আছে হাতের পাঁচও তারই প্রাপ্য। কি বল?

ইন্দিরা বললে—ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু আটটার আগে ডাক-ঘর হয় ত' খোলে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অশ্রু বললে—তারপর? চোখে তার দুষ্টু হাসি: রাত্রে বেশ ঘুম হ'ল?

ইন্দিরাও হেসে বললে—আমার insomnia বলে' কোনো উপদ্রব নেই। না কবি না বা প্রেমিনী।

—কিন্তু প্রেতিনীদের রাত্রে ঘুম আসে না, যেমন আমি।

চট্ করে' আর কি বলা যায় ইন্দিরা তাই ভাব্ছিলো। হঠাৎ যেন দু'য়ের মধ্যখানে একটা ব্যবধান নেমেছে। ইন্দিরার বিশ্বাস অশ্রুই ওকে আবেকটু হ'লে পথে বসিয়েছিলো, অশ্রুর বিশ্বাস তার অতটুকুন এগোনোতেই ইন্দিরা এ জন্মের মতো গেলো বেঁচে। ভূমিকম্পে বাড়ি যখন পড়লো না, তখন দেয়ালে যে টুকু সামান্য চিড় ধরেছে তা মেরামত করে' নিতে সময় লাগবে না। এ-বাড়িতে ইন্দিরার বুলুবে ঠিক।

টোষ্ট একটা চিবোতে চিবোতে অশ্রু একটা বইয়ে হঠাৎ মনোনিবেশ করলে।

ইন্দিরা বললে—যাই। তুমি পড়। উনি সকালে আবার কোথায় বেরোবেন, ওঁর জন্যে খাবার তৈরি করি গে।

শেষের কথাটা ইন্দিরা অমন জোর করে' না বলে' গেলেও পার্তো।

কারু জন্যে সকালে উঠে খাবার তৈরি করাটা বেবিলন্এর শূন্যো-দ্যানের মতো তেমন একটা কিছু নয়। ঘটা করে' বল্তে হয় বলো, স্বামীকে না ভালোবেসেও পূজো করলাম। পুষি-দিদিও তার স্বামীর জন্যে এমন-সব তপশ্চারণ করে যে, সতীত্বের connotation তাতে বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে দশটা ইন্দিরা কুড়ি হাতে পেরে উঠবে না। কিন্তু পুষি-দি পুষি দি, ইন্দিরা ইন্দিরা। এইটুকুনই তফাৎ। পুষি-দির

মনে স্বামীত্বের সমস্যা নেই, তাই তার কাছে ওর আত্মদান আত্মহত্যা নয়। ইন্দিরা তার ঢের পেছনে। আঁচলে আগুন চাপা দিয়ে সে তার মোমের ঘর সামলে চলেছে। তাতেই বা কম কৃতিত্ব কিসে? সে যে অসহায়। তাই বলো, অসহায়—যেমন ডেস্‌ডেমোনা, তাই তার মিথ্যা কথাটাও ঐশ্বরিক।

চাকরকে আর পোস্টাপিসে পাঠাতে হলো না। তার আগেই এলো সকালবেলাকার ডাক। অশ্রুর নামে একটা খাম আছে। প্রভাতের লেখা। অশ্রুর খুলে ফেললো:

অশ্রু,

ছুটি পাওয়া গেল না। মার অসুখ সত্ত্বেও না। বৌর অসুখ শুনলে ছুটি মিল্‌তো হয় ত', কিন্তু বৌ কৈ? তাই এ যাত্রায় আমি রইলাম পিছে। তুমি এখন কী করবে? যাবে না ফিরবে? না থামবে? আমাকে জানিয়ো।

কল্‌কাতার রূপ দেখবে এস—পূজোর কলকাতা! একটি প্রখরভাষিণী বক্ষণী নগরী। আমি অগত্যা তার প্রেমে পড়লাম।

প্রভাত

ভালোই হ'ল। অশ্রু যেন এমনি একটা খবরের জন্যে ব্যাকুল হ'য়েছিলো। তক্ষুনি টাইম-টেব্‌ল খুলে' দেখলো বিকেলের আগে ফিরতি-ট্রেনের সুবিধা নেই। চাকরকে সে নিজেই ডাকলো। এলো ইন্দিরা। অশ্রু বললে—চাকরটাকে ডাক ত'। তার একটা করতেই হচ্ছে।

—কোথায়? কেন?

—প্রভাতকে। স্টেশনে থাক্‌তে।

—তুমি আজই যাচ্ছ নাকি?

—আজই।

—লাহোর কি হ'ল ?

—মানচিত্র থেকে সরে' পড়েছে।

—কল্‌কাতায় যাবার এত তাড়া ?

হেসে অশ্রু বললে—আমার বিয়েটা পাকাপাকি করতে।

ইন্দিরাব মুখ গম্ভীর : পাকাপাকির আর বাকি কি ?

—একটু বাকি আছে বৈকি। তোমার মতন যদিও শিগ্‌গির পাকৃছি না। যাক্‌, জিনিস পত্র গুছিয়ে ফেল্‌তে হয়। বলে' অশ্রু চেযাব ছেড়ে উঠে হাত পা ছড়িযে একটা হাই তুল্‌লো।

ইন্দিবা বললে—একেবাবে আজই যেতে হবে ?

—তোমাব সাথে খাওয়া পযন্ত অপেক্ষা কববাব সময় নেই। যা হাক্‌, মনে খুব সুখ নিয়ে যাচ্ছি ইন্দিবা, তুমি স্বামী পেয়ে এতদিনে সুখী হয়েছ। মানে, হচ্ছ। মানুষ বদলাবে না, এটা বাড়াবাড়ি—বদলানো মানেই বৃদ্ধি। বমাপতি চিবকাল ভূত হযে কাঁধ জুড়ে থাকবে --ভবিষ্যৎকে এমন সংকীর্ণ করে' বাখাব পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। তুমি তোমাব খ্যাতি ও ঐশ্বয নিয়ে মহত্তব হও। ভাষায় বেশ মুন্সিয়ানা হচ্ছে, না ? বলে' অশ্রু তার ব্যাগ গুছাতে বস্‌লো। মুখে তার গুন্‌গুনানো চলেছে। এটা নাড়ে ওটা ফেলে এটা খোলে ওটা গুটোয়।

ইন্দিবা বললে—সত্যি তাই, অশ্রু। যে পরিবর্তন জীবনে স্বীকার কবলাম তাকে যেন কায়মনে অভিনন্দিত করতে পাবি। সত্যি তাই।

অশ্রু ও পুনরুক্তি করলো : সত্যি তাই। যেখানে শেষ সেইখানেই সুরু। জীবনেব চাকা খালি ঘুবে চলেছে। সাধু ইন্দিরা, সাধু।

নির্মলকে সকালের ট্রেনে নাইনি যেতে হয়েছিলো। ফিরলো সন্ধ্যার একটু আগে। বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে আসতে সে অশ্রুর কোঠার দিকে চোখ না ফেলে থাকতে পারলো না। দরজাটা বন্ধ। বাইরে থেকে শেকল।

ইন্দিরা কালকের মতোই জলচৌকিতে বসে' ষ্টোভে লুচি ভাজছে। নির্মল কাছে এসে শুধোল : অশ্রু ?

—বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় চলে' গেলো।

—গেলো ?

নির্মলের প্রশ্নের সুরে বিস্ময় আর হতাশা। কেন গেলো—প্রশ্নটা যেন সমীচীন হতো না। টাই-পিনটা নাড়তে নাড়তে পরদা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

ঘরটা যেন কেমন স্যাঁতসেঁতে। কেমন যেন খালি-খালি। ঐ চেয়ারটায় যেন কি ছিল। যেন বড়ো বেশি স্তব্ধ। দেয়ালগুলো অতিমাত্রায় স্থির। টেবলের ওপরকার বইগুলো বোবা। আজ বাগানে রজনীগন্ধার একটি কলিরো ঘুম ভাঙেনি।

বাথ-রুম্ থেকে স্নান সেরে ঘরে এসে দেখলো সাম্নে ইন্দিরা—টেবলের ওপর খাবারের ডিস্, চায়ের কাপ্ গুছিয়ে রাখছে, চুল আঁচড়ালো, জামাটা গায়ে দিলো, সিগারেট্ ধরালো। এখুনিই তাকে খাবার খেতে হবে। খাবার খেয়ে বই-খাতা-ম্যাগাজিন্গুলো নিয়ে বসতে হবে। সবই ঠিক্ঠাক্। চুপচাপ তেম্নি।

না।

দু' পা হেঁটে ফিরে সে ইন্দিরার দিকে তাকালো। ইন্দিরা আজ দারুণ সেজেছে—তবু বোকার মতো যে খোলা-চুলে গিঁট বেঁধে রজনী-গন্ধার কলি আট্কায়নি, নির্মলের সৌভাগ্য। ইন্দিরা যেন মূর্তিমতী

শান্তি, কিন্তু শান্তির মাঝে কি শ্রান্তি থাকে না? ইন্দিরা মূর্তিমতী দিৎসা, কিন্তু দানের অকৃপণ ইচ্ছার মাঝে কি দারিদ্র্য নেই?

চেয়ারে বসে' নির্মল শুধোল: হঠাৎ চলে' গেলো? তুমি বুঝি কিছু বলেছিলে?

—আমি আবার কি বলতে যাবো?

—তবু এত সাত-তাড়াতাড়ি পাড়ি মারলো?

—সকালের ডাকে কি-এক চিঠি এলো, অম্‌নিই দে-ছুট্।

—যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে' গেলো না?

একটু স্তব্ধতা। নির্মল রাশীকৃত খাবার ফেলে ছোট একটি পেঁপের টুক্‌রো দাঁতে কাট্‌লো।

—কেন চলে' যাচ্ছে কিছু বলে' গেলো না? ওদের ত' একত্র হ'য়ে আরো up-এ যাবার কথা শুনেছিলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

—আমার এমন কি গরজ পড়েছে?

নির্মল বিরক্ত হ'ল: বা, তোমার বন্ধু, তোমার বাড়িতে অতিথি। কেন হঠাৎ চলে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতে হয় না?

নিচের ঠোঁটটা উল্‌টে ইন্দিরা বললে—ছাই বন্ধু। অমন মেয়ের সংস্পর্শ থেকে সরে' থাকা উচিত।

কিন্তু এমন কথায়ো স্বামী আশ্বস্ত হ'লেন না: সরে' থাকা উচিত মানে? এমন একটি মেয়ে তুমি আর কোথাও দেখেছ? বিংশ শতাব্দীর মৈত্রেয়ী। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?

কথার সুরটা বিদ্রূপের হয় তো, কে জানে, প্রত্যুত্তরে ইন্দিরা জোরে হেসে উঠ্‌লো। হাসিটা কৃত্রিম, কর্কশ।

চায়ে চুমুক দিয়ে নির্মল বললে—রাস্তার জন্যে খাবার তৈরি করে' দিয়েছ ত'?

—রাস্তায় খাবার খাওয়াটা ত' বর্বর প্রথা।

—হোক্, দিতে চেয়েছিলে ?

—না।

—স্টেশনে তুলে দেবার জন্যে সঙ্গে বিমলকে পাঠিয়েছিলে ?

—বিমল কোথায়। গেছে খেল্‌তে।

—কিন্তু রামসেবক ত' ছিল।

—ঘরে তখন কতো কাজ।

—কাজ মানে ?

—কাজ মানে কাজ। এবার ইন্দিরার চট্‌বাব পালা: এতো যখন দরদ তখন নিজে এসে ব্যাগ্‌টা গাড়িতে তুলে দিলেই ত' পারতে। এইটুকু পথ ত' স্টেশন। হেঁটেই চলে গেলো।

—হেঁটেই চলে' গেলো ? একটা টাঙা পর্যন্ত ডাকিয়ে দাও নি ? খাবারেব ডিস্‌টা ঠেলে দিয়ে নির্মল দস্তবমতো গালাগাল করলে: বর্বর কোথাকার। এতটুকু সৌজন্য তোমাব নেই ?

কটু স্বর হয় ত' ইন্দিরার মুখ দিয়েও বেরোত, কিন্তু সে সংযম অভ্যাস কবছে। এখানে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তার পা টল্‌বে—তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে বেবিয়ে গেলো।

ঢুক্‌লো এসে শোবাব ঘবে। ধপাস্ করে' দরজা বন্ধ করলে। ছি ছি, সে আবার ঘটা করে' তার পাতিব্রত্যের বিজ্ঞাপন দিতে বেরিয়েছিলো। ইন্দিরা এক ঝট্‌কায় তার শাড়ির আঁচলটা বিস্রস্ত করলে, খোলা চুলগুলো উস্কখুস্ক কবে' দিলে। এ-অবস্থায় কাঁদলে বুঝি ইন্দিরাকে মানাতো। কিন্তু সে তার খাটের ওপর শুয়ে পড়ে' শূন্য চোখে সিলিঙ্‌ দেখতে লাগলো। আলো অবধি

[জ্ব]লো না।

কিন্তু হাল যখন সে একবার ধরেছে তখন সহজে তার মুঠি সে আল্‌গা করবে না, শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবে। নৌকো যদি ডোবে ডুববে, কিন্তু চরম দুর্ঘটনার দিনে সে বলে' যেতে পারবে যে সমানে সে হাল ধরে' ছিলো। না, তার অভিমান করবার মানে হয় না। অভিমান করে' কী-ই বা সে করবে? বেরিয়ে পড়বে? কার সঙ্গে। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অন্নদা-দিদির কথা মনে করে' সে একটু হাস্‌লো। শরৎচন্দ্র ভারি চালাক—সাহসও দেখাবেন সমাজকেও চটাবেন না—এই তাঁর সাহিত্য-রচনার শস্তা কৌশল। অন্নদাদিদি ঘর ছাড়লেন, কিন্তু যার সঙ্গে পথে নামলেন সে মুসলমান সাপুড়ে নয়, সে তাঁর স্বামী। জীবানন্দ নারী-মাংসের লোভে চণ্ডীগড়ের ভৈরবীকে ঘরে পুরলে, কিন্তু সেই হ'ল তার অলকা—লোকের খুঁৎখুঁৎ করবার কারণ ঘুচলো অচলা সুরেশের সঙ্গে ঘর ছাড়লো, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়-সুরেশ তাকে একটা কায়দা করে' লুফে নিলো ট্রেনের কামরায়। শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্বের দিকে না তাকিয়ে সমাজের মুখ চেয়েছেন খালি। শুধু এক কিরণময়ী। সে স্বেচ্ছায় উপেনের হাতে নিজেকে উপহার দিতে চেয়েছিলো, প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে তার ছোট ভাইকে নিয়ে রেঙ্গুনের জাহাজের বদ্ধ কামরায় ঝড় তুল্‌লে। কিন্তু অন্নদার সমাজতান্ত্রিক শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে' সে হ'ল পাগল, সে হ'ল ব্যাধি-বিজ্ঞানের একটা খেলো নিদর্শন মাত্র।

বেরবার পথ ইন্দিরার বন্ধ—একটি ঘুলঘুলিও কোথাও নেই। পেটে তার ছেলে। ইব্‌সেনের নোরা ছেলে-মেয়ে, পুতুল পূজা—সব-কিছু ফেলেই পথে পা দিলো কিন্তু। দিক্‌, নরোয়ে আর বাঙ্‌লা দেশ এক নয়—যেমন কাছাকাছি নয় ইব্‌সেন্‌ ও শরৎচন্দ্র। এমন কেউ নেই যে যার সঙ্গে বেরুলে দৈনিক খবরের কাগজগুলো খেঁকাবে না। যদি ধরা

যেতো রমাপতিই তার স্বামী, নির্মলের কাছে সে বন্দিনী—রাবণের কাননে সীতার মতো—সে এই পাপপুরী ত্যাগ করে' স্বামী-অভিসারিণী হ'ল, তা হ'লে হয় ত' সমাজ খুশি হয়, শরৎচন্দ্র খুশি হন্। কিন্তু রমাপতিই যে তার স্বামী এ কথা সমাজকে বোঝাবে কে? অতএব তা থাক্। সমাজের সঙ্গে বিরোধ ঘটাতে ইন্দিরা বসেনি, তার সে উদ্বৃত্ত সামর্থ্য নেই, নেই বা সে তেজ। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যেই সে নিজেকে ছেঁটে-ছুঁটে খাটো করে' খাপ্ খাইয়ে নিয়েছে। আত্মহত্যা। আবার সেই বাধা। পেটে তার ছেলে। তা ছাড়া আত্মহত্যা করলেই কি জ্বালা জুড়োয় নাকি? মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটা মিথ্যা কল্পনায় কত লোক সেখানে গিয়ে দেউলে হ'ল কে তার হিসেব রাখে? তা ছাড়া নিজের হাতে নিজেকে মারবার মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড বীভৎসতা আছে তার কুশ্রীতা দুর্বিসহ। সে-কথা ভাবলেও তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র কুঁকড়ে আসে। আত্মহত্যাই যদি সে করতে পেতো তা হ'লে এ-অভিনয়ের এত সাজ-সরঞ্জাম করতে গিয়েছিলো সে কি ভেবে? সে সংসারস্রোতে গা ভাসবে। এখনো আশায় সে ফতুর হয়নি।

অতএব এখন তার খাটের ওপর শুয়ে-শুয়ে অলস চিত্তবিনোদের অবসর নেই। শাশুড়ি সেই যে কাশীতে গেছেন কবে ফিরবেন কেউ জানে না।' সংসার এখন ওর হাতের তালুতে, উপুড় করলেই উল্‌টে পড়ে। ঠাকুরটাকে রান্না দেখিয়ে দিতে হ'বে। কাল্‌কের পুনর্জীবন-লাভকে উৎসবরমণীয় করবার জন্যে সে আজকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছিলো। এ উৎসব অশ্রুকে বাদ দিয়েই। উৎসব সমাধা না করবার কোনো মানে নেই। পাড়ার কয়েকটি মহিলাকে সে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে। তারা এখুনি এসে পড়বে। মিলি আনবে তার এস্রাজ, বীণার বৌদি অংশুমালা বাজাবেন অর্গ্যান। ইন্দিরা অর্গ্যানটা

কত দিন ছোঁয়নি। এখন ওঠা যাক্, ন্যাকামো ঢের হয়েছে। যার প্রতিকার নেই তার প্রতিবাদ করবার লজ্জাটা আরো অমানুষিক। এখন না উঠলে নিমন্ত্রিতাদের উপযুক্ত আতিথ্য করা হবে না।

আলো জ্বালিয়ে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা চুল আর আঁচল ঠিক করতে ব'লো। অশ্রু নির্মলের চোখে কুজ্ঝটিকার জাল বুনে গেছে। কিন্তু রমাপতি যেন তার শ্মশানশয্যা থেকে উঠে না আসে। রমাপতিই অনাহূত, অবাঞ্ছনীয় - অশ্রুর জন্য দুয়ার খোলা, মুক্ত আতিথেয়তা।

বড় দুঃখে ইন্দিরার মনে পড়লো পাগল হ'য়ে নীট্‌শে পাগল-ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গকে কি চিঠি লিখেছিলেন :

আমি একটি দিন ঠিক করেছি। সে-দিন ইউরোপের সমস্ত রাজা উপস্থিত হবেন। আমি তাঁদের মারতে আদেশ দেব।

বিদায়। আবার আমাদের দেখা হ'বে।

কিন্তু এক শর্ত। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ করতে হ'বে।

নীটশে সীজার্

পাগল-ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ উত্তর দিলেন :

ইতিমধ্যে এস উন্মত্ত আনন্দ করে' নি। বিদায়।

তোমার ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ

সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ বিধাতা

নীট্‌শের উত্তর :

যথেষ্ট। চাই শুধু বিবাহচ্ছেদ।

'The Crucified'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে-হ'তে বারোটা।

নির্মলের সঙ্গে ইন্দিরার নিভৃতে দেখা হলো বারান্দাতেই। নির্মল শোবার ঘরে না ঢুকে বসবার ঘরের দিকে মুখ করেছে। ইন্দিরা বললে রাত অনেক হ'ল।

নির্মল বললে—জানি।

—শুতে যাবে না?

—যাবো। এখনো আরো কয়েকটা কাজ সেরে ফেল্‌তে হ'বে। কিন্তু আজকে হঠাৎ এত ঘটা কিসের?

—এসো শোবার ঘরে বল্‌ছি।

—এখেনে বল্‌লে রাতের অন্ধকার ঘনতর হ'য়ে উঠবে না।

ইন্দিরা জীবনে আরেকটি সুযোগ হারালো। নির্মল যদি ঘরে আস্‌তো, তা হ'লে perspective ছোট হ'য়ে উঠতো বলে' তার অভিনয়োচ্ছ্বাস বেমানান্ হ'ত না। পতিভক্তি নাটকের পঞ্চাঙ্কের অবশ্যম্ভাবী শেষদৃশ্যটির সে এতক্ষণ মহলা দিয়েছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ ও আকাশের তারা দেখা যায় সেখানে এতো বড়ো একটা ব্যঙ্গভূয়িষ্ঠ নাটক করতে হাত পা তার একটুও নড়তে চাইলো না। তবু এখানে দাঁড়িয়েই তাকে বল্‌তে হ'ল: কাল তোমাকে পরিপূর্ণ করে' গ্রহণ করেছি, নিজেকে দানও করেছি মনের মত করে' পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদে। এই জন্যেই আজকের এই উৎসব। ভেবেছিলুম ঘরে এলে তোমাকে আরো ভালো করে' বুঝিয়ে বল্‌বো। কথা দিয়ে সব জিনিস প্রাঞ্জল করা যায় না।

নির্মল এ-কথার ধার দিয়েও গেলো না। বললে—এমন একটা উৎসব করবে অথচ বিকেল বেলায়ই অভ্রকে বিদায় করলে? অন্তত আজকের রাতটার জন্যে তাকে তুমি ধরে' রাখতে পারলে না?

ইন্দিরার হৃৎপিণ্ডে কে যেন হাতুড়ি চালালো : আমি তাকে ধরে' রাখবো কি করে' ? সে যেমন জেদি মেয়ে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য।

—তুমি নিশ্চয়ই তাকে কটু কথা বলেছ।

—আমি বল্‌তে যাবো কোন্‌ লজ্জায় ? কাল রাত্রে অপমান তুমি তার কম করেছ নাকি ?

—আমি করেছি অপমান ? তুমি বললেই হ'ল।

—হ্যাঁ, আমি বল্‌লেই হ'ল। বিবাহিত ভদ্রলোকের লুকোনো মনোবৃত্তি টের পেয়ে সে লজ্জায় মুখ ঢেকে সম্ভ্রম বাঁচিয়েছে।

—কি বল্‌লে ?

ইন্দিরার সকল প্রতিজ্ঞা গেলো ভেসে : ঠিকই বললুম। তোমার চরিত্রগর্ব আত্মম্ভরিতার ভাণ মাত্র। এ লজ্জা খালি আমার নয়, অশ্রুর মতো মেয়েরো। বলে' ইন্দিরা তাড়াতাড়ি তার নিজের ঘরে এসে দুয়ার বন্ধ করে' দিলো।

এবার স্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্মে প্রভাত। এলাহাবাদে গিয়ে মিলিত হওয়ার চেয়ে অশ্রুর ফিরে আসার মধ্যে চমৎকারিত্ব বেশি আছে, কেননা শেষেরটা অপ্রত্যাশিত। যা কিছু চাওয়ার বাইরে তার পাওয়ার মধ্যে একটু চমক থাকে—কবিতায় আন্‌কোরা ও অব্যবহিত-পূর্ব মিল পেলে মানেটা যেমন আরো ধারালো হ'য়ে ওঠে। বায়রনের Don Juan-এর চমকপ্রদকতা কতকটা সেই কারণে। বিষয়বস্তুটা খেলো, খোলসটাতেই তার জৌলুস। মানুষের সভ্যতাটাও তাই। লৌকিক ব্যবহারে সে বিলাস চায়, জীবনে নয়। কাজের মানুষ তারাই যারা আর্টিস্ট-হিসেবে নিতান্ত খাটো, তারা আত্মপ্রকাশ করে স্বষ্টিতে নয়, পরাধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ করে'। প্রেম বা বন্ধুতা নিয়ে তাদের তৃপ্তি নেই, না বা More-এর Utopia-য়, তাদের চাই শক্তি-প্রসার, তারা চায় পরের চরকায় নিজেরা তেল জোগাবে। তারা রাজ্য গড়ে, শান্তি ভাঙে—সত্য না চেয়ে চায় নিরাপত্তি। পুলিশকে সে সভ্য বল্‌বে? তবু তারাই হ'ল সভ্যতার বাহন। এক নিয়মের বশবর্তিতার অর্থই সভ্যতা। তুমি তোমার শিরদাঁড়া খাড়া করে' উঁচু হ'যে দাঁড়াও, লিলিপুটের দেশের লোকেরা মই বেয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে কান্‌ মল্‌তে চাইবে। বলবে: সভ্য হ'তে চাও ত' পিঠ কুঁজো করে' আমাদের সঙ্গে মাথা মেলাও। তুমি যেখানে স্বষ্টি করবে সেইখানেই তুমি সভ্য নও, তুমি যখন সে-স্বষ্টির গুণগ্রহণ করবে তখনই তুমি সভ্য। সত্যের নবাবির্ভাবের দিনে যদি তুমি আহত হ'য়ে আঁৎকে ওঠ, বুঝতে হবে তোমার বিচারবুদ্ধিতে মর্চে ধরেছে। 'সীতা' শুনে কান্না পায় বলে'ই শিশির ভাদুড়ি বড় অভিনেতা এ-উক্তিটা সভ্যতার পরিচয় নয়, বা সীতা-সম্বন্ধে 'ঘরে বাইরে'তে সন্দীপের উক্তিটা মালায়েম নয় বলে'ই তাকে গালি পাড়াটাও বর্বরতা। পরকে মেনে নেবার sense of

humour-টাই হ'ল সভ্যতার মাপকাঠি। 'চরিত্রহীনে'র উপেন চরিত্রগর্বে এতো হীন ও কাপুরুষ যে সতীশের ঘরে সামান্য একটা শাড়ি শুকোচ্ছে দেখেই সে পিট্টান্ দিলো। এমন একটা মেরুদণ্ডহীন মূর্খকেই কি না শরৎচন্দ্র সতীশের foil বলে' দাঁড় করিয়েছেন। নিজের নিজের মানসিক ও বুদ্ধিগত অকর্মণ্যতাকেই নিরীহ মানুষ বড়ো করে' তার নাম রাখে নীতি, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার। বালক ডিজ্রেইলির জু হ'য়ে কম লাঞ্ছনা হয় নি—রাস্তায় বেরোল সে হল্‌দে পায়জামার লাল কুর্তা এঁটে। অতএব সে ইতর। শবদেহ সমাজের ব্যাধির সৃষ্টি করে, কিন্তু শবদেহ কেটে-কুটে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে তার সদ্গতি না করলে ব্যাধি-নির্ণয়ই চল্‌তো না। সাপ আমাদের দংশন করে বলে'ই তা কুৎসিত, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে ওর চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই —তা ছাড়া ওর বিষে নাকি পচা ঘায়েব ওযুধ হয়।

আমি আছি—এর চেয়ে বড়ো জ্ঞানাবিষ্কার মানুষের আর কি হ'তে পারে? শুধু জীবনে নয়—জীবনের অনুকৃতি যে সাহিত্য—তাব মাঝেও মানুষের কায়দা-কানুনের বাঁধা গৎ আছে। সেই গৎএ সুর মিলিয়ে ভাষাযোজনা কর্‌তে হ'বে। উপন্যাস লিখতে বসে'ও সেই এক নিয়ম; চাই একটা সুসম্পূর্ণ প্লট, কথোপকথনেব প্যাঁচ, একটা অতি প্রত্যাশিত আকস্মিকতা। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর 'গোরা'য় বিনয়ের বাড়ির সাম্‌নে পরেশবাবুর গাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিযে প্রথম আলাপের সূত্রপাত কর্‌লেন,—লাবণ্য ও অমিতের মোটরে একটা সঙ্ঘর্ষ লাগছিল আরেকটু হ'লে। এগুলি অত্যন্ত মামুলি প্রথা, আমাদের অভ্যস্ত পাঠকের তা মুখস্থ হ'য়ে আছে। ছাঁচে ফেলে চরিত্রকে একটা নমুনায় রূপান্তরিত করতে হ'বে স্বপ্রধান ও সীমাবদ্ধ একটা ব্যক্তি করতে নয়। গল্প হ'লেই চাই তার ঘটনা, চাই তার সমাপ্তি, কবিতা হ'লেই চাই তার একটা

বোধ্যতা। দূরের তারাকে আমার চোখে যদি হল্‌দে লাগে, অন্ধকারকে লাগে যদি নীল, তবুও আমাকে লিখ্‌তে হ'বে শাদা তারা, কালো আঁধার যদি বলো লুভার্‌এ Phedias-দেবীদের মুণ্ডহীন মূর্তিগুলির সৌন্দর্য তাদের গঠন গৌরবে বা ভঙ্গি-সুষমায় নয়, তাদের মুণ্ডহীনতায়, তবে সমসাময়িক সমালোচনাও হ'বে চামুণ্ডা। লোকের মুখ চেয়ে সত্য আমার কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে না, এ-সত্য কথা বোঝাই কাকে ? বস্তুতান্ত্রিকতা এককালে সাহিত্যরচনার ফ্যাশান্‌ ছিলো—যেমন ধরো জোলা, আরো আগে যেমন ধারা, জেইন্‌ অস্টিন্‌। কিন্তু হুবহু বল্‌তে গিয়ে বহুবর্ণনাতেই ব্যক্তির সত্য পরিচয় ধরা পড়ে না, তা হ'লে 'পথের পাঁচালী'ও একটা উঁচু-দরের নভেল হ'ত। আগে নিয়ম ছিলো: বিষয় ও ব্যক্তি নির্বাচন করো, এখন নিয়ম হোক্‌: কিছুই অনির্বাচিত রেখো না। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম থিয়োরেম্‌ নিয়েও কবিতা হয়, গ্রাম্য গৃহস্থবধূর বর্ণচ্ছটাহীন সোজা সাধারণ জীবন নিয়েও বারো খণ্ডে উপন্যাস হ'তে পারে। মানুষের সত্যিকার জীবন তার জীবনের ব্যবহারে নয়, জীবনের অন্তঃশীল অবচেতনায়। তুমি চাঁদ দেখে কি ভাব সেইটেই তোমার জীবনে সত্য, তুমি চাঁদ দেখে হাত বাড়িয়ে তাকে ডাক কি না সেইটে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। শেহভ এ-কথা বুঝেছিলেন, তাই তাঁর নাটকে চিন্তাই হচ্ছে ক্রিয়া, দ্যোতনাই হচ্ছে সম্পাদিত ক্রিয়ার চেয়ে বড়ো সত্য।

উপন্যাসকে আমরা ব্যবহারিক জীবনের একটা প্রতিফলন করে' তাতে রঙ চড়াতে চাই; নায়ককে করতে চাই বীর, অনন্ত মহনীয়—হয় তার ভয়াবহ সচ্চরিত্রতায় নয় দুর্দাম বলিষ্ঠতায়, নয় বা তার জঘন্য হীনবৃত্তিতে, যাতে সে লোকের ঘৃণা কুড়োবে, নয় বা সহানুভূতি। হয় প্রতাপ; নয় গোরা—বা কিরণময়ী বা দেবদাস। এমন লোক না খুঁজি

যে মুদির দোকানে দু' বেলা হিসেব রাখে, তামাক খায় আর তাস খেলে। এমন লোক খুঁজি না যার জীবনে দুর্ঘটনা নেই, সম্ভাবনা নেই। একঘেয়েমিই যে জীবনের প্রতিপাদ্য সত্য, সাহিত্য তা বিস্মৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিকরদের বিশ্বাস করে' নেপোলিয়নকে আমরা চিরকাল বলদৃপ্ত বীরপুরুষ ব'লেই পুজো করে' সুখ পেতুম, কিন্তু লুড্‌উইগের কাছে নেপোলিয়নের জীবনের কবিত্বটাই বড়ো বলে' দেখা দেয় নি। নেপোলিয়ন্ যে খালি যুদ্ধ জয় করে নি, ভালোও বেসেছে এ সত্য কথাটা আমাদের কাছে এতো দিন লুকোনো ছিলো। আঁদ্রে মরোয়া শেলিকে দেখ্‌লেন প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড্ বলে' নয়: ফ্রান্সে ওয়ার্ডসোয়ার্থের নাকি একটি জারজ শিশু ছিলো। গান্ধি যে এককালে চামড়ার মানুষ ছিলেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যত বংশধরেরা হয় ত' তা ভুলে যাবে। মুসোলিনি যে এককালে ভিক্ষা করতো এ-কথা ক'টা লোক মনে রেখেছে?

তুমি যা তুমি তাই—তুমি ঘুরে-ঘুরে বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে না পার, সোজাই চলে' যেয়ো, পরের হাত ধরে' নিরাপদ হ'বার জন্যে তবু বেঁকো না। তুমি যা তুমি তাই। তুমি তোমার নিজের নায়ক হও। কি তোমার করা উচিত—তার চেয়ে কি তুমি কর, তাহাতেই আমাদের বেশি অনুরাগ, বেশি কৌতূহল। পরের জুতোয় পা ঢুকিয়ে তুমি চল্‌বার বেগ তুমি হারিয়ো না, পরের আদর্শ তোমার পক্ষে আত্মঘাতী। তুমি নিজে যা তুমি তাই: জীবন যেমনি ভাবে আসে তেমনি করে' নিলেই তুমি অবিনশ্বর।

ট্রেন লেইট্ হয় নি—প্রভাতই আগে এসেছে। ভাগ্যিস আজ রবিবার, রোদ উঠে গেলেও কেরানিরা এখনো উঠে নি—আজ সকালে তাদের নিদ্রোৎসব চলেছে। আপিস্ যেতে হবে না—এটার স্বাদ অক্রূর

আসার চেয়েও মিষ্টি। এঞ্জিনটা প্লাটফর্মে এত জোরে প্রবেশ করলে, যেন তার যে এখানে থামতে হবে তা তার মনেই নেই একেবারে। অশ্রু নেমে এলো, মাথার চুল রুক্ষ, চোখ দুটী ঘুমো-ঘুমো, এঞ্জিনের কয়লায় জামা-কাপড়গুলি অপরিচ্ছন্ন। সজ্জা সম্বন্ধে অশ্রুর এ-অমনোযোগটি প্রভাতকে স্পর্শ করলো—অন্তত মুখটাও সে ধোয়নি। চেহারাটির মধ্যে মধুর একটি মালিন্য আছে। প্রভাতকে দেখতে পেয়েই অশ্রু একটু হাসলো—হাসিটিও তীক্ষ্ণ নয়, কেমন-যেন একটু চাপা, ফ্যাকাসে। যেন আর চটুলতা নয়, অন্তরময়তাব সূক্ষ্ম একটি ইসারা। প্রভাত গেলো এগিয়ে।

ট্যাক্সিতে উঠে বাঁচা গেলো। অশ্রু বললে ভালোই হ'ল ফিরে এসে। বলে' তার একখানি হাত প্রভাতের কোলের ওপর রাখলো।

প্রভাত বললে—কোথায় যাবে এখন ?

অশ্রু অবাক : বা রে কোথায় আবাব যাবো ? বাড়ি!

বিস্ময় প্রভাতেরো কম নয় : বাড়ি। সেখানে ত' তোমার দুয়ার বন্ধ।

—সে-বাড়ির কথা কে বলেছে ? তোমাব বাড়ি। তোমার ব ড়ি কি ঝড়ে উড়ে গেছে নাকি ?

—আমার বাড়ি!

অশ্রু অভিমান করতে জানে : ও। জানতাম না যে আমি তোমার পর, আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।

অশ্রুর এ কি অভাবনীয় পরিবর্তন! চোখ দু'টিতে গভীর মৌন, মুখচ্ছায়ায় একটি অস্পষ্ট কাকুতি? প্রভাত তাকে নিজের আরো কাছে আকর্ষণ করলে। ক্ষণেকের জন্যে যেন হিসেবের সবগুলি অঙ্ক মিলিয়ে গেলো, সকল লজিক্‌কে মন্ত্রমুগ্ধ করে' দেখা দিলো ম্যাজিক। বললে—নিশ্চয়ই যাবে, আমার মা তোমারও মা।

প্রভাতের পশ্চাদ্বর্তিনী একটি অপরিচিতা মেয়ে দেখে মা প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেন। বুঝে নিতে দেরি হ'ল না এই-ই অশ্রু যার জগদ্ব্যাপিনী খ্যাতি, —সম্প্রতি যিনি তাঁর ছেলের পশ্চাদ্ধাবন করছেন। তাঁর ছেলেকে এ-মেয়ের যে কেন পছন্দ হ'ল বলা কঠিন—উল্টো প্রশ্নটা তার মনে ঘেঁষতেই পারলো না, কেননা প্রথম দেখাতেই তিনি ঠিক ধরে' নিতে পেরেছেন যে বয়সে অশ্রু তাঁর ছেলেকে ছাপিয়ে গেছে। যদিও অশ্রর বয়স তেইশ, মার কাছে মনে হচ্ছিলো তেত্রিশ। বেশ ঢ্যাঙা, স্বাস্থ্যবতী। বাহু দুটি সুডৌল, আঙুল ক'টি সুঁচলো। চোখ দু'টি গভীর। মুখে নানান্ রকম্ খুঁত, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন-যেন ঢলঢলে।

কিন্তু কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই অশ্রু মায়ের পায়ের কাছে উবু হ'য়ে প্রণাম করলো—সভক্তি প্রণাম। মা ওর খোঁপার ওপর হাত রেখে আশীর্বাদ না করে' পারলেন না। দুই চোখে স্নিগ্ধ নম্রতা নিয়ে সে বললে—আমাকে তুমি চিন্‌তে পাচ্ছ না, মা? আমি অশ্রু।

—খুব চিনেছি, মা। এসো ভেতরে। ট্রেনে খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি?

হেসে অশ্রু বললে—কষ্ট আমার কিছুতেই তেমন হয় না। আমি তেমন-দরের মেয়ে নই মা, যে, আত্মকর্তৃত্বে চলা-ফেরা করবো অথচ বাস্-এ কিংবা ট্রামে উঠে কোন পুরুষের জায়গা ছেড়ে দেবার আশায় কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। সে যদি জায়গা ছেড়ে দেয়-ও আমি তাতে বসি না। আমি সেধে অপমানিত হ'তে চাই নে। দিল্‌দারনগরে এম্‌নি কাণ্ড ঘটেছিলো, মা। গাড়িটা একদম ঠাসা। মেয়েছেলে দেখে একটি ছোক্‌রা ভদ্রলোক জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী আপ্যায়িতই না করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাঁর ঐ অকৃপণ বদান্যতা নিই কি করে'? আমি বড্ড বেশি বাজে বকি, না? আমাকে তুমি যে কী ভাবছ কে জানে! তোমার সমস্ত কাজ যে এখনো পড়ে'

আছে। তবকারি কুটছিলে? ও কি, বিছানা এখনো তোল নি? অশ্রু বিছানাটা তুলতে ব্যস্ত হ'ল।

মা বাধা দিয়ে বললেন—তুমি এ সব করছ কি? এখন একটু জিবোও। চান্ করবে? না, এখন না-হয় মুখহাত ধুয়ে একটু বোস, আমি তোমাকে চা করে' দিচ্ছি।

অশ্রু একেবারে আকাশ থেকে পড়লো: তুমি চা করে' দেবে কি মা? আমি কি তোমার তেমন মেয়ে নাকি? আমি এখনো এত শিক্ষিত হই নি মা, যে চা বানানো, ঘর ঝাঁট দেয়া, তরকারি কোটা বা বাসন-মাজায় একেবারে ফেল্ করে' যাবো। তুমি যদি আমাব জন্যে অকারণে ব্যস্ত হও, তা হ'লে বুঝবো তুমি আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ দাও নি। আগে চান্টাই আমি সেবে নি। (প্রভাতকে) তুমি ততক্ষণ একটু দাঁড়াও, এসে আমি চা করছি।

অশ্রুর প্রতি মা'র মন বরাবরই বিমুখ ছিলো। কিন্তু নদী এখন উজোন। তিনি ভাবতেন আজকালকাব পড়িয়ে মেয়ে, নয়কে হয় করাই ওদের ব্যবসা। সরু লিকলিকে চেহারা, বও ফ্যাকাসে, পিঠ কুঁজো, মেজাজ টেডা, কথাবার্তা চিবানো-চিবানো—এমনি ধবনের একটা আজব চেহারা তাঁব মনে চিরকাল ধরা ছিলো। কিন্তু অশ্রু শ্রীমতী, দেহ ভরে' তার স্থির স্বাস্থ্য, শাড়ি পরার ভঙ্গিটি সাধারণ বলে'ই সুষমান্বিত, দুই হাতে অজস্র শুশ্রূষা, কথায় সৌজন্য। মেয়েটি বেশ। এর নামে অনেক কলঙ্ক-কথনই দিগ্বিদিকে প্রচলিত ছিলো, বাপের বাড়ির দরজা তার বন্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কি তেজ থাক্‌লে চক্ষুর দৃষ্টি এমন গভীর ও স্নেহার্দ্র হ'তে পারে মা যেন তা এক নিমেষে বুঝে ফেললেন। মেয়েটা হয় ত' অবাধ্য, কিন্তু এমন মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে বাপ তাঁর মুখে ভাত তুলছেন কিসের ক্ষুধায়? সব কথা তাঁর জান্‌তে হ'বে।

মা'র ঘরের কাজে অশ্রু তার হাত বাড়ালো। তরকারি কুটলো, ঘর ঝাঁট দিলো, কাপড় কুঁচোলো, দেয়ালের ঝুল্ সাফ্ করলো। এ যেন তার নিজের বাড়ি। মেথ্‌রানি উঠোন সাফ্ করতে এলে নিজ হাতে জল ঢাল্‌লো, বাল্‌তি-ভরা জলে চায়ের বাসন ডুবিয়ে নিজে ধুতে বস্‌লো, নীচেকার পেরেক-অভাবে দেওয়ালে যে দেবদেবীর ফটোগুলির ফাঁসি হচ্ছিলো সেগুলিকে প্রকৃতিস্থ করলো। বল্‌লো—আমি আজ রাঁধবো, মা। নতুন যুগের ধুয়ো উঠেছে যে মিউনিসিপ্যালিটি বেঁধে বাড়ি-বাড়ি ভাত-তরকারি বিলি ক'রে বেড়াবে—বাঙ্‌লা দেশে আমার-তোমার মতো মেয়ে থাক্‌তে তা আমারা হ'তে দেব না। আমরা পাঁচ আঙুলে পঞ্চ ব্যঞ্জন তৈরি করে' পাঁচজনকে তৃপ্ত করবো বলে'ই মেয়েমানুষের জন্ম নিয়েছি, মা। বলে' অশ্রু হাস্‌লো।

মা বললেন—আমিই পারবো মা, তুমি যে অতিথি।

—মা'র ঘরে মেয়ে অতিথি হ'য়ে আসে না, মা। পাঁজির যে-তিথিতেই আসুক, সে মেয়ে। উনুন ধরানো আছে, আমি ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিই। প্রভাত ততক্ষণ বাজার করে' ফিরুন। তুমি আমিষ ঘেঁটে চান্ ক'রে আবার গিয়ে নিজের উনুন ধরাবে, সে হ'বে না—আজকে থেকে তোমার ছুটি।

—রোজই ত' আমার সেই পালা।

—এবার থেকে রোজই তুমি মাছের রান্নাঘর থেকে পালাবে।

—কিন্তু আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও।

—খেয়ে নেবো বৈ কি। খাওয়া-সম্পর্কেও আমি লেডি হ'তে পারলাম না। তবে চায়ের কেৎলিটাই আগে চাপাই। ততক্ষণে প্রভাত নিশ্চয়ই ফির্‌বেন। কি বলো?

—এই ত' বাজার। দু' মিনিটে এসে যাবে।

দশ মিনিটে প্রভাত ফিরলো। প্রতিদিনকার মতো নিজ হাতে বাজার করে' নয়, মুটের মাথায় করে' বাজারের বহর দেখে অশ্রুর চক্ষু স্থির : তুমি এ করেছো কী? মাংস? মুড়ো? এক হাঁড়ি রসগোল্লা? ছি ছি! করেছো কী? তুমি যে দেখ্‌ছি বড্ড সেকেলে। ভেবেছিলাম আজ শুধু খাবো শুক্‌তো, শাকভাজা। ভাইটামিন্।

মাকে অশ্রু ঘেঁস্‌তেই দেবে না: এ-ঘরের এলেকা থেকে তোমার নির্বাসন। নুন আর ঝালের একটু এদিক-ওদিক হ'লে দ্রৌপদী আব আত্মহত্যা কর্‌বেন না। সব আমি নিজের হাতে কর্‌বো। মাছের মুণ্ডচ্ছেদ করবো, ছাগশিশুকে টুক্‌রো টুক্‌রো। ওদের পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তপ্তকটাহে ওদের ভর্জন কর্‌বো।

প্রভাত বল্‌লো: আর আমি?

—তোমাকে বয়কট্।

অশ্রু তার করতলে এই ক্ষুদ্রায়তন সংসারটিকে কেড়ে নিয়েছে। সে এমন একটা চঞ্চললাবণ্যনির্ঝর। পদে পদে তাব ব্যস্ততা, কথায় কথায় কোলাহল। ভিজে খোঁপাটাও এঁটে থাকে না, আঁচলটাও অবাধ্য।

হলুদ বার করে' দাও নি ত' মা? ফোড়ন কৈ? মাছ কিছু সাঁৎলে রাখ্‌বো নাকি? নাটু মাংস খায় না? আর আমিই এমন কী violent! প্রসাদং কণিকামাত্রং। আতিথ্যও তাই শাকান্নে। কত দিনে যে দেশ সভ্য হবে। মাগো, খাওয়াটা কি নোংরা! এর চেয়ে ইউলিসিসএর লোটাস্‌-ল্যাণ্ডএ গিয়ে ঘুমুলে হ'ত ভালো। পোষাক আর খাওয়া নিয়ে এ দেশের রীতিনীতিগুলো এত স্থূল কেন? চরিত্র সম্বন্ধে যেমন বাঁধা গৎ, এদের সম্বন্ধেও তাই। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক-একটা আলাদা weather।' এই যাঃ! কিছু হয় নি মা, মাংসের

ঢাকাটা পড়ে' গেল। না না, হাত-পা পোড়াবো কি? প্রেমও সেই weather। বসন্তের পরেই বর্ষা—বর্ষার পরেই আবার সেই জলহারা মেঘ। ঘি কোথায় মা? ছোট এলাচ?

অশ্রু ঘেমে উঠেছে।

ছোট উঠোন, কলতলার আঙিনাটি ছোট, একটা পাথরের ঢিবি খুঁড়ে ছোট একটি গহ্বরে তুলসীর অঙ্কুর। নোনা-ধরা দেয়ালে দুধয়ালার খড়ি-কাটা হিসেব, একধারে মার হাতে ঘুঁটে দে'য়া। গলির মধ্যে বাড়ি—তবু আশ্রমোপবন। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরে তাকাও—সংকীর্ণ এক টুকরো আকাশ, চোখে অত অল্প বলে'ই কল্পনায় সত্যি ক'রে অসীম। 'চোখ বড়ো করলেই আর বড়ো করে' দেখা হয় না।'

—তোমার হ'ল মা? আমার ত' প্রায় সারা। আর শুধু এই চাটনিটা। এবার স্নান করতে যেতে পার হে পেটুকরাম। নাটু, স্নান করেছ?

—করেছি, বৌদি।

—বৌদি কি রে? অশ্রু খিলখিল্ করে' হেসে উঠ্‌লো।

হঠাৎ এক সময় অন্তরালে প্রভাতকে অশ্রু জিগ্‌গেস করলে—তুমি বুঝি নাটুকে শিখিয়ে দিয়েছ?

প্রভাত অবাক: কি? কখন?

—আমাকে বৌদি বলে' ডাকতে?

—না ত'। মা বলেছেন হয় ত'।

—মা?

অশ্রু রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে চাটনি ঘন করতে বস্‌লো।

প্রভাত বল্‌লো: জিনিসপত্রগুলি এখানে গুছিয়ে রাখ আগে। পরে তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে' যাও। তুল্‌বো আর খাবো।

মা'ও সায় দিলেন : বারোটা বেজে গেছে। তুমিও বসে' পড়, অশ্রু।

অশ্রুর তাতে আপত্তি আছে : দু' ভাইকে আগে খাওয়াই। পরে আমার পালা। আবার যখন তোমার মত দায়িত্ব হ'বে মা, তখন সব্বাইব শেষে।

এক টুক্‌রো মাংস মুখে দিয়ে প্রভাত বললে—অতিশয়োক্তি ধরো না, অশ্রু। সত্যিই বল্‌ছি সুপার্ব্‌।

অশ্রু বললে—আমাকে তুমি তেমনি বোকা মেয়ে ঠাওরেছ নাকি যে পরের মুখেব ঝাল খেয়ে আমি রসাস্বাদ কববো? আগে নিজে না গিল্‌লে কোনো গাল্‌ই গ্রাহ্য কব্‌বো না। আরো একটু দেব নাকি?

—ভালো হযেছে বলে'ই বেশি খেতে হ'বে নাকি। খালি গুণ কর্‌লেই গুণবৃদ্ধি হয় না। পরিমাণ একটা প্রমাণই নয়।

—তাই নাকি? তবে আমিও এই সঙ্গে বসে' যাচ্ছি, মা।

দেযালে পিঠ রেখে মা তৃপ্ত চোখে এদেব খাওয়া দেখতে লাগলেন।

কী সুন্দর ঘন চুল! খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়ে' কাঁধ বেয়ে বাহুর কাছে নেমে এসেছে। বাহু দু'টিও নিটোল, লীলাবলয়িত! বসবার ভঙ্গিটিতে রুক্ষতা নেই। খাবার গ্রাসগুলি পরিমিত, হাতের আঙুলগুলি কৃশাগ্র, পায়ের পাতা দু'টি পদ্মপাতা। এর চোখে মুখে আসনে ভাষণে হাস্যে লাস্যে কোথাও এতটুকু বেসুরো লাগে না। যেন ঝর্ণার জল, সমীরমর্মর! এর প্রতি মা নিরাসক্ত থাকেন কি করে'?

নিন্দুকের মুখে ছাই পড়ুক, এর হাতে মা সোনার শাঁখা দেবেন। প্রভাত যদি একে পেয়ে কৃতার্থ হয় তবে কী হবে তাঁর অর্থে, কী হবে তাঁর কুলগরিমায়? প্রভাতের সুখের বিনিময়ে মা'র কাছে কোনো কবির কোনো স্বর্গই বিকোবে না। অবিশ্যি পুত্রবধূরূপে যে-রকম মেয়ের চেহারা ও গুণপনা নিয়ে তিনি কল্পনা-বিলাস করতেন তাব সঙ্গে অশ্রুর নখাগ্র পর্যন্ত অমিল: সে-মেয়ে হবে রূপে আলোকলতা, গুণে লজ্জাবতী। রূপে পৌর্ণমাসী, স্বভাবে ভোরবেলাকার নদী-কিনারের জলটুকুর মতো টল্‌টলে। তার মাঝে শ্যামল গ্রাম্যতা, প্রখর প্রগল্‌ভতা নয়। গিল্‌টি নয়, সোনা। কিন্তু সোনারই বা যাচাই হয় কিসে? আগুনে পুড়ে' খাদ বেরতে কতক্ষণ? তার চেয়ে এই ভালো, ছেলে তাঁর কল্পনার আয়তনের সঙ্গে প্রাপ্তির সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলেই সোনায় সোহাগা।

তবু কোথায় যেন বাধে। বয়সে হয় ত'। এই নৈকট্যটাই মা'র চোখে কটু লাগে। কেমন-যেন তার মাঝে একটা লালসার অসহিষ্ণুতা আছে, যেন একটা বিসদৃশ বিলাস। দু'টো বয়সের মধ্যেই প্রতীক্ষার আর অবসর নেই, একটা প্রখর উন্মুখতা। সেইটেই যেন বড় বেশি স্পষ্ট; এবং এত বেশি স্পষ্ট বলে' যেন সে-ব্যাকুলতায় সৌরভ নেই, আছে একটা রূঢ় স্বাদ—আনন্দ নয়, আহ্লাদ। কিন্তু এ কি মা'র গোঁড়ামি নয়? মা'র সংজ্ঞানুযায়ী প্রভাতের যোগ্য বধূ করতে চেয়ে

বিধাতা ত' অনায়াসেই অশ্রুকে তিন-চার বৎসর পিছিয়ে রাখ্‌তে পারতেন--বয়স বেশি হওয়া ত' অশ্রুর একটা স্বেচ্ছাকৃত ফ্যাশান্ নয়। যদি বলো, সে একটা দুরতিক্রম্য দুর্ঘটনা মাত্র। কিশোরী অশ্রুকেই ত' এক কালে বয়ঃস্থা হ'তে হয়েছে। তাই বিবাহের অনতিকাল পরেই যদি অশ্রু সন্তানবতী হয় তার মধ্যে রূঢ়তা কোথায়? এটুকু উদার না হলে চল্‌বে কেন?

মেয়েটি যা হোক্ পছন্দের। কাজ-কর্মে চতুর, কথায়-বার্তায় চটুল—কিন্তু এ-চটুলতায় বিভ্রম নেই, বেশ সহজ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত। আধুনিক মেয়ের কৃত্রিমতাই তার কুশ্রিতা। হাড়ের তলায় কোথায় যে তার হৃদয়, সার্জারি করে' তার সন্ধান মেলে না। এক বাণ্ডিল হাড় আর এক প্যাকেট্ মুর্শিদাবাদ সিল্ক্‌, এই ত' আধুনিক শিক্ষিত মেয়ের রূপ। অশ্রুকে কাছে পেয়ে তিনি চশ্‌মার কাঁচ বদ্‌লাবেন। হয় ত' তা নয়। কেটি মিত্তিরের নিকেল্-করা গালের ওপর দিয়েও হয় ত' চোখের জলের ধারা নামে। হয় ত' পুঁথি-কেতাব মুখস্থ করবার ফাঁকে-ফাঁকে কদাচিৎ তারা নিজের মনটাকে বহর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে না রেখে আপনার কাছেই অজ্ঞাতে গভীর ও আন্তরিক হ'য়ে ওঠে। ভণ্ডামির খোলস খসে' গিয়ে হয় ত' কখনো কখনো তারা নিজের দারিদ্র্য ধরে' ফেলে। সেই দারিদ্র্যই তাদের পূর্ণতা, সেই আত্মোৎসর্গ তাদেরই আত্মার স্বর্গ।

মা, অশ্রু তাঁর ভুল ভাঙ্‌লো। সেবায় গৃহসজ্জায় কর্মনৈপুণ্যে বিনয় বাক্যে নম্রশ্রীতে সে মা'র চোখে একটা অপরূপ বিস্ময়! বয়েস তার বেশি, আচরণে সে বিদ্রোহিনী, স্বাধীনকর্ত্রী, গৃহসংসারের বন্ধনচ্যুতা—এ-সব নিতান্তই খুঁটিনাটি ত্রুটি। বড়ো পরিচয় প্রভাতকে সে ভালোবাসে। মা হ'য়ে তিনি যদি তা না বোঝেন তবে আকাশের সূর্য

অস্তাচলে যাক্। বচনে তার প্রকাশ হয় না, না বা ব্যবহারে—কথার নেপথ্যে যেটুকু স্তব্ধতা, ব্যবহারের অন্তরালে যেটুকু রুদ্ধ ব্যাকুলতা সেইটুকুতেই তার পরিচয়। কোথা দিয়ে কি কথা উঠ্‌বে মা তাতে কান দেবেন না। সংসারে সমাজে কোথাও যদি কিছু সংঘর্ষ ঘটে, তবে তার দায়িত্ব তাদেরই, যাদের সংস্পর্শে এই সংঘর্ষের স্থরু হ'ল। মিলন যদি তাদের, মীমাংসাও তাদেরই। প্রেম যদি এটুকু পরীক্ষা না সয়, তবে তার আগুন খালি দগ্ধই করবে, শুচি করবে না। না, মা'র এই খুঁৎখুঁতে স্বভাবের জন্যে দায়ী তাঁর চিরাচরিত প্রথা, বাঁধা-ধরা সংস্কার। যা সংস্কৃত হবে না তা আবার সংস্কার কি করে'? যা সহ্য করে না তার মধ্যে সত্য কই?

অশ্রুর ব্যবহারে ও স্বভাবে একটা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আছে। কথায় এমন একটা দৃঢ়োপলব্ধির তেজ আছে যে, তার কাছে সমস্ত প্রতিবাদ যেন একটা খেলো বিবাদের মত শোনায়। সমস্ত বিশ্বাসের মূল নড়ে' ওঠে। অথচ এমন সহজ, এমন নিষ্ঠুর। এই নির্দয়তাই তার সততা। এমন ঔজ্জ্বল্য যার চরিত্রে, তাকে মন্দ বল্‌তে নিজেরই মা'র সন্দেহ হয়।

ঘর-দোর্ দেয়াল-মেঝে ছাত-উঠোন সমস্ত অশ্রু ফিট্‌ফাট্ করে' ফেল্‌লো। বারণ করো, মান্‌বে না, অথচ তার এ অতি-অন্তরঙ্গতায় কোথাযো যেন সামান্য কৃত্রিমতা নেই। এখন বিকেল হ'য়ে আস্‌ছে, ছাতের ওপর নাটুকে নিয়ে অশ্রু কথার খেলা করছে। ধামার ভেতর ঘুঁটে গুনে রাখ্‌তে রাখ্‌তে মা তাই শুন্‌ছেন:

—মাথার ওপরে আকাশ, তাতে তারা ফুট্‌ছে। তারা কি রকম বলো না?

অশ্রু নাটুর আঙুল তুলে নিজের চোখ স্পর্শ করালো: এই রকম।

নাটু বল্‌লো : আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি। চাঁদ উঠ্‌বে না আজ?

—আরেকটু রাত হ'লে উঠ্‌বে।

—চাঁদ? কি রকম বলো না?

অশ্রু অধর স্পর্শ করালো : এমনি তুক্‌তুকে, বাঁকা, হাসি-হাসি। তুমি একবার হাসো, সেই ত' আকাশের চাঁদ।

নাটু হাসতেই অশ্রু তাকে জড়িয়ে ধরলো : মেঘ দেখবে নাটু?

নাটু দু'হাতে অশ্রুর কতগুলি চুল তুলে বললে—ঠিক বুঝতে পারছি, বৌদি। এমনি ঘন, এমনি নরম, না?

—এমনি ঘন, এমনি নরম—আকাশময় ছড়িয়ে থাকে। তারপর বৃষ্টি।

—হ্যাঁ, মা যেমন শিয়রে বসে' আমার কপালের ওপব চোখের জল ফেলেন না? আচ্ছা বৌদি—

অশ্রু বাধা দিলো : বৌদি নয় নাটু। খালি দিদি।

—না, না, বৌদি। মা বললেন তুমি আমার বৌদি এসেছ। চাঁপা ফুলের মতো গায়েব রঙ, তাবার মতো চোখ চিক্‌চিক্ কবছে, মেঘেব মতো নরম চুল। আমি তোমাকে পেয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। চাঁপা ফুল, তারা, মেঘ, তাজমহল, ইডেন্‌গার্ডেন, মনুমেণ্ট, চৌরঙ্গি—সমস্ত। তুমি আমার বৌদি না হ'য়েই পাবো না। দিদি আমাব একজন আছেন, তিনি থাকেন সি, পি,-তে, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন না।

—আমি তোমার দিদি হ'য়েই থেকে যাবো, নাটু।

—বা, তা কি হয়? তোমার সঙ্গে দাদার বিয়ে হ'বে, সানাই বাজবে, চাট্‌নি মেখে পাঁপর খাবো, নতুন জামা পর্‌বো—আমাকে তোমার বিয়েতে কি দেবে শুনি? বাঃ, আমাকে আবার কি দেবে? আমিই ত' তোমাকে দেব। আচ্ছা, আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা,—

তার চেয়ে লুকিয়ে তোমাকে দাদার সেই ওয়াটারপ্রুফ্‌টা এনে দেবো, বৌদি, বুঝ্‌লে?

—আর দিদি হ'লে বুঝি কিছু দেবে না?

—তা হ'লে কম দেবো,—জমানো ডাক-টিকিট্‌গুলো। ভুল হয় নি একটুও—হল্যাণ্ডের পর্যন্ত টিকিট্‌ আছে। দাদা সব বেছে দিয়েছেন। ভুল হ'লে দাদাই কান-মলা খাবেন। আমার কি, আমি ত' দেখ্‌তেই পাই না।

—তবে তোমার ডাক-টিকিট্‌গুলিই নেব, নাটু।

—তার মধ্যে গোটা তিরিশ ও-বাড়ির বিশুটি চুরি করে' নিয়েছে। তুমি যদি পারো ওর থেকে আদায় করে' নিয়ো, বৌদি।

অশ্রু হেসে বল্‌লে—বা, আমি যে তোমার দিদি হ'য়ে গেলাম।

—ছাই, ডাক-টিকিট্‌গুলি ছাই। তার চেয়ে দাদার ওয়াটার প্রুফ্‌টা ঢের বেশি টেঁকসই। আমি কতো দিন বৃষ্টির সময় সেটা গায়ে দিয়ে উঠোনে গিযে দাঁড়িয়েছি। সে যে কী মজা, তুমি তা ভাবতেই পারো না। বুঝলে, বাইরেটা সব ভিজে যাচ্ছে, ভেতরের জামা কাপড় যেমনি ঠিক তেমনি। তুমি দেখ নি? তোমার নেই ত'? তুমি কাউকে কিছু বোল না, আমি ঠিক তোমাকে এনে দেবো দেখো। ঘর-দোর সব আমার মুখস্থ। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি নামে, তুমি ওটা পরে' উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ো,—সে যে কী মজা—দেখো দাদাকে যেন বলে' দিয়ো না।

—কিন্তু ডাক-টিকিটেই যে ভালো ছিল—কতো রাজার কতো রকম মুখের ছাপ। কেউ হাঁদা, কেউ উটের মতো, কেউ বা একটা বড়-বেড়াল।

মুখ ম্লান করে' নিচের ঠোঁট উল্‌টিয়ে নাটু বললে—সে-সব আমি কবে ছিঁড়ে ফেলেছি। বেশ, মাকে গিয়ে জিগগেস করো না। আমার

বাক্সে ত' আর চাবি নেই, বেশ, নিজেই দেখে এসো না। উঁটও চিনি না, প্যাঁচাও চিনি না।

মা বললেন—নিচে এসো অশ্রু, চুল বেঁধে দি।

তবু কথাটা মা সোজাসুজি পাড়তে পারলেন না। বললেন—বাপের বাড়ি যাবে না একবার ?

স্পষ্ট করে' অশ্রু উত্তর দিলো : না।

—সে কি মা ? তিনি তোমার বাবা—

—হোন্। যিনি আমাকে বহিষ্কৃত করে' দিয়েছেন পা স্পর্শ করে' তাঁকে অপমানিত করতে চাইনে।

—কিন্তু তুমিই ত' সেদিন নিজে ইচ্ছে করে' বেরিয়ে এসেছিলে।

—ভাগ্যিস্ বেরিয়ে এসেছিলাম, মা। নইলে এতদিনে হয় ত' সমস্ত প্রেরণার সঙ্গে আত্মপ্রসারের প্রেরণাও খুইয়ে ফেল্‌তাম। আমার সে গভীর সত্যসন্ধানের চেষ্টাকে বাবা-কাকারা মর্যাদা দেবেন আশা করিনি, কিন্তু তাঁদের নীতিসংহিতা অনুসারে অন্যায় যদি একবার করেইছিলাম তবে এককণা ক্ষমাও আমি পাবো না—অতটা হীন আমি নই, মা।

মা কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন—শুনেছি তোমার পরের আচরণগুলিও তাঁদের মনঃপূত হয় নি, চিরকালই তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

হেসে স্বচ্ছ স্বরে অশ্রু বললে—বিরুদ্ধাচরণ সব-সময়েই প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু করতে হয়। বাবার কথা শুন্‌তাম, বিবেকের বিদ্রোহী হ'তে হ'ত। সব জিনিসই সব মানুষের সয় না, মা। বিকেলে স্নান করলে অনেকের হয় সর্দি, কারুর কারুর দাঁড়ায় নিমোনিয়া। কিন্তু বিকেলে স্নান না করলে আমার হয় না হজম। আমাদের বিলু রোজ একটা পর্যন্ত রাত জাগে ষ্ট্রিক্‌নিন না খেয়ে, ঘড়িতে দশটা বাজলেই

আমাকে কে মরফিয়া খাওয়ায়। মাদ্রাজি মেয়েরা দেয় কাছা, ছেলেরা পরে লুঙ্গি। যার যেমন ধাত, তেমনি তার ধুতি।

—কিন্তু বাবার বাড়ি তুমি যাবেই না?

—সে-বড়াই দেবী-আদি-দেবী পার্বতীরো শোভা পায় না। যেতে আমি যে-মুহূর্তে পারি, তবে সসম্মানে, হাঁটু আমি দুমড়াতে পারবো না। যাকে সত্য বলে' করায়ত্ত করেছি, করজোড় করতে গেলেই তা সংকুচিত হ'য়ে আসবে। বাড়িতে আমার দু'টি আকর্ষণ ছিলো—মা আর তিনু। আমার মৃতবৎসা মায়ের আমরাই দুটি সন্তান সশরীরে আঁতুড় ঘর ছেড়ে গৃহবাসের যোগ্য হয়েছিলাম—আর সবাইর আঁট-কড়ায়েই দম আটকেছে। সন্তানের ঋণ শোধ করতে মা ফতুর হ'লেন—দল বেঁধে এলো কাকিমারা। তোমাদের গ্রাম্যগৃহস্থকন্যার আদর্শ-রূপিনীরা। তিনু গেল জলের ওপরে, আর আমি জলে। বাবার বাড়ি কি করতেই বা যাবো? শুন্‌ছি বাবা নাকি কোন্‌ সন্ন্যাসীর চেলা হ'য়ে দেশপর্যটন করছেন। কাকারা এক-একটি কাক। রক্ষে করো, মা।

মা বিনুনিতে ফাঁস দিতে দিতে শুধোলেন: তুমি তা হ'লে এখন কি করবে?

অশ্রুর উত্তর ভাবতে হয় না: যা করছিলাম। মাস্টারি। কাজের মধ্যে দুই—হাই-তোলা আর পরীক্ষার কাগজ-দেখা। তবে মাস্টারিতেও কায়েমি আমার কাহিল্‌ হ'তে চলেছে। কি করবো, কিছু কি ঠিক বলা যায়, মা? তুমিই বলো না, কি করা যায়?

এইবার অনায়াসে কথাটা মা পাড়্‌তে পারতেন, কিন্তু প্রভাত বেরোবার পোযাক পরে' এসে বললে—তোমার যে এখন চুলই বাঁধা হয় নি। যাই বলো, মেয়েরা যতোই কেন না দম্ভ করুক, বেশবিন্যাস-ব্যাপারে তারা চিরটা কাল পুরুষের থেকে পিছিয়ে থাকবে। তবু

মেয়েদের কতো কম ঝক্কি। একটা পেটিকোট্, আর দুটো-তিনটে সেফ্‌টিপিনএর ত' ব্যাপার। পুরুষের কত মাল-মশলা। হাতে ঘড়ি বাঁধা, মনিব্যাগে পয়সা নেওয়া, রুমালটা সাফ্ আছে কি না, দেশলাইটা কোথায় ফেল্‌লো—কতো তার হিসেব, কতো তার ফ্যাসাদ। বলি, বেরোবে না ?

অশ্রু হেসে বল্‌লো—পাগল ! এমন মাকে ছেড়ে কোথায় বেরোব ?

প্রভাত একাই বেড়াতে বেরোল। অশ্রু বললে—আমি যদি এখানে কয়েক দিন থাকি, আমাকে তাড়িয়ে দেবে না ত' মা ? আমাকে সবাই যতো খারাপ ভাবে আমি তত খারাপ সত্যিই হয় ত' নই। দেবে না মা থাক্‌তে ?

—নিশ্চয়, এখানেই থাক্‌বে বৈ কি। এখানে যদি তোমার আশ্রয় না হয় তা হ'লে সে যে তোমার বড় দুর্যোগ, মা। কয়েক দিন কেন—আমরণ, অশ্রু।

ইঙ্গিতটা এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট হ'বে। অশ্রু উঠ্‌লো শিউরে। কিন্তু মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি কোনো কথা এলো না। চুল বাঁধা সাঙ্গ ক'রে উঠে দাঁড়াতেই তার মনে হ'ল এ-সংসারের সমস্ত মাধুর্য যেন নিঃশেষে শুষে গেছে। এখন বেরিয়ে পড়লেই ত' চুকে যায়। কিন্তু বেরিয়ে পড়ার মধ্যেই বীরত্ব নেই। ছাতের রেলিঙ ধরে' দাঁড়িয়ে অশ্রু মোটর গাড়ির নম্বর দেখতে লাগলো। কিন্তু দৃশ্য জগতের বাইরে মন আবার কখন অন্ধকারে ডুব মাবে, সেখানে অপরিচয়ের পরিধিহীন সমুদ্র তাকে ডাক পাঠিয়েছে ! কোথায় এবার সে যাবে, জীবনে আবার তার ফেরবার আশ্রয় কোথায় ? সে কি শুধু মৃত্যু ? এই প্রাণ-স্বাদের অভিযানে কি কোনো গভীরতম তৃপ্তিতে তার কামনার সমাধি হ'বে না ?

সন্ধ্যা হ'তেই প্রভাত ফিরেছে। দুপুরেই তার ঘর অশ্রু গুছিয়ে রেখেছিলো। দরজা খুলতেই চোখে লাগ্‌লো ধাঁধা। আলো জ্বালা হয় নি—তার বিছানার ওপব অশ্রু শুয়ে। প্রভাতকে ঢুক্‌তে দেখেও অশ্রু উঠে বস্‌লো না, মলিন মেঘজ্যোতির মত বিছানার সঙ্গেই মিশে রইলো। প্রভাত ক্যাণ্ডাল্‌টা জ্বালালো। বল্‌লো : শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

অশ্রু শুয়ে শুয়েই বল্‌লো : মা কিছুতেই রাত্রে রাঁধতে দিলেন না। হাতে আর কোনো কাজ নেই—তুমি কখন ফেবো তাই শুয়ে আছি। তোমার নতুন উপন্যাসের কিছুটা পড়ে' শোনাও, তাই খানিক শুনি না-হয়।

কথাব সুবে কেমন-যেন একটা করুণ ক্লান্তিব আভাস। প্রভাত বিস্মিত হ'ল। তাড়াতাড়ি তার গা ঘেঁষে বসে' বল্‌লো : নিশ্চয়ই তোমার মন ভালো নেই, কি হয়েছে আমায় বলো।

অশ্রু উঠে বসে' বললো : তুমি পাগল হয়েছ। মন আমার কাছে ব্যাধি নয় যে তার দ্বাবা আক্রান্ত হ'ব। আছি আমি ভালোই, কিন্তু এর পব কি কবা যায় তাই ভাবছি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করলো : কিসের পব?

—এলাহাবাদ থেকে কলকাতা আসার পর।

—এলাহাবাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে?

—একটু একটু—নির্মলের জন্য।

প্রভাত বললো : তা আব আশ্চর্য কি?

—আশ্চর্য নিশ্চয়ই। মানুষ যে-আদর্শই ধরুক তার অপ্রাপ্তি ঘটে বসে'ই তার ট্র্যাজিডি নয়। সে-আদর্শকে সে আঁকড়েই থাকবে এইটেই তার অধঃপতন। আদর্শকে বড়ো রাখতে গিয়ে নিজেকে ছোট করার মতো অবনতি আর কি হ'তে পারে?

প্রভাত বিছানার ওপর সরে' বস্‌লো : কথাটা খোলসা করে' বলো।

—নির্মল বিবাহকে জীবন-যৌবনের পরমৈশ্বর্য বলে' ধরে' নিয়েছিলো ; ইন্দিরাকে আন্তরিকতা দিলো, কিন্তু অন্তর দিতে পার্‌লো না। সেইটেই তার খর্বতা। আদর্শকে ছোট রেখে নিজেকে মহীয়ান্ করা ভালো, নিজেকে কালো করে' আদর্শকে অদৃশ্য রাখাটা বাহবার নয়। ইন্দিরাকে সে বিয়ে করেছে—এইখানেই তার কর্তব্যের শেষ, পরিশিষ্ট যেটুকু তার আছে তা নিতান্ত স্থূল। প্রেমহীন দেহভোগ আর গণিকাবৃত্তিতে তফাৎ কোথায়। তাই আগাগোড়া মনে হয় এমন সতীত্ব একটা শস্তা জলুস্ মাত্র, মন সায় দেয় না।

—কিন্তু ইন্দিরা ?

—তার কথা সবিস্তারে বলে' তোমার নারীজাতির প্রতি ফ্যাশানেব্‌ল্ বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেব না। ইন্দিরাকে আমি ক্ষমা করি, তাকে বিচার করবার সহজ মানদণ্ড পাই। সে ব্যক্তিত্বের চেয়ে সমাজকে বড়ো করে' দেখে, বেগের উচ্ছৃঙ্খলতার চেয়ে জড়তার অবসাদ,—বিস্তারের চেয়ে সংকীর্ণতা, চাঞ্চল্যের চেয়ে সামঞ্জস্য! তাকে অনায়াসে বোঝা যায়, শ্রদ্ধাও করা যায়। রমাপতির প্রতি—

প্রভাত বাধা দিয়ে বল্‌লে—তোমার এ-সমস্ত স্বগতোক্তির কোনো মানেই আমি বুঝতে পার্‌বো না যতক্ষণ না তুমি বুঝিয়ে বলো ইন্দিরার সঙ্গে রমাপতির সম্পর্কটার মধ্যে শব্দগত কোনো অর্থানুকূল্য আছে কি না।

একটু হেসে সংক্ষেপে অশ্রু কুশীলববর্ণনা সেরে নিলো।

—রমাপতির প্রতি ইন্দিরার প্রেমের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য না হোক্, প্রবলতা আছে। এবং এই প্রবলতাই তাকে হয় ত' একদিন পবিত্র করে' তুল্‌তো। কিন্তু নির্মলের ঔদাসীন্য ও নিস্তেজতাই এর বাধা। তবু তার প্রেমের সীমা নেই। প্রেম পাওয়াটা দেব-দুর্লভ, কিন্তু পেয়ে গেলে অতি

শস্তা, অতি বাজে—তার পাওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই মহত্ব। নির্মল যদি নিরুত্তর না থাকৃত, যদি তার কামনায় থাকৃত কবিত্ব, প্রয়োজনসাধনে থাকতো প্রযোজনার প্রসাধন, তা হ'লে ইন্দিরার জীবন শকুন্তলারই মতো হয় ত' সার্থক হ'ত। কিন্তু এ-বিষয়ে নির্মলের নির্মমতার মার্জনা নেই। আমাদের দেশের বিয়েতে এ-বিষয়ে বরবধূর একটা অত্যুগ্র অসহিষ্ণুতা থাকে। স্বভাবে মেয়েরা নিষ্ক্রিয় বলে' দোষটা বেশির ভাগ পুরুষেরই। পাওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়ে চাওয়াটাকে আর ধন্য করবার জন্য দেরি করে না। নির্মল সেই ভুলই করেছিলো, ভেবেছিলো সেই ভুলই তার সংসার-সমুদ্রের ভেলা। ইন্দিরাকে সে হয় ত' চাইতোও, কিন্তু ইন্দিরা অন্যার্থে রমা, ও তার দক্ষিণ দিকে একটি পতি থেকেই তাকে পতিত করেছে। সেই ট্র্যাজিডিটা ইন্দিরার যতো না তত নির্মলের। এর যে কোথায় গিয়ে সমাধান হ'বে সে-চিন্তা আমাকে দোলা দিয়েছে। তা ছাড়া নির্মলের মাঝে সহনশীলতাই আছে, উদারতা নেই। যে-যুগে আঠারো বছর আগে মেয়ের বিয়ে হয় না, তার জীবনে সামান্যতম দুর্ঘটনাটিও ঘটবে না, মাটির নিচে পচে' পচে' সে খালি স্বামীর ভোগেই ওল্ড্ ওয়াইন্ হবে—এমন একটা ক্ষমাহীন মনোভাব অসহ্য। ইন্দিরাকে মুক্তি না দিক্, শ্রদ্ধা দেওয়া উচিত ছিলো। যৌবনকে সে স্পন্দিত রেখেছে, কল্পনাকে সৃষ্টিশীল। চিরাচরণ যে একটা মহত্বই নয় এ-কথা আমরা বুঝ্বো কবে? সাময়িকতা, সংযম আর স্বাস্থ্যই হচ্ছে আমার মতে জীবনের মূল্যধারক। সংযমটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে'ই মহৎ, সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে'ই সুন্দর। কিন্তু ও-সব কথা যাক্; কি নিয়ে বইটা লিখ্ছ?

অশ্রুকে প্রভাত ধীরে স্পর্শ করলো, ঠিক কনুইয়ের কাছটিতে: ও-কথাও থাক্।

—না, তবু বলো! শুনতে আমার বেশ লাগবে। তুমি যে খালি কেরানি এ কথা ভাবলে আমার হাঁপ ধরে, তুমি সাহিত্যিক—আমি তাতে মুক্তি পাই, প্রভাত। মানুষের পরিচয় কি সে করে তাতে নয়, কি সে হয়। এবং হওয়ার মূলেই তার সৃষ্টিপ্রয়াস। যে নিজেকে সৃষ্টি করে না তাকে আমি মানুষ বলি না। সে-হিসেবে কেরানিও কবি হ'তে পারে বৈ কি।

—আমাদের দেশে কেরানির গুণ-নির্দেশ অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে আছে। কিন্তু কোনো বড়ো বিষয় নিয়েই তোমার সংগে আজ আর তর্কালোচনা করতে সাধ হচ্ছে না। আমরা দু'জনে মিলে এই যে মুহূর্ত ক'টি রচনা করেছি তার তুলনায় কোনো উপন্যাসই বাস্তব নয়, অশ্রু।

অশ্রুর কোনো সাড়া মিললো না দেখে প্রভাতকে সেই কথাই পাড়তে হ'ল: উপন্যাসটা পলিটিক্যাল্। কোনো cult নিয়ে নয়, আমাদের এতো বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। যৌবনারম্ভ থেকে বার্ধক্যোত্তীর্ণ নায়কের একটা ধারাবাহিক ভাব-বিবর্তন। মোটামুটি সেইটেই থীম্। যা লেখা হয়েছে তাতে চাখবার মত হয় নি। কিন্তু ভাবছি কথাগুলোকে অত্যন্ত পারস্পরিক ও ব্যক্তিগত করে' তুলি। কি বলো?

ঘন হ'য়ে সরে' এসে অশ্রু বললে—বলো।

প্রভাত প্রশ্ন করলো: ফিরতে তোমাকে এক দিন হ'তই—আমারই ঘরে, আমারই শয্যায়, নয় কি?

অল্প একটু হেসে অশ্রু বললে—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে ত' তাই মনে হ'বে। তুমি আমার কত বড়ো বন্ধু তা আমার হৃদয় যেমন জানে দেহকে তত জানতে দিতে চাইনে। ভয় করে। তবু মা আমার এখানে থাকবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছেন, নাটু আমাকে তোমার ওয়াটার্-প্রুফ

উপহার দিতে চাইছে, দিদি হ'লে খালি ডাক-টিকিটগুলি—তাও নাকি সব নেই, বিশুই সাবড়েছে। তোমাদের ঠিকে-ঝি পর্যন্ত বললো : এ বৌ আন্‌লে মা, কপালে সিঁদুর দাওনি? আমি ত' হেসেই খুন। মা বললেন : শিগগিরই হ'বে, লক্ষ্মী যখন এলেন তখন তাঁকে আমরা বেঁধে রাখলাম। নেপথ্য থেকে শুনে আমি হাসি।

প্রভাত বললে—সম্পর্ককে সহজ করে' না দেখালে সমাজের সায় মেলে না, ঐ ঠিকে-ঝিটি পর্যন্ত সমাজের প্রতিনিধি।

—তাই ত' দায়। ছুটির ক'টা দিন ত' আমার এখানেই কাটাতে হ'বে। হোটেলে বেশি দিন থাক্‌লে আমার মণি-ব্যাগটি পটল তুল্‌বেন। তোমার সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে আমার ভারি ভালো লাগবে—উষা থেকে সন্ধ্যা, আবার পরিপূর্ণ রাত্রি। রাত্রিটা অবিশ্যি মা'র বিছানায়।

—কিন্তু ছুটির ক'টা দিন মাত্র?

—ও হরি! তুমিও আমাকে কায়েমি করতে চাও নাকি?

প্রভাত অশ্রুর হাতের ওপর হাত বুলুতে বুলুতে বললো—যদি অমন হাল্‌কা করে' না বলো, ত' বলি, চাই অশ্রু।

খানিকক্ষণের জন্য অশ্রু স্তব্ধ হ'য়ে রইলো, বোধ হয় চোখের পাতাটিও নড়লো না। ধীরে গদ্‌গদগাম্ভীর্যে বললে—আমি একদিন বিবাহের সভা থেকে পালিয়ে এসে তোমারই দুয়ারে কড়া নেড়েছিলাম। তোমার দুই চোখ অশ্রুমথিত, দেহ অবসন্ন। সেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম হঠকারী বিদ্রোহিনীর বেশে, আজ এসেছি স্থিতধী তপস্বিনীর বেশে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে! সেদিন যে বেরিয়ে এসেছিলাম আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে মাত্র, তোমাকেই বিবাহ করতে নয়।

প্রভাত স্নিগ্ধ স্বরে বললো—সে আমি জান্‌তাম। কিন্তু সেদিনের বন্ধুতা কি নিভৃত নৈকট্যের জন্য তৃষিত হ'য়ে ওঠে নি?

—হয় ত' উঠেছে, কিন্তু স্থায়িত্বই কি প্রেমের বড়ো পরিচয়, তার প্রচুরতা কি কিছু নয়? তুমি কি মনে কর দু'টো দেহ একসঙ্গে বেঁধে দিলেই কি প্রাণ একত্র হ'ল? আনন্দ হ'ল সহজ?

—কিন্তু প্রাণ যখন একত্র হয়, তখন দেহের আর পার্থক্য কোথায়? দেহ সম্বন্ধে তোমার এত ভয় কিসের? পৃথিবীতে দেহের মতো ঐশ্বর্য আর কোথায় আছে—বিধাতার আদিম কীর্তিস্তম্ভ।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর দেহ প্রায় হেলালো। বললে—কবিতায় দেহ মন্দির, মানি, কিন্তু বিজ্ঞানে দেহ মিউজিয়ম্‌। দেহ সম্বন্ধে আমি নিদারুণ পৌত্তলিক। কিন্তু প্রয়োজনের নিয়মে একে বাঁধতে গেলেই এক রাতে সে এঁটো-কাঁটা ফেল্‌বার সামান্য একটা উঠোন, শ্যামলতাই যদি পৃথিবী হ'ত তা হ'লে মানুষ আর ভূমিকম্পের ভয়ে কম্পমান থাক্‌তো না। রঙ বা লাবণ্যটাই দেহেব সব নয়--ওটা পৃথিবীব শ্যামলতার সামিল। অন্তরালে এর কতো স্নায়ু কতো শিরা কতো প্রক্রিয়া কতো কারুকার্য। বিশ্বাসঘাতক দেহকে আমি ভীষণ ভয় করি। যখন সে বিশ্বাসঘাতক, তখনই সে ছন্দোহীন, কদর্য।

প্রভাত অশ্রুর হাত দিয়ে নিজের কণ্ঠ জড়ালো: সবই আমি বুঝি, অশ্রু। কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতা এমন প্রেমকে কি আমরা উপবাসী করে' রাখবো? তাইতেই কি সংসারের শ্রী ফিরবে?

অশ্রু বললে—উপবাসটা শক্তির পক্ষে মাদকদ্রব্য। তোমাকে Donne-এর এককথাই একটু বলি তা হ'লে। সেদিন কি-একটা বইয়ে তাঁর জীবনের একটা টুক্‌রো চোখে পড়েছিলো। বাপের অমতে ভালো-বেসে জেনে-শুনে তিনি বিয়ে করলেন। কাকার আপিসে কাজ

করতেন, এ বিদ্রোহাচরণের ফলে তাঁর চাকরিটি গেলো। শোনা গেলো বিয়েটা আইনে বাধে, তাই তাঁর হ'ল জেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দু'বচ্ছর রইলেন এক দূরসম্পর্কীয় ভাইয়ের গলগ্রহ হ'য়ে। দু' বছরে দু'টি সন্তান হ'ল। পরের বছরে আরেকটির সম্ভাবনা। স্ত্রী যখন প্রসববেদনায় মুহ্যমান, Donne তখন ঘরে বসে' কবিতা লিখ্‌ছেন: যদি এখন মরি, তোমার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই ভগবান, জন্মজন্মান্তরে যেন স্ত্রীর সঙ্গে আর দেখা না হয়। একটার পর একটা ছেলে হয়, আর মরে—Donne-এর কবর দেবার পর্যন্ত পয়সা নেই। তাঁর *Biathanatos* পড়েছ? তাতে তিনি আত্মহত্যার গুণগান করেছেন,—এই দেহ তাঁর বন্দীশালা, দরজার চাবি ত' তাঁরই হাতে। কিন্তু কবিতাই তাঁকে রক্ষা করেছিলো। বারোটি সন্তান প্রসব করে' Donne-এর স্ত্রী প্রসবযন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পেলেন, সাতটি সন্তান বেঁচে ছিলো, তাদের Donne প্রতিজ্ঞা করালেন কখনো যেন তারা বিয়ে না করে। ইতিহাসে অবিশ্যি তাদের কথা কিছু লেখা নেই। এখনো শেষ হয়নি সবটা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর Donne-এর জীবনে আরেকটি নারীর অভ্যুদয় হ'ল—Anne More. স্ত্রী হ'য়ে এলো না বলে'ই বাকি কয়েকটা দিন Donne কবিতা লিখ্‌তে পেরেছিলেন।

প্রভাত বললে—সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের একটা নিদারুণ উদাহরণ খাড়া করে' আমাদের কেউ শাসাতে এলে আমরা ব্যঙ্গ করবো। আমাদের ছন্দজ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আমাদের হাতের মুঠোয়।

—জানি, কিন্তু মূল ইঙ্গিতটা দু' শ' বছর পরেও ম্লান হয় নি। তা হ'লে তখন তুমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেরানিই হ'য়ে থাকবে, কবির আকাশ তখন উবে গেছে। আর তোমার এতো বছরের ভারতমুক্তিসাধনার ইতিহাস মুদির দোকানের হিসেব হ'য়ে উঠেছে।

উদর তখন একটি বড়ো সমস্যা। তুমি মাইনে পাও ষাট্, আমি এক শ' পঞ্চাশ—তাও জলপাইগুড়িতে। কল্‌কাতায় এলে আমার পঞ্চাশ টাকা জুটিয়ে নিতেও প্রাণান্ত হ'বে। যা সামান্য জমিয়েছিলাম তা ফুরিয়ে যাবে দু' নিশ্বাসে। টাকার সংস্থান না করে' কোনো ব্যবসাই উৎরোয না, বিয়েটা ত' পুরোপুরি একটা ব্যবসাই।

—কিন্তু খালি আরাম পেতে হবে এ তোমার একচোখোমি, অশ্রু।

—আরাম না পেলে অভিরাম থাকা যায় না, বন্ধু। দুঃখে-দুর্দিনে সমবেদনার গান বাজারে কাটে বটে, কিন্তু এদিকে সংসারে যে মাথা কাটা যায়, তা লুকোবে কি করে'? আরাম চাই বৈ কি। ও বিবাহ-hygienics-এর একটা মূল নীতি। তার চেয়ে আমি থাকি জলপাই-গুড়িতে, তুমি থাক কলকাতায় ছোট সংসারি নিয়ে—মা আর নাটু। আমার কাছে তোমার অবারিত নিমন্ত্রণ, তোমার কাছে আমার। মাঝখানের সমস্ত পথ উন্মুক্ত, সমস্ত আকাশ আশীর্বাদময়। তুমি যদি এতে মুখ ভার করো, তবে বুঝ্‌বো তুমি খালি আমাকেই চেয়েছিলে, অশ্রুকে চাওনি। যদি স্থায়িত্বের কথা তোল, বলি, আমিই এক দিন ফুরোব, অশ্রু অবিনাশী। তুমি চুপ করে' থেকো না, আমার খারাপ লাগে তাতে।

অশ্রুর মুখখানি প্রভাত নিজের মুখের কাছে সরিয়ে আন্‌লো। পরিপূর্ণ ওষ্ঠপুটে নিবিড় চুম্বন করতে করতে সে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল: "I cannot show my love except through carnal things."

কাটলো দু' মিনিট। অশ্রু নিজেকে সম্বৃত করে' বল্‌লো—বিয়ে করায় অনেক সদ্‌গুণ ও সুবিধে হয় ত' আছে, কিন্তু আমার-তোমার বেলায় তা আবর্জনা। আমাদের জীবনে তার মার্জনা নেই।

তোমাকে পেয়ে আমি একদিন নবাবিষ্কারের সমস্ত প্রেরণা খুইয়ে বসবো, আমার হাতে সে-অপমৃত্যু তুমি সয়ো না। কখন আবার আমাকে তোমার সুসমাপ্ত, নিঃশেষসুধা মনে হ'বে সে-দিনের অপমান সইতে আমি তিলে-তিলে নিজেকে ক্ষয় করে' ফেলবো না। কখন আমাদের সকল ফাঁকি ধরা পড়ে' যাবে। এই বেশ, এই ভালো। তুমি আর আমি। আমরা আছি, আমরা আছি—এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমাদের নেই।

অশ্রু প্রভাতের চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। হঠাৎ জামার তলা দিয়ে প্রভাতের গলার নীচে হাত রেখে বললে—তোমার মনে আরো বুঝি সন্দেহ আছে?

অশ্রুর চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে প্রভাত বললে—কিসের সন্দেহ? তোমার constancy-র—একচারিতার? আসা-যাওয়ার জন্যে দুয়ার যদি খুলেই না রাখি অশ্রু, তা হ'লে আমাদের প্রেমের আর গর্ব কি নিয়ে? যদি একদিন এলে, যেতে চাও তেমনি একদিন যাবে। দায়হীন বিদায়ের দিনে আবার তোমাকে নিমন্ত্রণ করে' রাখবো। স্বাধীনতায় যদি প্রেম স্থায়ী না হয়, তবে শ্মশানে বসে' তার কংকাল পুজোর অন্ধতাকে আমরা ক্ষমা করব কি করে'? সে-সন্দেহ আমার নেই, অশ্রু। তোমাকে যদি পাবার গর্ব করে' থাকি, হারবার গর্বও আমারই।

আবেশে অশ্রু প্রভাতের কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলোটি রোয়াক্ ডিঙিয়ে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে, আজকের রাতের সেই আলোটি চাঁদের আলোকে হার মানায়।

মশারির ধার গুঁজতে গুঁজতে মা বললেন—তোমার বাবাকে জানানো দরকার, না অশ্রু?

অশ্রু শুয়ে পড়েছে। পাশ ফিরে বললে—কিসের জন্য, মা?

কথাটা মা সরাসরি পাড়লেন না: যাই বলো সমাজের চোখে তিনিই ত' তোমার ন্যায্য অভিভাবক। তাঁকে ডিঙিয়ে চলাটা কি তোমার ঠিক হ'বে?

উদ্বিগ্ন হ'য়ে অশ্রু বললে—কথাটা পরিষ্কার করে' খুলে বললে উত্তর দেওয়া সহজ হ'ত, মা।

মা লণ্ঠনটা নিবোলেন। বললেন—ধরো, তোমার বিয়ের খবরটা কি তাঁকে দেওয়া উচিত নয়?

কথা শুনে অশ্রুর ঘাবড়াবার কথা। মা এবার খোলা সড়কে নেমে এসেছেন, গলি-ঘুঁজিতে লুকোচুরি তাঁর আর সইবে না। তবু অশ্রু কণ্ঠস্বর গম্ভীর না করেই বললে—তাঁকে খবর দেওয়াটা একেবারে বাজে-খরচ। তাঁর হয় ত' ধারণা আমি এতো দিনে একেবারে মরে' গেছি। তাঁকে বিরক্ত করে' লাভ নেই, মা।

—তবু, তুমি ত' তাঁরই মেয়ে। তিনি যখন বর্তমান, তখন তাঁকে একবার জিগগেস করা উচিত বৈ কি।

—উচিত নয়, মা। আমি যদি বিয়ে করি দময়ন্তীর মতো প্রকাশ্য সভায় মাল্যদান করে'ই বিয়ে করবো। আর বিয়ে যদি কোনোদিন ভাঙে, তখন সে-সমস্যা আমাকেই মানিয়ে নিতে হবে। সে-দুর্দিনে, যাকে ত্যাগ করেছি তার থেকে খোরপোশের জন্য আদালতের তাগাদা আমি স্বীকার করবো না, বাবার অন্নও সে-দিন অরুচিকর। ভাগ্যের বিধান মেনে নিতেও যদি আমি একা মা, সেই ভাগ্যকে নির্মাণ করতেও আমি একাই পারবো। কিন্তু হঠাৎ আমার বিয়ের ভাবনায় এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লে কেন বলো দিকি?

অশ্রুর একখানি হাত মা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বললেন—আসছে অগ্রহায়ণে প্রভাতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো, মা।

অশ্রু ঢোঁক গিল্‌লো। পর মুহূর্তেই পরিষ্কার গলায় বললে—অগ্রহায়ণ? সে অনেক দেরি, মা। ততক্ষণ আমরা ঘুমুই।

—তবু তোমার বাবা-কাকাদের একটা মত না পেলে মন যে ভারি খুঁৎখুঁৎ করে।

—তার চেয়ে, আমার মত আছে কি না সেইটেই বড়ো জিজ্ঞাস্য। আমার মত থাকে, তা হ'লেই সমস্ত উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব থেমে যাবে, মা। আমি ত' আর বিপণির পণ্য নই মা, যে বাবা-কাকারা দর হাঁক্‌বেন। কিন্তু আমি সে-কথা বল্‌ছি না—বল্‌ছি—

কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন—তোমার মত? মায়ের চোখের সাম্‌নে কিছুই আর লুকিয়ে থাকে না। আমার প্রভাতের ওপর তোমার কী যে মায়া সে আমি স্বচক্ষে না দেখলে হয় ত' বিশ্বাস করতাম না।

—তা হয় ত' করতে না, কিন্তু বিয়ে আমাকে করতেই হবে এমন একটা মারাত্মক সর্বনাশের কথাও কি মার চোখের সামনে লুকিয়ে রইলো না না-কি? পাছে তোমার প্রভাতের ওপর মায়া মরে' যায় মা, সেই ভয়েই আমি পিছিয়ে রইলাম।

অশ্রুর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ করুণালেশহীন দৃঢ়তার আভাস পেয়ে মা বিস্মিত হ'লেন: সে কি কথা, অশ্রু?

অশ্রু স্নিগ্ধস্বরে বললে—বিয়েটা সান্নিধ্যের একটা কদর্য আতিশয্য, মা; এতো সব ছন্দের কারুকার্য বজায় রাখতে হয় যে প্রাণবস্তুটিই বাষ্প হ'য়ে উড়ে' যায়। সে-ভাবহীন কবিতা নিয়ে কোনো কল্পনাস্বর্গেই আর ছাড়পত্র পাওয়া যায় না, প্রাচীরাবদ্ধ সংসারের সংকীর্ণ উঠোনটুকুর মধ্যেই তার ইতি। লাভ করাটাই বড়ো কথা মা, লোভ নয়।

মা বললেন—তুমি তা হলে বিয়ে করতে চাও না?

—সম্প্রতি আমি প্রস্তুত নই বলে'ই যে কোনোদিনই বিয়ে করতে চাইবো না, জীবন-ভবিষ্যতের ওপর আমার তেমনি অনাস্থা নেই। তবে এ-কথাটা আমাকে বল্‌তে দাও যে বিয়েটাই মেয়েমানুষের সব-কিছু নয়, মা। মৃত্যুর মতোই সে একটা অবশ্যম্ভাবী শারীরাবস্থা নয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দেশানুসারে বিয়েটা এককালে বহুকীর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু বিজ্ঞান এখন অনেক পুরোনো তথ্যই বাতিল করে' দিয়েছে। প্রয়োজনের দিক থেকে বিয়েটা ত' অকিঞ্চিৎকরই, ধর্মের দিক থেকেও তুচ্ছ। পরত্র নিয়ে আমাদের আর ভাবনা নেই মা, যত ভাবি ইহের জন্যে। সেই আমাদের বড়ো ধর্ম, সেইখানে আমাদের অর্থ হ'লেই মোক্ষলাভ। কথাটা তোমাকে খুলে বললাম, মা।

খুলে বল্‌লে কি হবে, মা সেই যে মুখ ফেরালেন একটিও আর কথা কইলেন না। মুহূর্তে তাঁর মন আবার বিষিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। পর দিন ভোর বেলা প্রভাতের ঘরে ঢুকে মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে' দিলেন। ঘুম থেকে উঠে প্রভাত ব্যায়াম সেরে তখন বোধহয় খাতা-কলম নিয়ে বস্‌ছিলো, মা'র অনিদ্রাতপ্ত চোখ-মুখের রুক্ষতা দেখে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই মা শুধোলেন: তোরা বিয়ে করবি না?

প্রভাত এখনো নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি। ঢোঁক গিলে বললে—এই সন্দেহটা এমন কি ঘোরালো যে, এত উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ? অশ্রু কিছু বলেছে বুঝি?

মা একেবারে খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লেন: সাধে কি অমন মেয়ের বাপের বাড়িতে স্থান হয় না? অনাসৃষ্টির চূড়ান্ত। বিয়ে হবে না, অথচ এই মাখামাখির মানে কি?

প্রভাত বললে—কথাটা শুনতেই হয় ত' খারাপ মা, কিন্তু মানেটা ত' তুমিই জান। অশ্রু তেমন মেয়ে নয়, যাকে নিয়ে সংসারের সুবিধে বাড়ে। কিন্তু হৃদ্যতার বেলায় ও অপরাজেয়। নর-নারীর সমস্ত হৃদ্যতাকেই বিয়েতে পর্যবসিত করতে হ'বে এমন নিয়ম চালাতে গেলে তোমাদের জাতিভেদ আর বাঁচে না। বিয়েটা দাবার চালের মতো স্থির মস্তিষ্কে ভাববার কথা, মা। রুগ্ন যে, সে বিয়ে করে সেবা পেতে, সংসারে মন যার উড়ু উড়ু সে চায় খাঁচা, দোজবরে চায় চরিত্ররক্ষা। কিন্তু যেখানে এমন কিছু লজ্জা ঢাক্‌বার হাঙ্গামা নেই, সেখেনে বিয়ে না করাটাই স্বাস্থ্য, মা।

মা চটে' বললেন—আমি অত-শত বুঝি না প্রভাত, অগ্রহায়ণেই আমি তোর বিয়ে দেব কৃষ্ণদয়ালবাবুর মেয়ের সঙ্গে। অশ্রু যাবে কবে বাড়ি ছেড়ে?

প্রভাত বললে—থাক না, আমার বিয়ের নেমন্তন্নটাই খেয়ে যাবে না-হয়।

রাতের পর রাত কাটে। এ-সংসারের সকাল-সন্ধ্যার রূপ যেন বদলে গেছে; রৌদ্রে ঝরছে সোনার কণা, জ্যোৎস্নায় মুক্তোর কুচো। যে-বয়সে লক্ষ্মী ছিল চঞ্চলা, মনোরথপ্রিয়তমা, সেই যেন এ-সংসারে এসে বাসা নিয়েছে, কিন্তু বাঁধন তার বড়ো আল্‌গা। মা'র দুই হাত অলস—অশ্রুই দিনে-রাত্রে দু' হাতে ছোট সংসারটাকে নিয়ে সাজাচ্ছে তার সাজ খুলছে। এই আচরণটাই তার সুশ্রী হ'ত যদি তার মাঝে থাক্‌তো সহজাধিকারের সম্পর্ক; তা নয় বলে'ই মা'র কাছে তা অমিতাচার। আইনের ওপর যে-দাবি প্রতিষ্ঠিত নয় তার বাদী না হ'য়ে মা পারবেন কেন? তিনি দস্তুরমতো ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করলেন।

অশ্রুর দেখাদেখি প্রভাতো আজকাল পাঁচটায় শয্যা ছাড়ে; সদ্য-জল-দেওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোয়। সারা রাস্তা অসাড়, আকাশের শুকতারাটি তখনো নির্নিমেষ। দূরের রাস্তায় গ্যাস্‌ দু'-একটা করে' নিব্‌ছে, বাস্‌ একটা দেখা যায়। কোনোদিন যায় মাঠে, কোনোদিন অলি-গলিতে। জ্যোতির্জগৎ থেকে সুরু করে' জন্মনিরোধ পর্যন্ত কোনো বাক্যালাপই ওদের মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। ব্যাস ও বাৎসায়ন দু'জনকেই ওরা কম-বেশি প্রাধান্য দেয়। রোদ উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই ফিরে আসে। প্রভাত তার মোটা খাতা নিয়ে বসে' কলমের ডগা চিবোয়, অশ্রু নিজের ঘরে গিয়ে বই পড়ে, রাশি-রাশি চিঠি লেখে, তারপর সংসার নিয়ে মেতে ওঠে: ঝাঁটপাট, বাসনমাজা-তক্‌। সংসারকে ও কবিতার মতো সৃষ্টি করতে চায়—মিল চাই, ছন্দ চাই, এমন কি যতি-চিহ্নও বাদ দেবে না। দুপুরটা ফাঁকা, প্রভাত চলে' যায় আপিসে; অশ্রু না-ঘুমিয়ে, চরকা না-ঘুরিয়ে ছবি আঁকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখে ওরো ছবি আঁকতে শখ গেছে। সেই জন্য cubism সম্বন্ধে বই কেনে। কোনোদিন মাকে জানিয়ে একাই

বেরিয়ে পড়ে, নারী-মঙ্গল-সমিতিতে নয়, বা আর কোনো মহৎ প্রতিষ্ঠানে নয়—বেরিয়ে পড়ে টহল্ দিতে, কখনো-কখনো পরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত মেয়ে-মহলে গিয়ে আড্ডা দিতে। পাশের বাড়ির একটা বউর নাগাল পেয়ে ও গলির এ-প্রান্ত থেকে শুরু করে' পাড়ার অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। হাতের তাস কেড়ে রেখে মেয়ে-মহলে ও বাক্যের তুফান চালায়, বই পড়্তে দেয়, গান গায়, ছবি দেখায়। ওর মিত্রের সংখ্যা মাত্রা হারালো। এক দিন কি অদম্য কৌতূহলে ও দুপুর-বেলায় একটা গণিকালয়ে ঢুকে পড়েছিলো। কিন্তু সে-কথা থাক্।

—কেন থাকবে ? বল না। প্রভাত আপত্তি করলে।

—রাস্তাটার যে জাত নেই জান্তাম না, কিন্তু সেদিন ভাল করে' জেনেছি বলে'ই মনে হচ্ছে ওর ভোল্ ফেরাতে হবে। মেয়েটির নাম সুরভি। কথায়-কথায় জান্লাম লেখাপড়া শিখতে বড় আগ্রহ। যদি এখানে কিছুদিন থেকে যাই, ওকে ঠিক আমি মানুষ করবো। মুক পর্যন্ত পড়্তে পারলো, কিন্তু মুক্তি-কথাটা মুখ দিয়ে আর বেরুলো না। দেখি কি করা যায়। একটা প্ল্যান্ ঠিক করে' ফেল্তে হ'বে।

বিকেলে দু'জনে আবার বেরোয়। বেরোবার আগে অশ্রু ব্যায়াম করে। অবশ্যি ব্রাহ্মনমুমোদিত পোশাকে। এবার যায় বেশির ভাগ টকিতে, কখনো-কখনো হাসপাতাল দেখতে, কখনো বা চীনে হোটেলে। রাত্রে ফিরে এসে ঘণ্টা তিনেক প্রভাতের ঘরে নানারকম তর্ক চালায়। স্বর সপ্তগ্রামে উত্তীর্ণ হয়। উদ্বেল দুধের ফেনায় ফুঁয়ের মতো এক পক্ষের একটি অতর্কিত চুম্বনে তর্কের ঝাঁজ্ নিমিষে জুড়িয়ে আসে। সেই সাধারণত অধর এনে যুক্ত করে যার যুক্তি ফুরোয়। রাত্রে অশ্রু প্রায়ই উপোস করে। মাঝ রাতে প্রভাতকে শুইয়ে কপালে চুমু খেয়ে হাতের পাতায় খানিকক্ষণের জন্যে হাত রেখে ক্ষীণায়মান দিবাবসানের

মতো অশ্রু ধীরে অপসৃত হয়। মা'র কাছে শুতে আসে। ইদানি মা আর "হাঁ-হু" কিছুই করেন না। এর পর কি হবে ভাবতে ভাবতে অশ্রু ঘুম যায়।

মা'র আর সইলো না। অবশ্যি একটা রাগারাগি মাতামাতি করলে কোনোই সুরাহা হ'বে না, বরং তাল কাটবে। বেশি মোচড় দিতে গেলে ঘড়ির স্প্রিঙই যাবে আল্‌গা হ'য়ে। কাশীর অন্নপূর্ণা পূজোর ওঁর চলনদার জুটেছে। পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা ছাঁদা শেষ করে' মা নাটুর হাত ধরে' বললেন—যাই।

প্রভাত হাঁ-না করেনি, খবরটা তার কাছে পুরোনো। মা'র ধর্ম-লিপ্সাই যে তাঁকে টেনেছে শাদা বুদ্ধিতে সে তাই বুঝেছে, কিন্তু অশ্রুর লাগলো খট্‌কা। সে বললে—আমাদের এক্‌লা ফেলে যাচ্ছ কি, মা?

মা বললেন—তোমরা একাই ত' থাক্‌তে চাও।

অশ্রু প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে মেঝের দিকে তাকালো। দারা না হ'য়েই সে মাতা-পুত্র বিদীর্ণ করলো নাকি? কিন্তু এই অবারিত উন্মুক্ততার মধ্যে সে তার বন্ধুতাকে কতো কাল জিইয়ে রাখবে? সে বললে—তার চেয়ে আমিই চলে' যাই না কেন, মা?

মা বুঝলেন্ অশ্রুর কোথায় জেজেছে। তাড়াতাড়ি তার মাথায় হাত রেখে বললেন—ছি মা, তুমি যাবে কি? এই ঘর-সংসার তোমার হাতে সমর্পণ করে' যাচ্ছি। যদি সময় পাও, একদিন বুঝবে মা, এর ভাণ্ডারে রসের আর থৈ নেই! সে-দিনটি যেন তোমার জীবনে আসে। তোমাকে এর চেয়ে বড়ো আর কী আশীর্বাদ করবো?

চলনদার ব্যস্ত হ'য়ে হাঁক পাড়লো।

মা বললেন—যাই। এমন একটা সুযোগ খোয়ালে ধর্মের কাছে আমার মুখ থাক্‌বে না। একদিন আবার এই সংসার ছেড়ে ধর্মের জন্যে

আকুল হ'য়ে উঠতে হবে, অশ্রু। আমি কিছুরই বিশ্বাস হারাইনি। সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে তোমার যে শিক্ষা হবে তাতেই হয় ত' তোমার ভবিষ্যৎ তুমি দেখে নিতে পারবে। আমি মেয়েমানুষকে চিনি, মা।

অশ্রু নীরবে একটু হাস্‌লো। নাটুর চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। নাটু বল্‌লো—তুমি আমাদের সঙ্গেই চল না, বৌদি।

অশ্রু তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো—মা যেতে দিলেন কৈ? আমি চলে' গেলে সংসার কে দেখবে?

অন্তরাল গেলো ঘুচে'। সকাল হ'তে নিশীথ। যেখানে অবসর সেখানেও অবকাশ নেই। শারীরিক নৈকট্যের যেখানে অভাব সেখানেও শারীর-চেতনাই প্রখর। অশ্রু হাঁপিয়ে উঠ্‌লো।

আফিস থেকে ফিরে এসে প্রভাত আজকাল আর অশ্রুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় না। দু'জনে মিলে রাঁধে, গল্প করে, ঠাট্টা খুনসুড়ি, খুঁটিনাটি ঝগড়া, দুয়েকটি চিম্‌টি, কয়েকটি চুমু। রাত আসে ঘনিয়ে। তখন তারা পরস্পরের কাছে অসহায়, নীরবে পরস্পরের কাছে অভয় প্রার্থনা করে। দু'জনেই বোঝে একটু সরে' বস্‌তে হবে। অগত্যা রাজনীতি নিয়ে কথা চালাতে হয়। মুশকিল এই, দু' জনেরই মতে গরমিল নেই। তারপর অন্য কথা পাড়া দরকার। অশ্রু এ হিসাবে খুব মৌলিক। ও ব্যবসা করবে; তারই প্ল্যান্‌ ফাঁদে। ইস্কুলমাস্টারি ঘৃণ্য কাজ। প্রভাতো তার এই হাড়-ঝরানো চাকরিটায় ইস্তফা দিক্‌। অন্যান্য সব বাস্তব সমস্যা। পয়সা না হ'লে বিয়েটাই অপয়া। যাকে বিয়ে করো তাকে ভালবেসো, কিন্তু যাকে ভালো বাস তাকে বিয়ে করো না। কর্তব্যে সে আবিল, দায়িত্বে সে বাধাগ্রস্ত। জুনোর চোখ তখন অন্ধ, সাইথেরার নিশ্বাসে তখন দুর্গন্ধ।

পরস্পরের মাঝে এতোটা ব্যবধান রেখে ওরা এখন বসে যাতে হাত বাড়িয়ে হাতের নাগাল পাওয়া যায় মাত্র; এই স্পর্শটুকু দিয়েই ওরা পরস্পরের দেহের প্রতি প্রণতি জানায়। একটুখানি দূরে সরে' গিয়ে ওরা এখন যেন গভীর হ'য়ে উঠছে, অজস্র চাঞ্চল্যের ওপর নেমেছে ভাবের গাঢ় মন্থরতা, ব্যাকুল প্রকাশকে বাধা দিচ্ছে অনুভূতির অবিচল তন্ময়তা! অশ্রুর সজ্জা-প্রসাধনে এখন আর কৃত্রিম প্রয়াস নেই, মুখখানা সামান্য একটু মলিন দেখায় বলে'ই লাবণ্যের আর অবধি মেলে না।

প্রভাত এখন প্রশান্ত সমুদ্র, তার ওপরকার সৌম্য অনন্তবিস্তীর্ণ আকাশ হচ্ছে অশ্রু। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, আকাশ তামসী!

প্রভাত বলে: কিন্তু সীতার প্রতি রাবণের প্রেম রামায়ণে তুচ্ছ হ'লেও পৃথিবীতে তুচ্ছ হয় নি। প্রেম অর্থ যদি দুঃখের তপস্যা হয়, passionই তা হ'লে প্রেম। হেলেনের প্রতি প্যারিসের কিংবা ফ্রান্‌সেস্‌কার প্রতি প্যাওলোর প্রেম আমার-তোমার ঈর্ষার জিনিস, অশ্রু। তোমার Donne-এর কথাই নাও না:

Love's mysteries in souls do grow,
But yet the body is his book.

শরীর একটা ঐশ্বর্য, যদি বলো তাজমহলের চেয়েও কীর্তিময়। প্রাকৃত ভাষায় যাকে বলো এর অশ্লীলতা, তাই তার সম্পদ, তার উজ্জ্বলতা। সম্ভোগহীন সংযম ও কামনাহীন তপস্যা দু'টোরই কোনো অর্থ নেই।

অশ্রু হেসে বলে: দেহের স্তবগান করতে আমি আরো বাস্তব ভাষা প্রয়োগ করে' থাকি। কিন্তু প্রেমকে শরীরের সহজ সুবিধায় রূপান্তরিত করবার সময় তার পরমায়ুর সম্বন্ধে চিন্তা হয়। সে সুবিধা টিকিয়ে রাখবার জন্যেই টাকা চাই। যতো দিন তা না হয় তত দিন আমিও হেরিক্-এর একটা stanza আওড়াই:

A sister (in the stead
Of wife) about I'll lead ;
Which I will keep embraced,
And kiss, and yet be chaste.

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে। রাস্তার গোলমাল ক্রমে-ক্রমে মিলিয়ে এলো। দু'জনেরই মুখের কথা ফুরোয়। যখন পরস্পরের গাঢ় নিশ্বাস

শোনা যায় তখনই সে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। সাবধান! অশ্রু উঠে পড়ে। বলে : শুতে যাই।

প্রভাত বলে : আমারো ঘুম পাচ্ছে।

আলাদা দুই ঘরে শুয়ে কারুরই ঘুম আসে না। খানিকক্ষণ ধরে' এই ঘুম-না-আসাটুকু স্নায়ুতে একটা মাদক শিহরণ তোলে। আবার কখন এক সময় যে তারা ঘুমিয়ে পড়ে খেয়ালই থাকে না। ভোরবেলা জেগে উঠে ওরা ভাবে : একটি অসহিষ্ণু রাত্রি আমরা জয় করেছি। হয় ত' এও আবার ভাবে : পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তির যূপে এই কামনাকে বলি দিতে না পারলে পবিত্রতা কোথায়?

রবিবারের দুপুর। দশটা থেকে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। কল্‌কাতার দুপুর বেলাকার বৃষ্টিতে একটি অনতিগাঢ় তন্দ্রাস্বচ্ছন্ন মাদকতা আছে। গলিটা জনহীন, ইলেক্‌ট্রিক পোস্‌টের দাঁড়ের ওপর বসে' কাক পাখা ঝাড়ছে। ঘরের দুটো জান্‌লা বন্ধ, পুব দিকেরটা আধেক-খোলা। জলের ছাঁট আস্‌ছে বটে, কিন্তু বিছানা পর্যন্ত না। দেয়ালে পাশাপাশি দু'টো বালিশ রেখে তাতে পিঠ দিয়ে অশ্রু আর প্রভাত কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসে' আছে। পা চারটে সম্মুখে প্রসারিত, হাঁটু অবধি একটা গায়ের-কাপড় দিয়ে ঢাকা। দু'জনে চুপ করে' একটা বই পড়্‌ছে —একটা নিষিদ্ধ বই। মনোযোগ অশ্রুরই বেশি। প্রভাত তখন অর্ধ-জাগরণে প্রায় নিস্পন্দ। চিত্রকর মুরিলো যেমন সর্বদা এক

কুমারীর স্বপ্নে বিভোর থাক্‌তেন তেমনি প্রভাত হঠাৎ সে অশ্রুকে নিজের কাছে আকর্ষণ করলো; অশ্রু বাধা দিলো না। বইটা শেষ হ'তে আর দশ মিনিট্। তারপর আবার আরেকটা নতুন কিছু ভাবতে হ'বে। হাতের কাছে যদি কিছু না জোটে তবে বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়বার বায়না ধরে' নিতান্ত অবাধ্যপনা করবে সংকল্প করেই' অশ্রু প্রভাতকে চুমু খেতে দিলে। রোয়াকের ওপর হঠাৎ ডাক-পিওনের আবির্ভাব না হ'লে চুমু বোধ হয় কর্কশ হ'য়ে উঠ্‌তো। দু'টোর ডাক এলো। পিওন জান্‌লার ফাঁক দিয়ে খামে-মোড়া একটা ভারি চিঠি মেঝের ওপর ফেলে দিলো। অশ্রু তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে' আন্‌লো কুড়িয়ে। কা'র এ চিঠি? ইন্দিরার!

প্রভাত বল্‌লো: পড়ো ত' চিঠিটা! আমার উপন্যাসের উপাদান হ'তে পারে।

অশ্রু দূরে বসে' পড়্‌তে লাগ্‌লো:

অশ্রু,

তুমি আমাকে—

বলে'ই একটু থাম্‌লে। বললে—ইন্দিরা কোনোকালে চিঠি লেখে না, তাই শংকিত হচ্ছি, প্রভাত। তা ছাড়া চিঠির আয়তনটাও শীর্ণ নয়। হস্তাক্ষরটাও দু'রকম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে পুরুষের।—তোমার উপন্যাসটা কি ডিটেক্‌টিভ্ নাকি?

আবার আরম্ভ হ'ল:

অশ্রু,

তুমি আমাকে যে আশীর্বাদ করে' এসেছিলে তা আর ফল্‌লো না। [টীকা: আমি ত' অতো বড়ো সতী নই।] আমি স্বামী-পুত্র নিয়ে

পরমার্থ খুঁজে পেলুম না। কিন্তু নারীর পরমার্থ যে সেখেনেই লুকোনো ছিলো এ সত্য-প্রতীতি আমার হ'য়েও হ'লো না। কায়মনে আমি স্বামীর প্রেমহীন ব্যভিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলুম, কিন্তু অতৃপ্তির মরুভূমি পেরিয়ে যেখানে এসে বুঝলুম সে আমার পলাতকা মরীচিকা, তখন মরতে আমার আর বাকি নেই। খুলেই বলতে হ'বে, অশ্রু। আর জ্বর একটু কম বলে'ই লিখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সর্বদেহ বিষাক্ত হ'য়ে গেছে—কবির ভাষায় নয়, ডাক্তারি কথায়। বাঁচবো আর না।

তবু জীবনে আমি মরতে চাই নি। রমাপতিকে ভুল্‌তে পারবো না, নারী হ'য়ে এমন অসম্ভব কল্পনা-প্রবণতা আমার ছিলো না। তাকে আমি স্বচ্ছন্দে ভুলেছিলুম। সে-ভোলার মধ্যে আমার আনন্দ ছিলো। তাকে আমি হৃদয় দিয়ে শুরু করেছিলুম, হৃদয় আমার ক্ষয় হ'য়ে গেছে। [টীকা : আমাদের হৃদয় কিন্তু এতো সহজে ক্ষয় হয় না। আমাদের হৃদয় সিন্ধুর মতো বিস্ফারিত, বিস্তারিত। একজন বাল্‌তি করে' জল নিয়ে গেলেই সমুদ্র ডোবা হ'য়ে যায় না] স্বামী আমার দেহের দুয়ারে এসে দৈন্য জানালেন। আমি অন্নপূর্ণা। শিবকে সন্ন্যাসী হ'তে দিলুম না। হৃদয় থেকে দেহ—পূর্বরাগে এই হচ্ছে পূর্বাপর সম্বন্ধ; বিবাহে হচ্ছে দেহ থেকে হৃদয়। সে-প্রতীক্ষার ধৈর্য আমার ছিলো বলে'ই আত্মহত্যা করি নি। আমি ভীরু যতোখানি সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য আমি সহিষ্ণু। নইলে এই কদর্য্য দিনরাত্রিযাপনের বীভৎসতা থেকে মৃত্যু আমার কাছে অধিকতর বিসদৃশ ছিলো না, অশ্রু।

মনে হয়, স্বামীকে আমি ভালোবাস্‌তে পারতুম। ভালোবেসেও ছিলুম হয় ত'। স্বামী সংজ্ঞাটার ওপর সত্যিই আমার মোহ জন্মেছিলো। যেদিন প্রসব বেদনা সুরু হ'ল, উনি [টীকা : অতিপ্রণয়ে

সর্বনাম।] শিয়রে বসে' কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই-দিনই দেহে মনে এই কথাই বিশ্বাস করেছিলুম অশ্রু, এর চেয়ে বড়ো সাফল্য বড়ো কৃতিত্ব নারীর স্বর্গে-মর্তে কোথাও কিছু আর নেই। আমি নাথবতী এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমি সন্তানবতী। সন্তানেই আমার স্বামীর পরিচয়। মনে হ'ল ব্যক্তিবিশেষ গৌণ, সন্তানই আমার সন্ধান ছিলো। এর জন্যে দেহপাত করে' সুখ আছে। আকাশের কোলে সূর্যোদয়ের চেয়ে জ্যোতির্ময়, যুগান্ধকারের পরে নব প্রতিভার নবীন প্রদীপ্তি। আমি মূর্খ ছিলুম বলে'ই এতো দিন দেহের এই উৎসবকে সম্মান করিনি, কিন্তু সেদিনের সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি মেরির চেয়েও গৌরবগর্বিতা ছিলুম।

ছেলেবেলায় সেই যে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর কথা পড়ে-ছিলুম সে আমার মনে কোথায় যেন দাগ ফেলেছিলো। ভগবতী দেবীই আমার কাছে মা'র আদর্শ ছিলেন। আমি মনে-মনে তাঁকে প্রণাম করে' তাঁর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলুম। কিন্তু ঈশ্বর আমার সদয় হ'লেন না।

তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে' মৃত পুত্র প্রসব করলুম, অশ্রু। আমার জীবনে এত বড়ো ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত আকাশ শূন্য হ'য়ে গেলো। খালি ধুলো আর আবর্জনা। কর্দমের সমস্ত আবিলতা ঘেঁটে যে-পথ উদ্ধার করতে চেয়েছিলুম তার কাঁটাই আমাকে বিঁধে রইলো। মনে হ'ল আমি কতো কুৎসিত, স্বামী কতো রূঢ়! মনে হ'ল আমরা দুটো যন্ত্র, কর্কশ, স্থুল, সুষমাহীন। যা ছিলো "pulse of the machine" তাই গেলো হারিয়ে। ভাবলুম বাঁচবার আর মানে কী?

ডাক্তার ভয় দেখালো। নিজেও বুঝি এ আমার অন্যায় আবদার

—বাঁচা আমার হ'বে না। তবু আমার দুঃখ নেই। আত্মহত্যা যদি একটা experiment হয়, জীবনো তার চেয়ে বড়ো পরখ, অশ্রু। আমি আরেকবার পরখ করবো। আবার কাদা ঘাঁটবো, কাঁটা দল্‌বো, মরু ভিজোবো। মরীচিকা নয়, জল চাই; সেই জলই আমার কাছে নামান্তরে জীবন। সন্তান আমার চাই। সেই আমার আসন, আমার আশ্রয়, আমার মহিমা। এর চেয়ে দেহের আর কী বড়ো কবিতা হ'তে পারে ভাবতে পারি না। বিবাহকীর্তনে ভল্‌টেয়ারের সঙ্গে না মিলি ক্ষতি নেই, কিন্তু এ-সম্পদ অর্জনে পরাঙ্মুখ থাকবার মধ্যে অহংকার দেখতে পাইনে। আমি যাতে বাঁচি, দিনে-রাত্রে ভগবানের কাছে এইই খালি প্রার্থনা করছি। তুমিও অশ্রু, প্রার্থনা করো।

না না, এর পরে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বেখাপ্‌ হ'বে। অশ্রু পৃষ্ঠা উল্টোল:

বৌদির ও-চিঠিটা আর ডাকে দেওয়া হয় নি। টেবিল গুছোতে গিয়ে চিঠিটা আজ নজরে পড়লো। বৌদির লেখা সযত্নে গুছিয়ে রাখবার ইচ্ছা ছিলো বলে' ওটা পড়তে হ'ল। দেখলুম চিঠি—অশ্রু-দিকে লেখা। ভাবলুম, আর একটা লাইন্‌ জুড়ে না দিলে চিঠিটা অসম্পূর্ণ থাক্‌বে।

কাল সন্ধ্যায় বৌদি মারা গেছেন। ইতি।

বিমল

আজকে অশ্রুর শেষ রাত্রি। মানে, কাল সে কল্‌কাতা ছাড়বে। এ-সত্য অবশ্যি সে দিনের বেলায় জান্‌তে পায়নি। পাবে—রাত আরেকটু গভীর হোক্।

এ-অঞ্চলটায় মশা কম বলেই ত' মনে হয়—মার মতো অশ্রু মশারি খাটায় না। জান্‌লাগুলো খোলা থাকে, দোরটা ভেজানো। আলো নিবেছে। অশ্রু ঘুমিয়ে।

ঘুম অশ্রুর পাতলা নয়। তাই কে একজন যে তার শিয়রে বসে' কপাল ও কানের কাছের চুলগুলিতে আঙুল বুলুচ্ছে সে তা টের পায় নি। কিন্তু সেই হাত যখন গ্রীবা উত্তীর্ণ হ'য়ে বুকের সমীপবর্তী হয়েছে তখন সে চোখ খুল্‌লো। বুঝলো প্রভাত।

বুঝতে অশ্রুর দেরি হ'ল না। সান্নিধ্যের অপচয় হয়েছে। কিন্তু প্রেম অর্থ যেমন আত্মদান তেম্‌নি আবার শাসন। প্রতীক্ষাটা হচ্ছে প্রস্তুত হওয়া। প্রস্তুত আজো কেউ হয় নি। অশ্রু এক মুহূর্ত কি ভেবে মাথাটা প্রভাতের কোলের ওপর তুলে দিলো। সকল উগ্রতা উপশান্ত হ'ল বুঝি। প্রভাত তার কপালে চুমু খেলে।

অশ্রু বললে—এসে অব্দি আমার এস্রাজটা থলের মধ্যেই বন্দী হ'য়ে আছে—তাও তক্তাপোষের তলায়। তাই আজ একটু বাজাই। বা'র করো না।

ইঙ্গিতটা ব্যক্ত। তবু প্রভাত বললে—গান তুমি কাল গেয়ো।

অশ্রু উঠে বস্‌লো, হেসে বল্‌লে: গান তা হ'লে আমি কালই গাইব। কাল আমি জলপাইগুড়ি চলে' যাব, প্রভাত। আমার বিচ্ছেদেই হবে তোমার গান। বলে' এবার সে প্রভাতের মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে আন্‌লো। তার মুখে হাত বুলুতে-বুলুতে

বললে—পৃথিবীতে আজো এমন কবিতা লেখা হয় নি বন্ধু, যে আবৃত্তি করে' তোমার চোখে স্বপ্ন এনে দি।

প্রভাত বললো : কাল তুমি সত্যিই যাবে ?

—তোমার কষ্ট হ'বে খুব ?

—হ'বে ; তবু তুমি যাও।

খুশি হ'য়ে অভ্র বললে—আর তুমি ?

—আমি তত দিনে আমার উপন্যাসটা শেষ করে' ফেলি। তোমার টাকা দিয়ে সেটা ছাপা যাবে। কিন্তু তুমি কি আর ফিরে আসবে না ?

—আমি ত' তোমার কাছেই আছি।

দার্জিলিঙ মেইল ছাড়লো রাত্রে। প্রভাত প্ল্যাটফর্মে—অভ্র একখানা সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার জানলা ধরে' বাইরের দিকে চেয়ে।

কারু মুখে কোনো কথা নেই।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে। প্রভাত তাড়াতাড়ি জানলার কাছে সরে' এসে বললে—আর কি তুমি ফিরে আসবে না ?

অভ্র হাত বাড়িয়ে প্রভাতের হাত স্পর্শ করলো : আমি ত' তোমার কাছেই আছি।